স্বাধীনতার
পঁচিশ বৎসর

স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর

উপদেষ্টা পর্ষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক :

শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, মুখ্যমন্ত্রী

সদস্যবৃন্দ :

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষামন্ত্রী

শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়, ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ

ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন, উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ডঃ রমা চৌধুরী, উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বসু, বিধানসভা সদস্য

শ্রীঅনন্ত ভারতী, বিধানসভা সদস্য

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বিধানসভা সদস্য

প্রকাশকাল ঃ ১৫ আগস্ট ১৯৭৩ ॥

প্রকাশক ঃ তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবংগ সরকার ॥

মুদ্রক ঃ তরুণ প্রেস, গণেশ চাঁদ দে, ১১, অক্রুর দত্ত লেন, কলিকাতা-১২ ॥

ব্লক ঃ স্ট্যান্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং, ১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ ॥

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ রণেন মুখোপাধ্যায় ॥

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা-বাণী
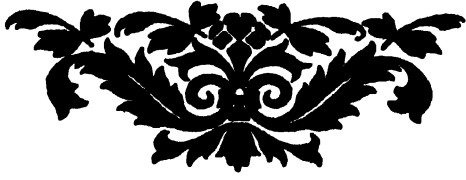
আমরা যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পুনরুজ্জীবনে গভীরভাবে আগ্রহান্বিত এবং সংশ্লিষ্ট, তাঁদের কাছে এই গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। আমাদের চিন্তা-ভাবনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক এবং অন্যান্য যাঁদের বিশিষ্ট অবদান আছে, তাঁদের চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধাদি এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এই রাজ্যে আমাদের যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সে সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকাদের অধিকতর সচেতন ক'রে তোলায় এ প্রবন্ধগুলি সাহায্য করবে।

এই গ্রন্থে যে সব বিষয় আলোচিত হয়েছে, সেগুলি নিয়ে যদি ফলপ্রসূ বিচার বিতর্কের সূত্রপাত হয় এবং তার ফলে এই রাজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে জনমানসের ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনে সাহায্য হয়, তাহলেই আমার মনে হয় যে, এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

[signature]

মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মনোমিত্র (মনোপিক্স)
গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিঃ
কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট
হিন্দুস্থান মিউজিক্যালস্
নান্দীকার
অজয় চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ
সুবিনয় রায়
কমল গুহ
দিলীপ চট্টোপাধ্যায়
নবকুমার দে
চণ্ডীমাতা ফিল্মস্
বলাই সেন
নাট্য ভারতী
তরুণ অপেরা
ভারতী অপেরা ও
নেপাল নাগ

প্রকাশনে :
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহযোগিতায় :
মৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায়
সুতপা চক্রবর্তী

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও জনসংযোগ, যুব কল্যাণ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও পঞ্চায়েত, পশ্চিমবঙ্গ

১৯৭২-৭৩ সালে সারা দেশে স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত পঁচিশ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অগ্রগতি বিষয়ক স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্বন্ধে গত বৎসর একটি সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল। তদনুসারে এই পরিকল্পনার রূপদানের জন্য আমার সভাপতিত্বে কয়েকজন সুপরিচিত লেখক ও সাংবাদিককে নিয়ে একটা বিশেষ প্রকাশন কমিটি গঠিত হয়েছিল। সুখের বিষয় এক্ষেত্রে আমাদের উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয়েছে এবং আমরা স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী বৎসরে পাঠক পাঠিকাদের কাছে এই স্মারক গ্রন্থটি উপস্থাপিত করতে পেরে আনন্দিত।

কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই রাজ্যের অগ্রগতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনার জন্য কিছু সংখ্যক সুপরিচিত শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তাঁদের অধিকাংশ সময়মত এ আমন্ত্রণে সাড়া দিলেও আমরা অনেক চেষ্টা করেও কিছু নির্ধারিত বিষয়ে প্রবন্ধ সংগ্রহ করতে পারিনি। বস্তুত স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশে কিঞ্চিৎ বিলম্বের এটি অন্যতম কারণ। এই সামান্য ত্রুটি সত্ত্বেও আমাদের রাজ্য যে স্বাধীনতার পরে বহুমুখী সমস্যা এবং মাঝে মাঝে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও হিংসার আবহাওয়ার সম্মুখীন হয়েও প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে, বর্তমান স্মারক গ্রন্থটির মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি যাঁরা লিখেছেন তাঁদের অধিকাংশ সরকারের সঙ্গে কার্যসূত্রে জড়িত নন। তাঁদের প্রকাশিত অভিমত সম্পূর্ণভাবে তাঁদের নিজস্ব এবং সরকার সেজন্য দায়ী নন। নিজের নিজের ক্ষেত্রে কৃতবিদ্য এবং সুপরিচিত লেখক লেখিকারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের বহুমুখী প্রগতি ও সমস্যাবলী সম্বন্ধে যেসব প্রবন্ধ লিখেছেন, সেগুলি পাঠক পাঠিকাদের কাছে চিত্তাকর্ষক ও চিন্তা-উদ্রেককারী হবে বলে আমি আশা করি।

বিশেষ প্রকাশন কমিটির যেসব সদস্য নিজেদের বহুবিধ কাজ সত্ত্বেও স্বেচ্ছাশ্রমে আমাদের এ স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব করে তুলেছেন আমি তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। বিভাগীয় যেসব আধিকারিক ও কর্মচারীর প্রয়াসে এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হল তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাই।

স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর

পশ্চিমবঙ্গ : এক নজরে

আয়তন		৮৭,৬১৭ বর্গ কি মি
জনসংখ্যা	...	৪,৪৪,৪০,০৯৫
পুরুষ	...	২,৩৪,৮৮,২৪৪
নারী	...	২,০৯,৫১,৮৫১
গ্রামের জনসংখ্যা	...	৩,৩৩,৪৪,৯৭৮
শহরের জনসংখ্যা	...	১,০৯,৬৭,০৩৩
সাক্ষরতার সংখ্যা	...	১,৪৬,৮৮,৭৪৫
সাক্ষরতার হার	...	শতকরা ৩৩·০৫
সাক্ষর পুরুষ	...	১,০০,৬৩,৪৬৮
সাক্ষর নারী	...	৪৬,২৫,২৭৭
কৃষিজীবী	...	৭২,৪৮,৯০৫
হিন্দু	...	৩,৪৬,১১,৮৬৪
মুসলমান	...	৯০,৬৪,৩৩৮
তফসিলী সম্প্রদায়	...	৮৮,১৬,০২৮
আদিবাসী	...	২৫,৩২,৯৬৯

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রথম সারির সৈনিক হবার সাধনায় বাংলাদেশ ও বাঙালীকে মূল্য দিতে হয়েছে সবচেয়ে বেশি। সাম্রাজ্যবাদের উলঙ্গ আক্রোশ ও গোপন ষড়যন্ত্র তার দেহবল, মনোবল ও আত্মিক বল ভেঙে দেবার জন্য কোনো চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি। ১৯০৫ ও ১৯৪৭ দুদুবারের বঙ্গভঙ্গ তার প্রকৃষ্ট প্রমান। আর এ দুয়ের মাঝখানে বয়ে গেছে কত বীরের রক্তস্রোত, মাতার অশ্রুধারা ও জায়ার দীর্ঘশ্বাস। ফাঁসির রজ্জু, আন্দামানের বিভীষিকা, অন্তরীণ জীবনের অন্তর্দাহ, কত নিষ্ঠুর অত্যাচারই বাঙালীর মেরুদন্ড নোয়াতে চেষ্টা করেছে। প্রাক্ স্বাধীনতা কালের ইতিহাস এক বাংলার মর্মন্তুদ শবসাধনার ইতিহাস।

শাসন সংস্কারকামী মডারেট রাজনীতির জন্ম হয়েছিল এখানে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠায়। তাকে আরো একটু ব্যাপক করে-

অমলেশ ত্রিপাঠী

ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মাধ্যমে। তবুও তা আবদ্ধ ছিল উচ্চ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবর্ণের ইংরেজী শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে প্রধানতঃ যাঁরা ছিলেন ব্যবহারজীবী বা অধ্যাপক বা বার্তাজীবী, যদিও ভূমির সঙ্গে তাঁদের সকলেরই অল্পবিস্তর যোগ ছিল। এ'দের ইংরাজ-ভক্তি ছিল সোচ্চার। পার্লামেন্টারী রাজনীতির ভারতীয় নকল নবিশীকে ভয় করার মত কিছু ছিল না কর্তৃপক্ষের। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বাংলার রাজনৈতিক ভাবনা একটা নূতন মোড় নেয়। 'আনন্দমঠ'-এর কল্পনা বাঙালী মনকে প্রবল নাড়া দিয়েছিল। কমলাকান্ত ছদ্মনামে বঙ্কিমচন্দ্র প্রচলিত ভিক্ষানির্ভর রাজনীতি, হিতবাদী জীবনদর্শন, পরানুকারী সংস্কৃতি ও অন্তঃসারশূন্য ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে যে ব্যঙ্গ-

বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন তা অনেকের মর্মে বেঁধে। এর ওপর ছিল বিবেকানন্দের বিশ্বজয়ী প্রতিভার প্রচণ্ড অভিঘাত। বঙ্কিমের কৃষ্ণ চরিত্রের অতিমানবীয় আদর্শের সংগে বিবেকানন্দের হিন্দু ধর্মের নব ব্যাখ্যান মিলে একটা স্বাদেশিকতার বাতাবরণ সৃষ্টি হয় যা থেকে কোন শিক্ষিত বাঙালীই প্রায় মুক্ত ছিল না। বিপিন পালের মত ব্রাহ্ম, ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায়ের মত ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, অরবিন্দ ঘোষের মত ইউরোপীয় ক্লাসিকাল সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ মন আবেগের বন্যায় ভেসে গিয়ে মডারেট-পন্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই ভাববন্যা, এই যৌবন জলতরঙ্গ প্রতিরোধ কল্পে বঙ্গভঙ্গের নীতি গৃহীত হয়।

কার্জন যতটা বঙ্গভঙ্গের জন্য দায়ী তার চেয়ে বেশী দায়ী ছিলেন বৃটিশ আমলাতন্ত্রের প্রতিভূ স্যার হার্বার্ট রিজলে, স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার ও স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার। হোম সেক্রেটারী রিজলে স্পষ্টই লেখেন—"যুক্তবঙ্গ একটা প্রবল শক্তি। বিভক্ত বঙ্গে বিভিন্ন দিকে টান পড়বে। আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বৃটিশ বিরোধী দলের সংহতি দুর্বল করে ফেলা।" এর সংগে যোগ দেয় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বুদ্ধি প্রচার কৌশল। পূর্ববঙ্গের মুসলিম নেতাদের অর্থ ও সম্মান দিয়ে বশ করা হয়, মধ্যবিত্তদের দেখানো হয় চাকুরীর লোভ ও সর্বসাধারণকে হৃতমুসলিম রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন।

গৌরবের বিষয় হিন্দু মুসলিম মিলিত হয়ে বঙ্গভঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। সোনার বাংলাকে ভালবেসে, বাঙালীর ঘরের ভাইবোনরা বাংলার মাটি ও জলের ঐক্য রক্ষার জন্য স্বদেশীর ডাকে সাড়া দেয়। সুরেন্দ্রনাথের পাশে দাঁড়ান আবদুল রসুল, অশ্বিনী দত্তের পাশে লিয়াকত হোসেন। বরিশালের পুলিশী অত্যাচারের পর আন্দোলনের নেতৃত্ব চলে যায় চরমপন্থীদের হাতে। তাঁরা বয়কট ও স্বদেশীর গন্ডী অতিক্রম করে আইরিশ পদ্ধতিতে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা রুশ পদ্ধতিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথাও ভাবেন। স্বরাজ বলতে তাঁরা বোঝেন ইংরেজ বর্জিত ভারতবর্ষ। স্বাধীনতা তাঁদের মতে বিশুদ্ধ ভারতীয় মার্গে এক সর্বাঙ্গিক পরিপূর্ণতার পথে যাত্রা। মোক্ষের প্রথম সোপান রাজনৈতিক মুক্তি। সন্দেহ নেই তাঁরা স্বদেশীর নদীতে নতুন জোয়ার আনলেন। অনুশীলন, যুগান্তর প্রভৃতি সমিতি প্রাণ নিয়ে ও প্রাণ দিয়ে দেশের জড় চিত্তে একটা প্রবল গতি সঞ্চার করতে চেয়েছিল। আজও ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল-চাকী সত্যেন বসু ও কানাই দত্ত প্রভৃতির আত্মদান এবং বারীন ঘোষ, পুলিন দাশ, প্রভৃতির সংগঠন স্মরণীয় হয়ে আছে। কিন্তু মুস্কিল হল। গোপন পথে চলতে গিয়ে, বৃহত্তর জন সমাজের সংগে সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব হল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব মধ্যবিত্ত উচ্চবর্ণ হিন্দুর হাতে থাকায় প্রচার বা সংগঠনে হিন্দু-ধর্মের সুর লাগল। ফলে শিক্ষিত মুসলিম সমাজের চিত্তে দেখা দিল একটা অনিশ্চয়তা ও দুশ্চিন্তা যার পূর্ণ সুযোগ নিল ইংরেজ শাসক শ্রেণী। ছোটলাট ব্যামফিল্ড ফুলার ও হেয়ার পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের অনেক সুযোগ সুবিধা দিতে থাকলেন। বড়লাট মিণ্টো মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের পৃথক নির্বাচন ও সংখ্যানুপাতের অতিরিক্ত আসনের লোভ দেখালেন। জামাল-পুর ও কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে শাসক শ্রেণী ও লীগনেতার চক্রান্তে লাগলো সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ। আত্মোন্নতি সমিতি বা ঢাকা অনুশীলন দল তাতে যোগ দিয়ে মুসলমানদের চরমপন্থী আন্দোলন থেকে আরও দূরে সরিয়ে দিলে। সবচেয়ে বড়ো কথা, এঁদের হিন্দু মুসলিম কৃষক সমাজের সম্বন্ধে কোনো পরিকল্পনা ছিল না। মুসলমান চাষীদের সহজে বোঝানো গেল যে বিলাতী কাপড় পোড়ানো বা স্বদেশী প্রচার হিন্দু জমিদার-জোতদার-দের শোষণের রকমফের। শুধু যুব শক্তির একাংশকে দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ ও তাদের মধ্যে আবেগ সঞ্চার করে দেশ স্বাধীন করা যায় না—এ বোধ অরবিন্দের মনে জাগে বলেই তিনি ধর্ম সাধনার পথ বেছে নেন। বাকী নেতাদের ফাঁসি দিয়ে বা আন্দা-মানে পাঠিয়ে বা দীর্ঘমেয়াদী কারাবাস দিয়ে সরিয়ে দেওয়া ইংরেজদের পক্ষে কঠিন ছিল না। মডারেটদের তুষ্ট করা হয় মিণ্টো-মর্লি শাসন সংস্কার দিয়ে ও বঙ্গ-ভঙ্গ-রদ করে (১৯১১)।

কিন্তু যুক্তবঙ্গের মানচিত্র এমন ভাবে রচিত হল যাতে

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা কায়েম হয়। তাছাড়া কলকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হ'ল। এ দুটোই হিন্দু বাঙালীর স্বার্থ বিরোধী। প্রায় বঙ্গভঙ্গের পূর্বে মুসলিমদের মধ্যে যেমন Identity crisis দেখা দিয়েছিল, বঙ্গভঙ্গরদের পর হিন্দুদের মধ্যে ধীরে ধীরে তারই কালোছায়া পড়ল। রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর যেটুকু বাঙালী প্রভাব পড়ত তাও লুপ্ত হ'ল। আগের থেকেই বাংলার অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় বণিক ও ধনপতিদের কব্জায় ছিল। এখন থেকে চাকরী বাকরী বা অন্যান্য ক্ষেত্রে সুবিধা পাওয়ার ব্যাপারেও টান পড়ল। এদিকে মডারেটরা মিন্টো-মর্লি সংস্কারের ভাঁওতা ধরে ফেলল। মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনাধিকার ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া তাদের মনঃপূত হয়নি। বাজেট ও বিতর্কের ব্যাপারেও প্রচুর বাধা ছিল। তাছাড়া ছোট-লাট ও বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতিকে প্রহসনে পরিণত করল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মূল্যবৃদ্ধি, কৃষকদের করভার বৃদ্ধি অসন্তোষকে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল।

অতএব বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদের ধারা অব্যাহত রইল। উপরন্তু জার্মানীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা দেখা দিল। যুগান্তর দলকে পুনর্গঠন করলেন বাঘা যতীন। তার সঙ্গে পাঞ্জাবের গদর দলের যোগাযোগ করে দিলেন রাসবিহারী বসু। বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ১৯১৫ সালের অভ্যুত্থানের চেষ্টা বানচাল হয়ে গেল। তবু যতীন মুখার্জী আশা ধরে রইলেন জার্মানী থেকে অস্ত্র এলে নূতন করে বিপ্লবের আগুন জ্বালবেন। সে অস্ত্র কোনদিন এল না, বালেশ্বরে তারই প্রত্যাশায় গিয়ে পুলিশের সঙ্গে সম্মুখসমরে প্রাণ দিলেন তিনি।

ইতিমধ্যে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে মডারেট ও চরমপন্থীর মিলন হয়েছে, তিলক ও বেসান্ত হোমরুল আন্দোলন করেছেন। নতুন নেতৃত্বে লীগও কংগ্রেসের সঙ্গে সামিল হয়েছে। বাংলায় দুজন মুসলিম নেতা দেখা দিয়েছেন—মৌলানা আজাদ ও ফজলুল হক। তাঁরা লীগের প্রাক্তন সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব হঠিয়ে দিয়েছেন। ইংরেজরা এই যৌথ চাপের উত্তরে শাসন সংস্কারের আশা দিল। কিন্তু মণ্টেগু-চেমসফোর্ডের প্রস্তাবিত সংস্কার বাঙালী হিন্দুর নূতন নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ মেনে নিতে পারলেন না। এখানে বাধল বিরোধ মডারেট নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে, যেমন একদিন বেধেছিল সুরাটে (১৯০৭ সালে) সুরেন্দ্রনাথ-গোখলের সঙ্গে অরবিন্দ-তিলকের। দেশবন্ধু কর্মপন্থা স্থির করার আগেই রাওলাট আইনের প্রতিবাদে অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীজীর ডাক এল। এতদিন স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল উচ্চ শ্রেণীর উচ্চ বর্ণের ইংরাজী শিক্ষিতের আন্দোলন। তাঁরা কৃষক-মজুর বা জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না তা নয়, তাঁরা মনে করতেন সে সব কথা গুছিয়ে বলার ভার তাঁদের। শিক্ষিত নেতাই অশিক্ষিতের প্রতিভূ, উচ্চবর্ণ নিম্ন-বর্ণের মুখপাত্র, উচ্চবিত্ত দরিদ্রের প্রতিনিধি। তাঁদের আন্দোলনে জনসাধারণের স্থান ছিল না বলে তারাও বিশেষ সাড়া দেয়নি। এখন এল এক নতুন যুগ। গান্ধী সবাইকে ডাক দিলেন স্বাধীনতা যজ্ঞে আহুতি দিতে। তাঁর কর্মপদ্ধতিও বিচিত্র—সংস্কার-কামীদের বিরুদ্ধে তিনি দিলেন অসহযোগের ডাক, আবার সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে অহিংসার। বলা বাহুল্য বাঙালী ভদ্রলোকের প্রথাগত রাজনৈতিক স্টাইলের সঙ্গে এর অমিল প্রভূত। তাদের একদল সংস্কারপন্থী, অন্য দল সন্ত্রাসবাদী—উভয় দলই গণ আন্দোলনের পথ এড়াতে চায়, কারণ তাতে উচ্চবর্ণের ও উচ্চবিত্তের বিপদ আছে। চাষীদের আন্দোলনভুক্ত করতে গেলে তারা জমিদার মহাজনের বিরুদ্ধে যেতে পারে, পূর্ববঙ্গের চাষীর বেশীর ভাগ মুসলমান ও জমিদার মহাজন বেশীর ভাগ হিন্দু বলে অর্থনৈতিক বিরোধ আবার সাম্প্রদায়িক বিরোধের রূপ নিতে পারে। এখানেই ভুল হ'ল। অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর না হ'লে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূর হবে না, বরং স্বার্থসিদ্ধ তৃতীয় পক্ষ ইংরেজ বা স্বাতন্ত্র্যকামী লীগ তাতে ঘৃতাহুত দেবে—এ ধারণা তখনো পরিস্কার হয়নি।

১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এই পন্থাকে কোনদিনই বুদ্ধি দিয়ে মেনে নিতে পারেননি। কলকাতা ও নাগপুরে কংগ্রেসে গান্ধীর ওপর তিনি যথেষ্ট চাপও সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল কাউন্সিলে ঢুকে

ভেতর থেকে "ডায়ার্কি" বানচাল করে দেওয়া। শত্রুর সব দুর্বলতার তিনি সুযোগ নেবেন। প্রয়োজন বোধে বৃহত্তর স্বার্থে আপস করতেও তাঁর আপত্তি ছিল না। বড়লাট রিডিং-এর সঙ্গে গোলটেবল বৈঠকে বসলে যদি পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন মেলে, তিনি বসবেন; ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস নিয়ে ভারত সচিব বার্কেনহেডের সঙ্গে যদ মিটমাট হয় করবেন—তাঁর মনোভাব ছিল পুরোদস্তুর বাস্তবপন্থী রাজনৈতিক নেতার, কৌশলে নমনীয় চিত্ত, লক্ষ্যে দৃঢ়। অহিংসাকেও তিনি কৌশল হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন—গান্ধীর মত অপরিবর্তনীয় নীতি হিসাবে নয়। গোপীনাথ সাহার ব্যাপারে, গান্ধীর সঙ্গে তাঁর যে মতানৈক্য হয় তার প্রথম কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গী, দ্বিতীয় কারণ সন্ত্রাসবাদীদের সহযোগিতা ব্যতীত বাংলায় কংগ্রেস সংগঠন চালানো যায় না।

চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্য দল প্রথমেই সাফল্য অর্জন করল, শুধু ভোটে জিতে নয়, পার্লামেন্টরী কৌশলে তিনি ডায়ার্কি বানচাল করেছিলেন। শিক্ষিত মুসলমানদের তিনি পক্ষে আনতে পেরেছিলেন 'বেঙ্গল প্যাক্টে'র সাহায্যে। করপোরেশন ও সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে বা কাউন্সিলে আসন বণ্টনের বেলায় এ ধরনের সন্ধি কার্যকরী হতে পারে কিন্তু সাধারণ মুসলিম কৃষকদের তিনি কি দিলেন? তাদের শিক্ষা না দিলে, তাদের করভার বা দেনার দায় না কমালে তারা পূর্বের মতই সাম্প্রদায়িক বিভেদ বুদ্ধির শিকার ত হবেই। ১৯২৪ থেকে শুরু করে ১৯২৭ পর্যন্ত যে সব দাঙ্গা বাধে তার একটা কারণ রয়েছে এখানে। আরেকটা কারণ রয়েছে লীটনের চালে এবং এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলার স্যার আবদার রহিম ও নবাব মশারফ হোসেনের ষড়যন্ত্রে। সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে নতুন কাউসিলের ৩৯জন মুসলিম সভ্যের ৩৮জনকে জেতালেন তাঁরা। বেঙ্গল প্যাক্ট তলিয়ে গেল। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস এ বিষয়ে দেশবন্ধুকে কোন সহযোগিতা দেয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর প্রজাসত্ত্ব আইন, পৌর আইন ও প্রাথমিক শিক্ষা আইন নিয়ে হিন্দু মুসলিম বিরোধ ঘটল।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁর দলে ভাঙন ধরল নেতৃত্ব নিয়ে। যদি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু ও বীরেন শাসমল এবং তাঁদের পরের সারির নেতৃবৃন্দ বোঝাপড়া করে চলতে পারতেন তাহলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এত জোর পেত না, গঠনমূলক কর্মের ভেতর দিয়ে জনগণের মধ্যে কংগ্রেসের শিকড় দৃঢ় হত। তদুপরি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মত-বিরোধ ক্রমশঃই প্রবল হতে থাকে। ১৯২৭ থেকে ১৯৩১, মাদ্রাজ কংগ্রেস থেকে করাচী কংগ্রেস—প্রায় প্রতি পদক্ষেপেই সুভাষচন্দ্র গান্ধী ও মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। সুভাষ প্রথম দিকে জওহরলাল নেহরু ও অন্যান্য তরুণদের সমর্থন পেয়েছিলেন এবং তাঁদের চাপে মাদ্রাজ কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য ঘোষণা করে। তিনি ও জওহরলাল শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগে যোগ দেন। ১৯২৮-এ কলকাতা কংগ্রেসে তাঁরা প্রস্তাব দেন যে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের বদলে পূর্ণ স্বাধীনতাকেই লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা হোক এবং ইংরেজদের মাত্র এক বছর সময় দেওয়া হোক। প্রকাশ্য অধিবেশনে সুভাষের প্রস্তাব নাকচ হয়। তাতে না ক্ষান্ত হয়ে পরবর্তী লাহোর অধিবেশনে তিনি পুনরায় বৃটেনের সঙ্গে সমূহ সম্পর্ক ছিন্ন করতে আহ্বান জানালেন এবং আইন অমান্য আন্দোলনকে চাষী মজুর তরুণদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমান্তরাল শাসনযন্ত্র তৈরীর দিকে নিয়ে যেতে চাইলেন। বলাবাহুল্য গান্ধী ও নেহরুর সম্মিলিত চেষ্টায় সুভাষচন্দ্র আবার হারলেন। পর বৎসর করাচী কংগ্রেসে গান্ধী-আরুইন চুক্তির তীব্র প্রতিবাদ করলেন তিনি, ভগৎ সিং এর প্রাণ বাঁচাতে না পারায় গান্ধীকে কালো পতাকা দেখালেন। প্রধানত তাঁকে থামিয়ে রাখার জন্যই করাচী কংগ্রেসে মৌলিক অধিকারের প্রস্তাব তোলা হয়।

গান্ধীর আন্দোলন পদ্ধতি, বিশেষ করে ১৯২২ সালের আন্দোলন প্রত্যাহার, সন্ত্রাসবাদীরাও ভাল চোখে দেখেনি। তারা পুনরায় সন্ত্রাসবাদের পথে ফিরে যায় ও হিন্দুস্থান স্যোসালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন গঠন করে। ১৯২৯-এ আইনসভার মধ্যে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত বোমা ফেলেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত বন্দীদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহারের প্রতিবাদে অনশন করে যতীন দাস মৃত্যু বরণ করেন।

সূর্য সেনের পরিকল্পনা অনুযায়ী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয় ও চট্টগ্রামের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। অম্বিকা গুপ্ত, লোকনাথ বল প্রভৃতি দুঃসাহসী অনুচর নিয়ে তিনি জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে যে শৌর্য ও মনোবলের পরিচয় দেন তা আজও প্রবাদ হয়ে আছে। খোদ মহাকরণও এ'দের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়নি। বিনয়-বাদল-দীনেশ তার কক্ষে কক্ষে আত্মঘাতী দেশ-প্রেমের সাক্ষ্য রেখে গেছেন। বাংলায় কংগ্রেসের পক্ষে এসব কার্যকলাপের নিন্দা করা সম্ভব ছিল না। দেশবন্ধুর মত সুভাষ-চন্দ্র বসুও অহিংসাকে নীতিরূপে গ্রহণ করেননি, রণকৌশল রূপে-নিয়েছিলেন। করাচী কংগ্রেসে গান্ধীর চাপে সন্ত্রাসবাদ অনুমোদন-সূচক প্রস্তাব যে ভাবে পরিবর্তিত হয় তা তাঁরা পছন্দ করেননি কিন্তু শুধু সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের দিকেই দৃষ্টি আবদ্ধ করলে চলবে না। মেদিনীপুরের অশিক্ষিত কৃষক বা উত্তর প্রদেশের অশিক্ষিত কিষাণ যে ভাবে খাজনা-বন্ধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও গুর্খা পিটুনি পুলিশের অকথ্য অত্যাচার সহ্য করে ও ঘর বাড়ী জমি ধ্বংস হতে দেখেও সংগ্রামে অটল থাকে তা অভাবনীয়। মহিলাদের অবদানও কম নয়।

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৭ সুভাষচন্দ্র হয় কারাবাসে ছিলেন না হয় ইউরোপে। ইতিমধ্যে ১৯৩৫ সালের শাসন সংস্কার মেনে না নিয়েও কংগ্রেস ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। বাংলার আইন সভার ২৫০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিল মাত্র ৫৪টি আসন, মুসলিম লীগ ৩৯টি। মোট মুসলিম সদস্য সংখ্যা ছিল ১১৭, তার মধ্যে লীগ ঠিক ১/৩ আসন পেয়েছিল—বাকীটা পেয়েছিল ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি ও কিছু নির্দল মুসলমান। ১৯২৭ সালে নিখিলবঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতি নামে একটি পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন ফজলুল হক। মুসলিম লীগের নেতৃত্ব পদে আসীন থাকলেও এই সমিতি ছিল হকের শক্তি ও প্রভাবের ভিত্তি। অবাঙালী উর্দুভাষী মুসলমানদের কর্তৃত্ব তিনি ঠিক সহ্য করতে পারেননি। লীগের প্রচন্ড সাম্প্র-দায়িক দৃষ্টিভঙ্গীও তাঁর পছন্দ হয়নি। পীড়নমূলক আইনের প্রতিবাদ করে তিনি বৃটিশ আমলাদের কুনজরে পড়েন। সবচেয়ে বড়ো কথা, কৃষকদের জন্য তাঁর দরদ ছিল গভীর। পাটের দাম বেঁধে, মহাজনদের শৃংখল মোচন করে, প্রজাস্বত্ব আইন বদলে ও খাজনার হার কমিয়ে, রাষ্ট্রীয় বিপণনের ব্যবসা করে, ভারী শিল্প নির্মাণের ব্যবস্থা করে, শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরী হার ঠিক করে অর্থাৎ বাংলার গ্রামীণ ও কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতিকে সাধা-রণের উপকারে ঢেলে সাজার নতুন একটা পথ দেখালেন তিনি। মুস্কিল হল, জিন্না প্রথম থেকেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড তাঁরই নির্দেশে গঠিত ও পরিচালিত হবে। তাঁর বোর্ডের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন—ইস্পাহানী ও সুরাবর্দি। অধিকাংশ সদস্য জমিদার ও ধণিক শ্রেণীভুক্ত; ঢাকার নবাব, স্যার নাজিমুদ্দিন ও নবাব ফারুকী যাঁদের অন্যতম। এ'দের সঙ্গে আবার রাইটার্স বিল্ডিং-এর আমলা ও ক্লাইভস্ট্রিটের বণিকদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ঠিক তাঁদের সঙ্গে হকের সমঝোতা হল না।

১৯৩৭-এর নির্বাচনে বেআইনী কম্যুনিস্ট পার্টির কৃষক সভা ও হকের কৃষক প্রজা সমিতি কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সমর্থন করে। হক আশা করেছিলেন কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্থায়ী সরকার স্থাপন করতে পারবেন ও বাংলার রাজনীতিকে একটা সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সুস্থ রূপ দেবেন। কিন্তু বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কংগ্রেস-কৃষক-প্রজা কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করতে সম্মতি দেননি। কংগ্রেসের এই মারাত্মক ভুলের ফসল লক্ষ লক্ষ বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানকে তুলতে হয়েছে গায়ের রক্তে ও চোখের জলে। হক এ কথা কোনদিন ভুলতে পারেননি।

১৯৩৬-এর ২ সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ত্রিপুরার জনপ্রিয় নেতা মৌলবী আশরাফুদ্দিন আহমদ চৌধুরীর পরামর্শে যুক্ত নির্বাচন প্রথা ও প্রাপ্তবয়স্কের ভোটা-ধিকারের ভিত্তিতে মুসলমানদের সঙ্গে বোঝা পড়ার প্রস্তাব নেন ও কম্যুন্যাল এওয়ার্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাবার শপথ নেন। জওহরলাল নেহরু মনে করেন যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রাদেশিক কমিটি সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির বিরুদ্ধে যাচ্ছেন এবং শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে তিনি বাদানুবাদে লিপ্ত হন। বাংলা-দেশের সমস্যা কেন্দ্রীয় কংগ্রেস আদৌ বুঝতে পারছিলেন না। এরই পরিণতি কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান।

এভাবে কংগ্রেস হককে জিন্নার কোলে নিক্ষেপ করে। তিনি সক্রিয়ভাবে লীগে যোগ দেন। বাংলাদেশে লীগের ও অবাঙালী মুসলিম প্রভাবও বেড়ে চলে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম নেতাদের প্রভাব। ফজলুল হককে লীগের ও সাহেবদের উপর নির্ভর করে চলতে হয়। প্রথমে নৌসের আলি ও পরে নলিনী সরকার বিদায় নেবার পর লীগ মন্ত্রীরাই প্রকৃত কর্ণধার হন। করপোরেশন, শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলমানদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম প্রভাব বাড়িয়ে ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গঠনে তাঁরা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি করেন। ১৯৩৮ সালে কলকাতায় লীগের বিশেষ অধিবেশনে হক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বহু দায়িত্বহীন কটূক্তি করে ব্যাপারটা ঘোরালো করে তোলেন।

১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ইংরেজের চির শত্রু তিনি। হোম সেক্রেটারী হ্যালেটের মতে তিনিই যুগান্তর প্রভৃতি সন্ত্রাসবাদী দলের আসল কর্তা। কংগ্রেসের একদল ভাবতেন তিনি ফাঁসিবাদী। এর কোনটাই সত্য নয়। সহিংস আন্দোলনকে তিনি অহিংস আন্দোলনের পরিপূরক মনে করতেন, সন্ত্রাসবাদীদের প্রভাব অস্বীকার করা তাঁর বা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। তেমনি স্বাধীনতা পাবার জন্য তিনি যে কোনও বিদেশী শক্তির সাহায্য নিতে প্রস্তুত ছিলেন, সেখানে ফাসিবাদ-বা সাম্যবাদ এ বিচার করতে রাজী ছিলেন না। অর্থাৎ আগাগোড়া তিনি বেশ বাস্তববাদী ছিলেন। সমাজতন্ত্র নিয়ে তিনি ফেবিয়ান-সুলভ বাগাড়ম্বর বিস্তার করেননি কিন্তু প্ল্যানিং-এর প্রতি তিনিই প্রথম দৃষ্টি আরোপ করে দেখিয়ে দেন দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বা জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নতিই তাঁর অভিষ্ট।

হরিপুরায় সভাপতির ভাষণে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিলেন—বল্লেন, তাদের না তাড়ালে তারা দেশ ভাগ করবে। তাঁর সন্দেহ হ'ল দক্ষিণপন্থীরা ফেডারেশনের ব্যাপারে ইংরেজদের সঙ্গে সমঝোতা চায়। ১৯৩৯ সালের গোড়ায় তিনি দ্বিতীয়বার সভাপতির পদ চাইলেন। গান্ধীজী আপত্তির কারণ না জানিয়ে প্রথমে নেহরু ও পরে সীতারামায়াকে আপন পছন্দের লোক বলে ঘোষণা করলেন। সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্য ছজন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য বল্লেন—পুনর্নির্বাচন বাঞ্ছনীয় নয়। তুমুল বাদবিতণ্ডার মধ্যে নির্বাচন হলে সুভাষ জিতলেন। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের ব্যাপারে গান্ধীজী কিছুতেই তাঁকে সাহায্য করলেন না। ত্রিপুরী কংগ্রেসের পূর্বেই গান্ধীজীর সম্মতিতে ওয়ার্কিং কমিটির বারজন সদস্য পদত্যাগ করলেন। ত্রিপুরীতে সুভাষ ইংরেজকে চরমপত্র দিতে চাইলেন—তাঁর ধারণা ছিল ইউরোপে যে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা দরকার। কিন্তু বাংলার প্রতিনিধিদের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মূল প্রস্তাবে চরমপত্রের স্থান হল না। এরপরও গোবিন্দবল্লভ পন্থ এমন এক প্রস্তাব তুল্লেন যা সুভাষের প্রতি অনাস্থার তুল্য। সুভাষ গান্ধীজীকে নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু গান্ধীজী তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনার সময় পেলেন না। সুভাষ-গান্ধী পত্রালাপ পড়লে মন বিষাদে ভরে ওঠে। বহু অশোভন ঘটনা পরম্পরায় কলকাতার এ, আই, সি, সি,-তে সুভাষ পদত্যাগ করেন। সুভাষচন্দ্র ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করায় তাঁকে কংগ্রেস থেকে বের করে দেওয়া হয়। ১৯৪১-এর জানুয়ারীতে সরকারের চোখে ধুলা দিয়ে তিনি প্রথমে জার্মানী ও পরে জাপান চলে যান।

বাংলার কংগ্রেস এভাবে যখন লাঞ্ছিত, পর্যুদস্ত, বিভক্ত, দুর্বল সে সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রচন্ড ধাক্কা লাগল। প্রথমে মূল্যবৃদ্ধি, ও তারপরে জাপানী আক্রমণের আতঙ্ক, বন্যা ও দুর্ভিক্ষ বাংলার অর্থনৈতিক জীবন ও নৈতিক মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে দিল। জাপানী আক্রমণের প্রতিরোধ কল্পে সরকার নিলেন denial policy. পূর্ববঙ্গে যানবাহনের ও খাদ্য সরবরাহের প্রধান উপায় নৌকা কেড়ে নেওয়া হল। খাদ্যশস্য শত্রুর হাতে যাতে না পড়ে তার জন্য তা নষ্ট করা হল বা সরিয়ে নিয়ে আসা হল। বন্যার ফলে হল অজন্মা। তার পূর্ণ সুযোগ নিল মজুতদার, কালোবাজারী, মুনাফাবাজ। ইংরেজদের চোখের সামনে, স্বয়ং ছোটলাট হার্বাটের প্রশ্রয়ে তাদের তল্পিবাহকরা ভয়াবহ মন্বন্তর সৃষ্টি করল। যখন মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্য-

বাহিনী কলকাতায় ঘাঁটি গাড়ল আর সামরিক কণ্ট্রাক্টের কৃপায় কোটি কোটি টাকার স্রোত বয়ে গেল তখন অভাবে স্বভাব নষ্ট হ'ল। গণমৃত্যুর চেয়ে বড়ো ট্রাজেডি ঘটে গেল—বাঙালী চরিত্রের অধঃপতন।

১৯৪০ সালের ১৫ অক্টোবর গান্ধী ব্যক্তিগত সত্যাগহ শুরু করেছিলেন। ১৯'৪২-এর প্রথম থেকেই গণ আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছিল। যুদ্ধের গতি ইংরেজদের বিপক্ষে যাওয়ায় এবং ভারতবর্ষে সম্ভাব্য বিদ্রোহ এড়াবার জন্য ক্রিপস মিশন এল (২৩ মার্চ)। কিন্তু প্রকারান্তরে পাকিস্তান দাবী মেনে নেওয়ায় ও কোনো ভারতীয়কে আরক্ষার দায়িত্ব দিতে রাজী না হওয়ায় কংগ্রেস ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। ভারত সরকার আসন্ন বিপদ বুঝে লীগের সহযোগিতা চাইলেন। বেআইনী কম্যুনিস্ট পার্টি নিজের থেকেই সহযোগিতা দিতে রাজী। ১৯৪১ সালে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করার পর রুশ সরকারের ইঙ্গিতে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বিরোধী নীতি রাতারাতি বদলে গেল। যুদ্ধ হয়ে দাঁড়াল জনযুদ্ধ। ক্রিপস ভারতে এলে কমুনিস্টদের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে সহযোগিতার প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং কারারুদ্ধ কম্যুনিস্টদের মুক্তি চাওয়া হয়। ক্রিপসের অনুরোধে বড়লাট এ সময় বহু রাজবন্দী ছাত্র ও যুবনেতাকে মুক্তি দেন। কিন্তু মে মাস পর্যন্ত এদের সম্বন্ধে সরকার খুব সন্দিগ্ধ ছিলেন। ১৯৪২ সালের ৪ মে বোম্বাই-এর ছোটলাট লামলি বড়লাটকে লিখলেন যে এন, এম,, যোশী তাঁকে একটা প্রস্তাব দিয়েছেন, তাতে কারো সই নেই, তবু মনে হয় তা ডাঃ অধিকারী ও পি, সি, যোশীর রচনা। তাঁরা যুদ্ধের ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা করতে চান, এমনকি সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর রংরুট সংগ্রহে সাহায্য করবেন। তাঁর ভয় ছিল এতে শ্রমিক আন্দোলন বাড়বে এবং ধনিক শ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী শঙ্কিত হয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দিয়ে একটা বড়ো আন্দোলন করার সুযোগ পাবে। বিহারের ছোট লাট স্টুয়ার্টও দ্বিধান্বিত ছিলেন। বাংলার ছোট লাট ভয় করছিলেন যে ফাসি বিরোধের ভান করে তারা নিজের কাজ গুছিয়ে নেবে।

সরকার তাই লীগের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। ইতিমধ্যে ডিফেন্স কাউন্সিলের সদস্য পদ নিয়ে জিন্নার সঙ্গে হকের বিরোধ হয়। ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে লীগ মন্ত্রীরা হঠাৎ পদত্যাগ করে হককে বিপদে ফেলেন। হক তখন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এতে শরৎচন্দ্র বসুরও সমর্থন ছিল। এই পরিস্থিতিতে হকের কংগ্রেস বিরোধী ভূমিকা নেওয়া সম্ভব ছিল না। একথা বুঝেই মে মাসে তাঁকে হয় ক্যানাডার না হয় অস্ট্রেলিয়ার হাই কমিশনার করে সরিয়ে দেওয়ার কথা বড়লাট ও ভারত সচিব ভাবেন। ১৬ জুলাই বড়লাট হার্বার্টকে লেখেন হককে বুঝিয়ে গান্ধীর বিরুদ্ধে statement দেওয়াতে। ২৩ জুলাই এর উত্তরে হার্বার্ট তাঁর ব্যর্থতার কথা জানান। অতএব হকের পতন ঘটানো কি জিন্না কি ইংরেজ প্রভুদের পরম কাম্য হয়ে ওঠে। ব্যাপার সুবিধার নয় দেখে হক আবার লীগে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু জিন্নার সঙ্গে পত্রালাপে তিনি দাবী করেন যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার সদস্য পদ স্থির করবেন আইন সভার মুসলিম সদস্যবৃন্দ। জিন্না এ প্রস্তাবে রাজী হতে পারেন না। পত্রাবলী প্রকাশ করে দিয়ে তিনি হককে নিজের দল ও জনসাধারণের কাছে অপদস্থ করলেন এবং ১৯৪৩ এর মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কাউন্সিলের ছটি আসনই লীগ দখল করল। এর মধ্যে বেশীর ভাগ আসনই ছিল পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে। বেশ বোঝা যায় যে ১৯'৪৩-এর মাঝামাঝি ইস্পাহানি—নাজিমুদ্দিন—সুরাবার্দির প্রচার বেশ সফল হয়েছিল। অদ্ভুত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হক গভর্ণরকে বলেন—জাতীয় সরকার স্থাপিত হলে তিনি পদত্যাগ করতে রাজী। ২৮ মার্চ সার জন হার্বার্ট তাঁকে লাট ভবনে ডেকে প্রায় জোর করে পদত্যাগ পত্র আদায় করেন। ২৯-এ মার্চ বিধানসভায় হক এ কথা ঘোষণা করলে স্পীকার নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সভা মুলতুবি করে দেন। ফলে গভর্ণর ৯৩ ধারা অনুসারে শাসনভার হাতে নিতে বাধ্য হন। কিন্তু জাতীয় সরকার গঠন করা দূরের কথা এক মাসের মধ্যেই খাজা নাজিমুদ্দিন লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। কংগ্রেসের নির্দেশ অমান্য করে তুলসী গোঁসাই ও বরদা পাইন এই মন্ত্রীসভায় যোগ দেন।

বলাবাহুল্য তদানীন্তন আমলাতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রের ফলেই বাংলা বিভাগের পথ প্রস্তুত হল। সুরু হল নাজিমুদ্দিন ও পরে সুরাবর্দির কলঙ্কিত সাম্প্রদায়িক রাজত্ব। এ আমলে দেশে যে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তার একমাত্র তুলনা ১৭৭০ সালের মন্বন্তর। মনুষ্য সৃষ্ট এই দুর্ভিক্ষে কত প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে আজও তার নিরিখ হয়নি।

১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল অধিকাংশ কংগ্রেস নেতাই কারারুদ্ধ ছিলেন। তাঁদের অনুপস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নেয় লীগ। ১৯৪৪ সালে গান্ধী ও জিন্না আলোচনার ফলে এবং ১৯৪৫ সালে সিমলা কনফারেন্সে ওয়াভেল জিন্নাকে অত্যধিক গুরুত্ব দিলেন বলে তাঁর প্রভাব খুব বেশী বেড়ে যায়। ইতিমধ্যে বাংলায় নাজিমুদ্দিন ও সুরাবর্দিতে দলীয় কোন্দল বাড়ে এবং নাজিমুদ্দিন জিন্না-লিয়াকতের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করে ও শ্রীহট্টের এম, এল, দের হাত করে সুরাবর্দিকে হঠিয়ে দেন। ১৯'৪৬ সালে যে নির্বাচন হ'ল তাতে সারা ভারতে প্রাদেশিক আইন-সভার মোট ৫০৯টি মুসলিম আসনের ৪৪২টি পায় লীগ। কেন্দ্রীয় আইন সভার সমস্ত মুসলিম আসন পায় লীগ। বাংলার আইন সভার ১১৭টি মুসলিম আসনের ১১৩টি প্রায় লীগ। কংগ্রেস পায় ৮৭টি আসন। অতএব লীগকে পুনশ্চ কোয়ালিশনের কথা ভাবতে হ'ল। আইনসভার দলীয় নির্বাচনে নাজিমুদ্দিনকে হারিয়ে সুরাবর্দি লীগদলপতি হয়ে ছিলেন। তিনি কিরণশঙ্কর রায় ও মৌলানা আজাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করেন। আজাদ হককে স্বীকার করতে চাইলে সুরাবর্দি আপত্তি করেন। সুরাবর্দির নেতৃত্বে এপ্রিলে যে মন্ত্রীসভা গঠিত হয় তা প্রধানতঃ সাহেব বণিক ও নির্দলীয় সভ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল।

ইতিমধ্যে ক্যাবিনেট মিশনের খসড়া প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেস ও লীগের বিরোধ তীব্রতর হ'ল। কংগ্রেস অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় ওয়াভেল লীগের সরকার গঠনের দাবী নাকচ করেন। নবনির্বাচিত কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট জওহরলাল নেহরুর গ্রুপিং প্রথার ব্যাখ্যা জিন্নাকে আরও ক্ষেপিয়ে দিল। তিনি ১৬ আগস্ট "direct action" বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিলেন। ফলে কলকাতায় তিনদিন ধরে ভয়াবহ দাঙ্গা চলল এবং বহু প্রাণহানি ঘটল। এর জন্য অনেকাংশে দায়ী নাজিমুদ্দিন ও ইংরেজরা। নাজিমুদ্দিনের উদ্দেশ্য পরিষ্কার—হিন্দুনিধন ও সুরবর্দির ওপর সব দোষ চাপিয়ে তাঁকে বিতাড়ন। ইউরোপীয় বণিকদের প্রধান ঘাঁটি ছিল কলকাতা। তাদের প্রধান মিত্র ছিল আই, সি, এস সম্প্রদায়। তারা নাজিমুদ্দিনকে নিজেদের পেয়ারের লোক ঠিক করেছিল। তারাই প্রকাশ্যে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনে। লক্ষ্যণীয় যে ক্যাবিনেট মিশন ভারতে পদার্পণ করার পূর্বেই অর্থাৎ দাঙ্গার পাঁচ মাস পূর্বেই ইউরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট এক গোপন সার্কুলার প্রচার করে আসন্ন দাঙ্গা সম্বন্ধে সতর্ক করে দেন ও কি কি ব্যবস্থা আত্মরক্ষার্থ গ্রহণ করতে হবে তার নির্দেশ দেন। তবে সময়োচিত হস্তক্ষেপে দাঙ্গা থামান যেত। মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দি সে সৎসাহস দেখাননি, কারণ তাতে লীগ থেকে বহিষ্কৃত হবার আশঙ্কা ছিল। ছোটলাট ফ্রেডেরিক বারোজ অপদার্থতার চরম দেখিয়েছেন। সুরাবর্দি ১৭ আগস্ট সৈন্য নামাবার প্রস্তাব দেবার পূর্বেই তাঁর জরুরী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় নোয়াখালি ও বিহারে সাম্প্রদায়িক আগুন ছড়িয়ে পরে। সেদিন মহাত্মা যদি জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামে পদযাত্রা করে শান্তি ও অভয়ের বাণী না শোনাতেন তাহলে বোধহয় গৃহযুদ্ধে পূর্ব ভারত ধ্বংস হয়ে যেত। একমাত্র মহাত্মাই এসবের পশ্চাতে ইংরেজের হাত দেখেন—যে ইংরেজ "আই, এন, এর" জনপ্রিয়তা দেখে, বোম্বাই-এর নৌ বিদ্রোহ দেখে ও রসিদ আলি দিবসে কলকাতার ছাত্র-ছাত্রীর অনমনীয় দৃঢ়তা দেখে বুঝেছিল যাবার দিন আগত, যাবার আগে ভারত ভাগ করে দিয়ে যেতে হবে। দাঙ্গাতে তাদের হাত ছিল। নেহরু যখন শুধু কংগ্রেস দল নিয়ে অন্তবর্তী সরকার গঠন করলেন তখন বড়লাটের উপর চাপ দিয়ে তারা লীগকেও সরকারের মধ্যে নিয়ে এল। বিলাতের মন্ত্রীসভার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ওয়াভেল এটা করেন। কেন্দ্রের অন্তবর্তী মন্ত্রীসভায় কংগ্রেস-লীগ বিরোধ চরমে ওঠে। লীগ কিছুতেই Constituent Assemblyতে যোগ দিচ্ছিল না।

১৯৪৭-এর প্রথমে আবার সেই প্রশ্ন ওঠে—পাকিস্তান না অখণ্ড ভারত?

অ্যাটলি উভয় দলকে মনস্থির করতে বাধ্য করলেন ২রা ফেব্রুয়ারীর ঘোষণায় যে ভারতীয় দলরা একমত হ'ক বা না হ'ক ১৯৪৮-এর জুনের মধ্যেই ইংরাজরা ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। মাউন্টব্যাটেন হলেন নতুন বড়লাট। ১লা মে নেহরু তাঁকে স্পষ্টই বল্লেন, যদি ভারত ভাগ হয় তবে পাঞ্জাব ও বাংলাকেও ভাগ করতে হবে। তবু মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের যে প্রথম খসড়া বিলাত পাঠান তাতে শুধু বাংলা-দেশের বা পাঞ্জাবের জন্যই ভোটাভুটির কথা ছিল না, কংগ্রেসী প্রদেশগুলি, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও বেলুচিস্তানে ভোট নিয়ে ভবিষ্যৎ নির্ধারণের কথা ছিল। ১০ই মে নেহরুকে সে খসড়া দেখাতে তিনি তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন এবং তখন ৩রা জুনের দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচিত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সুরাবর্দি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করার প্রস্তাব তোলেন এবং শরৎচন্দ্র বসু অনুরূপ আরেক প্রস্তাব দেন। মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতিতে যে সুরাবর্দি-বসু আলোচনা চলে তা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা মনে করে এ প্রস্তাবের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বাংলায় মুসলিম প্রাধান্য বজায় রেখে পাকিস্তানের পথ সুগম করা। ভারতের অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলার যোগসূত্র ছিন্ন করতেও তাঁরা রাজী ছিলেন না। সুরাবর্দি আবদার ধরেন যে কল-কাতাকে উভয় রাষ্ট্রের যৌথ নিয়ন্ত্রণে ছমাস রেখে অন্ততঃ দেখা যাক। মাউন্টব্যাটেন এ প্রস্তাব নিয়ে ভি, পি, মেননকে প্যাটেলের কাছে পাঠান। প্যাটেলের উত্তর ঐতিহাসিক হয়ে আছে—"ছ ঘণ্টার জন্যও নয়।" নাজিমুদ্দিনের উপদলও স্বাধীন বাংলার বিরোধিতা করেন, কারণ সে বাংলা জিন্নার নির্দেশে চলবে না। এসব কারণে বঙ্গভঙ্গ অবধারিত হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বিধানসভায় এ বিষয়ে ভোট গ্রহণ হলে, পশ্চিম-বঙ্গের সভ্যরা ৫৮—২১ ভোটে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে রায় দেন।

কার্জন যা করতে পারেননি ১৫ আগস্ট সে কাজ করলেন মাউন্টব্যাটেন। বাংলার মাটি, জল, ভাই, বোন চিরকালের মত আলাদা হয়ে গেল আর তার পিছু ধরে এল সর্বনাশা উদ্বাস্তু-সমস্যা। বাংলার রাজনৈতিক গুরুত্বই শুধু নষ্ট হল না তার অর্থনীতি এমন প্রচণ্ড আঘাত খেল যে আজও তার দাগ মেটেনি। এর জন্য শুধু মাউন্টব্যাটেন বা সুরাবর্দিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই—এর জন্য দায়ী আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষ। "দোষ কারও নয় ভাই, এ তোমার এ আমার পাপ?"

অন্নদাশঙ্কর রায়
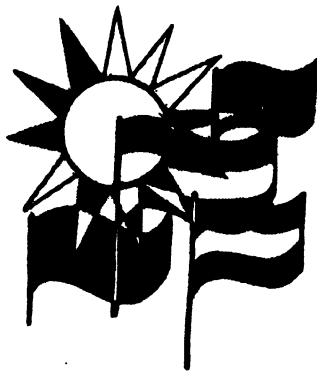
"মোসলেম ভারত" কথাটি পঞ্চাশ বছর পূর্বেও শোনা যেত। কিন্তু সেই অঞ্চলটি যে কোথায় অবস্থিত তা কেউ বলতে পারতেন না। ভারতের সর্বত্র যাদের বাস তাদের জন্যে সংকীর্ণ একটি বাসভূমি চাই এ ধরনের দাবী ওঠে ত্রিশের দশকে। পাকিস্তান নামক শব্দটি গোড়ার দিকে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যেই কল্পিত হয়। এমন কি ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবেও মুসলিম লীগ স্পষ্ট বলেনি যে মুসলমানদের জন্যে আলাদা করে একটিমাত্র রাষ্ট্র চাই। পাকিস্তান শব্দটিও ব্যবহার করা হয়নি। সমগ্র বাংলাদেশ যে পাকিস্তান নামক একটিমাত্র মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবে এটাও সুনির্দিষ্ট হয়নি।

মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে কথাবার্তার সময় ১৯৪৭ সালেই বুঝতে পারা গেল যে পাকিস্তান বলতে একটিমাত্র রাষ্ট্র বোঝাবে ও মুসলিম লীগ তার জন্যে সারা বাংলাদেশ দাবী করবে। এতে বাঙালী হিন্দুদের প্রবল আপত্তি। বাংলাদেশ ভাগ হয়ে যাক এটা তাঁদের কাম্য নয়, অথচ তার সবটাই পাকিস্তানে যাবে এটাও তাঁরা সহ্য করবেন না। বাংলাদেশ ভাগ হয়ে যাক বাঙালী মুসলমানরাও কি এটা চান? না, প্রদেশভাগে তাঁরাও প্রথমে রাজী ছিলেন না। সুহরাবর্দী সাহেব তো নতুন এক প্রস্তাব পেশ করলেন যে বাংলাদেশ অবিভক্ত রূপে ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের বাইরে থাকবে। শরৎচন্দ্র বসু তাঁর সমর্থন করেন। গভর্নর তাঁর সমর্থন করেন। এমন কি মহাত্মা গান্ধীর কথাবার্তা শুনে মনে হলো তিনিও তাঁর সমর্থক। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা ছিলেন বলকানীকরণের বিরোধী। ভারতবর্ষকে তাঁরা দু'ভাগ হতে দেবেন, তিন ভাগ বা বহুভাগ নয়।

এমনি নিয়তির খেলা যে ভারতবর্ষ আজ তিন ভাগ হয়েছে। তৃতীয় ভাগটির নাম বাংলাদেশ। অবিকল সেই নাম যা সুহরাবর্দী সাহেব চেয়েছিলেন। কিন্তু অবিকল সেই রূপ নয়। পূর্ববাংলা এখন পাকিস্তানের বাইরে, পশ্চিমবাংলা কিন্তু

ভারতের বাইরে নয়। পূর্ববাংলা অর্থাৎ বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, পশ্চিমবাংলা স্বাধীনও নয়, সার্বভৌমও নয়, রাষ্ট্রও নয়। তবে ভারত নামক একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অঙ্গ। দুই বাংলা বলতে এতকাল যা বোঝাত এখন আর তা বোঝায় না। আগে ছিল দুটোই দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য বা প্রদেশ। আমরা বলতুম এপার বাংলা ওপার বাংলা। এখনও অভ্যাসবশে বলি। আমার প্রবন্ধের নামকরণও অভ্যাসবশে। বাংলাদেশ এখন সমকক্ষের মতো ভারতের সঙ্গে সন্ধি করছে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করছে। দু'দিন বাদে ইউনাইটেড নেশনসের সদস্য হবে। তা হলে কোন সুবাদে একনিঃশ্বাসে বলি এপার বাংলা ওপার বাংলা? কিংবা পূর্ববাংলা পশ্চিমবাংলা?

বলি এইজন্যে যে আমার এই প্রবন্ধটির বিষয় হচ্ছে গত পঁচিশ বছরের বিবর্তন। পঁচিশ বছরের চব্বিশটি বছর তো দুই বাংলাকে নিয়ে। যদিও ওপার বাংলার সরকারী নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। তাও প্রথম সাত আট বছর নয়।

বাংলাদেশ আগেও একবার দুভাগ হয়েছিল। আমাদের সকলের ধারণা ছিল এবারেও পূর্ববাংলা বলতে বোঝাবে একটি অঞ্চল, যেমন পশ্চিমবাংলা বলতে একটি অঞ্চল। দুটোই বাংলাদেশের অঙ্গ। দুই অঙ্গ পৃথক হলেও ডান হাত আর বাঁ হাতের মতো একই রকম। কিন্তু দেখা গেল এবারকার পূর্ববাংলা তা নয়। সে পাকিস্তান নামক একটি দেশের অঙ্গ, ভারতেরও নয়, বাংলাদেশেরও নয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল দ্বিজাতিতত্ত্ব। সেই তত্ত্ব অনুসারে পূর্ববাংলার স্থানীয় মুসলমানদের যে অধিকার বহিরাগত মুসলমানদেরও সেই অধিকার। তারাও সমান পাকিস্তানী। সমান পূর্ব পাকিস্তানী।

অপর পক্ষে স্থানীয় হিন্দুরা তা নয়। তারা পাকিস্তানের মুসলিম নেশনের অংশ হতে পারে না। তারা হিন্দুস্তানের হিন্দু নেশনের অংশ। তারা যদি বাস করতে চায় অনধিকারীর মতো বাস করতে পারে। কিন্তু অধিকারী হতে হলে তাদের মুসলমান হতে হবে। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটিও একটি ইসলামী রাষ্ট্র। সে রাষ্ট্রের ঐতিহ্য হলো এই যে সেখানে ইহুদী ও খৃষ্টানরা জিম্মি। কিন্তু পৌত্তলিকরা তাও নয়। পৌত্তলিকদের হয় ধর্মান্তরিত হতে হবে, নয় দেশত্যাগ করতে হবে, আর নয়তো মরতে হবে।

পূর্ববাংলার মুসলমানরা যখন পাকিস্তানের রব তুলেছিল তখন তারা জানত না যে তাদের পশ্চিম পাঞ্জাবের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে। কারণ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে অমন কোনো কথা ছিল না। সে প্রস্তাবে পাকিস্তান শব্দটাই ব্যবহার করা হয়নি। সেই শব্দটি যাঁদের উদ্ভাবন তাঁরা পশ্চিম প্রান্তের মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলির আদ্যক্ষর জুড়ে জুড়ে পাকিস্তান বানিয়েছিলেন সেই ক'টি প্রদেশের লোকদের জন্যেই। সারা ভারতের মুসলমানদের জন্যেও নয়, বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্যেও নয়। তাঁরা স্থানীয় হিন্দু শিখদের বাদ দিতেও চাননি, অনধিকারী করতেও চাননি। এমন কথাও তাঁরা উচ্চারণ করেননি যে পাকিস্তান হবে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত। কিংবা পাকিস্তান হবে ইসলামী রাষ্ট্র।

এই ক্রমবিকাশটি ঘটে ১৯৪০ ও ১৯৪৭ সালের মধ্যে। অধিকাংশ বাঙালী মুসলমানের অজ্ঞাতসারে। এঁরা ভাবতেই পারেননি যে পশ্চিমবাংলা থাকবে পাকিস্তানের বাইরে। কিন্তু দেশভাগের জন্যে এঁরা এমন অস্থির হয়েছিলেন যে প্রদেশভাগও এঁরা মেনে নিতে বাধ্য হন। তার পরে একটু একটু করে উপলব্ধি করেন যে পূর্ববাংলা শুধু স্থানীয় মুসলমানদের জন্যে নয়, সমগ্র মুসলিম নেশনের জন্যে, সুতরাং বহিরাগত বিহারী, ওড়িয়া, মধ্যপ্রদেশী, দক্ষিণী, গুজরাতী, পাঞ্জাবী মুসলমানদেরও জায়গা দিতে হবে। আর তারা যদি ঝাঁকে ঝাঁকে আসে তাদের স্থান দিতে হলে হিন্দুদেরও স্থানচ্যুত করতে হবে।

তার পরে এটাও দেখা গেল যে বহিরাগতরাই সাচ্চা মুসলমান। তাদের জবানই সাচ্চা ইসলামী জবান। তাদের সংস্কৃতিই সাচ্চা ইসলামী সংস্কৃতি। তারা শুধু বাস করতে আসেনি, প্রভুত্ব করতে এসেছে। হিন্দুদের ভাষা বাংলাকে তারা হটাবেই, তা যদি না পারে তবে তাকে উর্দুর অনুরূপ করবে। তার হরফ হবে আরবী। তাতে প্রচুর আরবী ফারসীর মিশাল থাকবে। মিশাল তো ভারতচন্দ্রের ভাষাতেও ছিল। না, সেটুকুতে হবে না। মুসলমানদের একশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত পুঁথিসাহিত্যের মতো হওয়া চাই। যেটা অধিকাংশের মধ্যে অপ্রচলিত। ধর্মের নামে সেই পুরোনো ভূতকে সাধারণ বাঙালীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার উদ্যোগ হলো এই আশায় যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা ও সংস্কৃতি এখন থেকে একাকার হবে। স্থানীয় ও বহিরাগত মুসলমানে ভেদ থাকবে না। হলোই বা এতে বহিরাগতদেরই সুবিধে, স্থানীয়দের অসুবিধে। ইসলামের জন্যে, পাকিস্তানের জন্যে আত্মসত্তা বিসর্জন দিয়ে বাঙালী যদি অবাঙালীতে পরিণত হয় তা হলে এমন কী ক্ষতি হবে!

পাকিস্তান প্রাপ্তির উল্লাসে অনেকেই ভুলে যায় তাদের বাঙালী সত্তা। ভারতীয় সত্তা। "মোসলেম ভারতে"র দ্বিতীয় শব্দটা মন থেকে মুছে যায়। প্রথম শব্দটাই একমাত্র হয়। এককালে শোনা যেত, "আমরা আগে মুসলমান পরে ভারতীয়", কিংবা "আগে ভারতীয় পরে মুসলমান"। এখন আর ওসব কথা শোনা গেল না। তার বদলে শোনা গেল, "আমরা মুসলমান, অতএব পাকিস্তানী। আমরা মুসলমান, অতএব ইসলামী রাষ্ট্রের একমাত্র অধিকারী। আমরা মুসলমান, অতএব উর্দুভাষী বা উর্দুর মতো যে বাংলা সেই রকম বাংলাভাষী। আমরা মুসলমান, অতএব আমাদের সংস্কৃতি অবিমিশ্র মুসলিম, অর্থাৎ মধ্যযুগের তথা মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতি। যারা এসব স্বীকার করবে না তারা প্রচ্ছন্ন হিন্দু, তারা কাফের।"

সংবিধান তৈরি হবে, তার আরম্ভ হবে আল্লাকে দিয়ে। ইসলামের সনাতন আইন যে শরিয়ৎ তাই হবে একটি আধুনিক রাষ্ট্রের যে সংবিধান তার ভিত্তি। বর্তমান জগতের সঙ্গে তেরোশো বছর আগেকার আরবদেশের সাদৃশ্যই খুঁজে পাওয়া যায় না, তবু সেই ছাঁচে ঢালাই হবে বর্তমান রাজনীতি ও অর্থনীতি। শিক্ষা ও সংস্কৃতি। আসলে লীগপন্থীরা স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামই করে নি, সেটা পেয়ে গেছে ভারতের স্বাধীনতার বখরা হিসাবে। তাই স্বাধীনতার মূলসূত্রগুলি শেখেনি। সংবিধান রচনা করবে কী অবলম্বন করে?

বাঙালীকে অবাঙালীতে পরিণত করার প্রয়াস ব্যর্থ হয়, যখন ভাষার প্রশ্নে ঢাকায় কয়েকজন তরুণ নিহত হয়। তারা জান দিল, জবান দিল না। এর পরে মুসলিম লীগ নির্বাচনে হেরে যায়। বাংলাকেও উর্দুর সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করা হয়। সেইভাবে প্রথম অধ্যায়টা শেষ হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় আর বাঙালীকে অবাঙালীতে পরিণত করার প্রয়াস নয়। বাঙালীকে তামাম পাকিস্তানে মাইনরিটিতে পরিণত করার কৌশল। এটারও একটা ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। নবগঠিত পাকিস্তানে বাঙালীরাই যে মেজরিটি হবে এ তো স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু তারা যদি বাঙালীত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে ইসলাম সম্বন্ধে সচেতন হয় তা হলে তো আর মেজরিটির অধিকার দাবী করবে না। দেখা গেল ভবী ভুলবে না। বাঙালী তার সংখ্যাগুরুত্ব সম্বন্ধে সজাগ। এই নিয়ে অনেক দর কষাকষি ও মন কষাকষির পর স্থির হয় যে, "আজি হতে হৈল, ভাই রে, সমানে সমান।" শতকরা পঞ্চান্নর সঙ্গে শতকরা পঁয়তাল্লিশের প্যারিটি। তবে বাঙালীরা এটা মেনে নেবার সময় এর বিনিময়ে আদায় করে নেয় যৌথ নির্বাচনের অধিকার। তাহলে হিন্দু মুসলমানে একসঙ্গে ভোট দিতে পারে, হিন্দুর ভোটে মুসলমান ও মুসলমানের ভোটে হিন্দু নির্বাচিত হতে পারে। এভাবে নির্বাচন হলে মুসলিম লীগ আর কোনোদিন মাথা তুলতে পারবে না। উঠবে অন্যান্য দল। পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারাই কেন্দ্রে সরকার গঠন করবে।

এই মর্মে যে সংবিধান রচনা করা হয় সেই অনুসারে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার আগেই পশ্চিমের মুসলিম লীগ সশস্ত্র বিদ্রোহের ভয় দেখায় ও সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে আয়ুব খান যে সংবিধান জারী করেন তাতে প্যারিটি বহাল থাকে, যৌথ নির্বাচনও বহাল থাকে, কিন্তু প্রত্যক্ষ নির্বাচনের পরিবর্তে পরোক্ষ নির্বাচন হয়। খিড়কির দরজা দিয়ে নয়া মুসলিম লীগ ঢোকে। এক হাতে শস্ত্র ও এক হাতে শাস্ত্র নিয়ে আয়ুব খান সর্বময় কর্তৃত্ব করেন। কোথায় থাকে প্যারিটি! এ রকম শাসন কায়েম করার অর্থ হলো মেজরিটিকে মাইনরিটিতে পরিণত করা। পূর্ববাংলার অধিবাসীদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া

আয়ুব খানের পতনের পর ইয়াহিয়া খান প্রত্যক্ষ নির্বাচন ফিরিয়ে দেন, যৌথ নির্বাচন বহাল রাখেন, প্যারিটি তুলে দিয়ে এক একজন মানুষের এক একটি ভোট প্রবর্তন করেন। কিন্তু সংবিধান রচনাকারীদের সম্মিলিত হতে না দিয়ে যে সংঘর্ষটি তিনি বাধালেন সেটির সম্ভবপর তাৎপর্য হলো বাঙালীকে মেরে কেটে তামাম পাকিস্তানে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা। তখন এক একজন মানুষ এক একটি ভোট প্রয়োগ করলেও বাঙালী আর মাথা তুলতে পারবে না।

পূর্ব বাংলার লোক পাকিস্তান ছেড়েছে। তা বলে ভারতের সঙ্গে পুনর্মিলনের কথা ওরা ভাবছে না। ভারতেও জনা কয়েক অবাস্তববাদী ছাড়া পুনর্মিলনের কথা আর কারো মুখে শোনা যায় না। পুনর্মিলন বলতে বোঝায়, হয় পশ্চিমবাংলা ভারতের আঁচল ছেড়ে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন সার্বভৌম একভাষী রাষ্ট্রের কোলে ঝাঁপ দেবে, আর নয়তো উক্ত রাষ্ট্রই তার রাষ্ট্রসত্তা ও স্বাধীনতা ও একভাষিতা বিসর্জন দিয়ে বহুভাষী ভারতীয় ইউনিয়নের সামিল হয়ে পশ্চিম বাংলার সঙ্গে জুড়ে যাবে বা তারই মতো আরেকটি অঙ্গরাজ্য হবে। দুটির কোনোটিই জনগণের ইচ্ছায় হবার নয়। হলে হবে অনিচ্ছায় ও গায়ের জোরে। তেমন পুনর্মিলন কে চায়? তার চেয়ে কমন মার্কেট, কমন ডিফেন্স প্রভৃতির স্বপ্ন দেখা শ্রেয়।

২

দেশভাগের পর দেখতে দেখতে লোক ভাগও ঘটে গেল ভারত ও পাকিস্তানের পশ্চিম প্রান্তে। পূর্ব প্রান্তেও কি তাই ঘটবে। ঘটতে পারত, যদি না মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় এসে সম্ভবপর দাঙ্গা রোধ করতেন। তারপর বহুবার দাঙ্গা বেধেছে, কখনো দুই পারে, কখনো একপারে। লোকজন পালিয়েছে, কখনো একমুখে, কখনো দুই মুখে। আমরা চেষ্টা করেছি যাতে টু-ওয়ে ট্র্যাফিক না হয়। কিন্তু সফল হইনি। এপারে শচীন্দ্রনাথ মিত্র, সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাণ দিয়ে প্রতিরোধ বা গতিরোধ করতে চেয়েছেন, ওপারে আমীর হোসেন চৌধুরী প্রমুখ উনিশ বিশ জন। অবশেষে বেশীর ভাগ হিন্দু মুসলমানের অন্তঃ-পরিবর্তন ঘটেছে। তারা মিলে মিশে বাস করতে রাজী। এপারে শুধুমাত্র হিন্দুই থাকবে, ওপারে শুধুমাত্র মুসলমান থাকবে, এটা একটা দুঃস্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেছে। কিন্তু বড়ো কম অনিষ্ট করে যায়নি।

স্বাধীনতার পূর্বে কেউ কখনো কল্পনাও করতে পারেনি যে দেশ ভাগ হয়ে যাবে, লোক ভাগও হতে পারে। তার ফলে স্বাধীনতার চেহারাও বদলে যাবে। স্বাধীনতার এই অসুন্দর রূপে মুগ্ধ হবে কে। অনেকেরই মোহভঙ্গ হয়। আরো একটা রূপও লোকের চোখে পড়ে।। সেটা আরো দৃষ্টিকটু। কারো সর্বনাশ কারো পৌষমাস। কত মাঝারি মানুষ রাতারাতি বড় মানুষ বনে যায়। অসৎ উপায়ে। অসাধুতার জয়জয়কার। মহাত্যাগী যাঁরা তাঁরাও হয়ে ওঠেন মহাভোগী। বোঝা গেল স্বরাজ হচ্ছে বড়লোকের ব্যাপার, তাতে গরিবের অংশ নেই। অন্য কথায় বুর্জোয়াদের ব্যাপার। তাতে প্রোলিটারিয়ানদের ভাগ নেই। এরা যদি সংগ্রাম না করে এদের বখরা থেকে এরা চিরদিন বঞ্চিত থাকবে। এদের স্বার্থে যেটার দরকার সেটার নাম বিপ্লব। পশ্চিমবাংলার গত পঁচিশ বছরের ইতিহাস হচ্ছে গণতন্ত্রের সঙ্গে বিপ্লবের টানাপোড়েনের ইতিহাস। দুই শিবি-রেরই বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত। চাষীর চেয়ে মজুরের চেয়ে ছাত্রই বেশী সকর্মক। অহিংসার চেয়ে হিংসাই বেশী সক্রিয়। শেষ

অধ্যায়টা তো হিংসা প্রতিহিংসার দৃষ্টবৃত্ত। এরই নাম নাকি শ্রেণীযুদ্ধ।

অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবাংলার বিপ্লবী ঐতিহ্যই সব চেয়ে পুরাতন ও সব চেয়ে গভীর। আবার অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যও তার চেয়ে বেশী পুরাতন ও তার চেয়ে আরো গভীর। ডিকটেটরশিপ বাঙালী বিনা বাক্যে মেনে নেবে না। পার্লামেনটারি ডেমোক্রাসীর নিন্দাবাদে যাঁরা মুখর তাঁরাও মুখ ফুটে উচ্চারণ করতে সাহস পান না যে ক্ষমতার আসনে এলে তাঁরা সার্বজনীন ভোটাধিকার, প্রত্যক্ষ নির্বাচন, নির্বাচিত মেজরিটির দ্বারা সরকার গঠন, আইনসভার কাছে সরকারের জবাবদিহির দায়, অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে পদত্যাগ ও সংবিধানসম্মতভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর, হাইকোর্টের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভাসমিতির বাকস্বাধীনতা, বিরোধীদল গঠনের স্বাধীনতা বন্দীদের হেবিয়াস কর্পাস দাবী করার অধিকার রহিত করবেন।

ব্রিটিশ শাসনকে যা দুই শতাব্দী কাল স্থায়ী করেছিল তা ওই গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য, যা ব্রিটেনে বিবর্তিত হয়ে ভারতে প্রবর্তিত হয়েছিল ধাপে ধাপে। ব্রিটেনের তুলনায় তা অল্পদিনের ও অগভীর, কিন্তু এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায়—এমন কি ইউরোপের বহু দেশের তুলনায়—অধিকদিনের ও সুগভীর। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পূর্বেও ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা। অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা বাঙালী। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতিও বাঙালী। কংগ্রেসের সভাপতি তালিকায় বাঙালীর নাম বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে সত্যাগ্রহ ও অসহযোগের পূর্বে।

অসহযোগের সময় থেকে আরো এক প্রকার ঐতিহ্যের সূত্রপাত হয় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে। সারা ভারতের সঙ্গে পা মিলিয়ে বাংলাদেশও অসহযোগী হয়, সত্যাগ্রহী হয়, কারাবরণ করে, খাজনা বন্ধ করে, লাঠির বাড়ি খায়, বন্দুকের গুলী খায়, গঠনমূলক কাজ করে, গ্রামের লোকের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে। কথায় কথায় আজ আমরা জনগণের দোহাই দিই। এটা গান্ধী ও তাঁর সহকর্মীর কাছ থেকে পাওয়া। জনজাগরণের একটা অপরিহার্য শর্ত ছিল জনগণ অহিংস থাকবে। সহিংস হলে যা হবে তা অরাজকতা। তা জনজাগরণকে বিপথগামী করে ব্যর্থ করবে। অরাজকতা কেউ সহ্য করবে না। ইংরেজও না, তার উত্তরাধিকারীও না। দেশে যদি অরাজকাদেরই প্রাধান্য হয় তবে স্বরাজ কথাটারও কোনো মানে হয় না।

পশ্চিমবাংলার মাটিতে গত কয়েক বছরে এর একটা পরীক্ষা হয়ে গেল। সহিংস অরাজকতা যে কতদূর যেতে পারে তা প্রত্যক্ষ করা গেল। উদ্দেশ্য যদি সফল হতো তা হলে না হয় বলা যেত যে যত্র তত্র যাকে তাকে খুন করাও সার্থক। কিন্তু বিভীষিকার রাজত্ব কাউকেই কোনো সুফল এনে দেয়নি। বিপ্লব হলে রক্তপাতও হয়, কিন্তু রক্তপাত হলেই যে বিপ্লব হয় তা নয়। তরুণদের মনে হতাশার হেতু যথেষ্ট আছে, সহজেই তাদের বিভ্রান্ত করা যায়। কিন্তু কোথাও কি দেখা গেছে যে তরুণরা একাই একটা বিপ্লব ঘটিয়েছে? তরুণরা শ্রমিক বা কৃষকদের মতো একটা শ্রেণী নয়। বিপ্লব বলতে যদি আজকের দিনে শ্রেণীসংঘর্ষ বোঝায় তো কৃষক ও শ্রমিকদের এগিয়ে আসা দরকার। তাদের জীবনেও অসন্তোষের কারণ যথেষ্ট, তবু একথা কি বলতে পারা যায় যে বিপ্লবের জন্যে, শ্রেণীযুদ্ধের জন্যে তারা পা বাড়িয়ে রয়েছে? না, ভদ্রলোকরা নাচালেই তারা নাচবে না। নাচবে যখন দেশ যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়বে, জীবনযাত্রা দুর্বহ হবে, সৈন্যরাও তাদের দিকে ঝুঁকবে, উপরের দিকে যাঁরা থাকবেন তাঁরা হবেন জনগণের আস্থা থেকে বঞ্চিত দুর্বল মুষ্টিমেয় লোক। সে রকম একটা পরিস্থিতিতে ইংরেজরা মানে মানে ক্ষমতা হস্তান্তর করে চলে যায়।

সেই সন্ধিক্ষণে আমাদের সৌভাগ্যক্রমে গণতন্ত্রীরা সর্বসাধারণের আস্থাভাজন ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে ছিলেন সত্যাগ্রহীরাও। বিপ্লবী ঐতিহ্যের চেয়ে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের উপর

আস্থা ব্যাপকতর ছিল। নয়তো সেই সন্ধিক্ষণেই বিপ্লব ঘটতে পারত। তখন হয়তো দেশ ভাগাভাগির, প্রদেশ ভাগাভাগিরও দরকার হতো না। তেমন একটি ঐতিহাসিক লগ্ন ইচ্ছামাত্র উপস্থিত হয় না। ভদ্রলোকের ছেলেরা ভদ্রলোকদের মেরে খতম করলেও হয় না। বিপ্লবের নামে যেটা চলে সেটা অরাজকতা। পশ্চিমবাংলা অরাজকতার ভিতর দিয়ে গেছে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে যায়নি। তার জন্যেও অত্যধিক মূল্য দিতে হয়েছে। মানুষ আর দিতে চায় না।

পশ্চিমবাংলা ভারতের বাইরে নয়। ভারতও রাশিয়া বা চীন নয়। এখানে একটা গণতান্ত্রিক সংবিধান রয়েছে। সেটা নিষ্ক্রিয় নয়। সংবিধানের সাহায্যে বহুবিধ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। শ্রেণীসংঘাত এড়িয়ে এতরকম গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন চীনেও হয়নি, রাশিয়াতেও না। গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে হয়তো হয়েছে, কিন্তু সেসব দেশ আগে থেকেই এগিয়ে রয়েছিল। যেমন ইংলণ্ড বা ফ্রান্স বা সুইডেন বা জাপান। পরাধীনতা থেকে সদ্যমুক্ত গণতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে তুলনা করলে ভারতের অগ্রগতির প্রশংসা করতে হয়। পশ্চিমবাংলাও আর কোনো রাজ্যের তুলনায় অনগ্রসর নয়। বিপ্লবের পথ না ধরে বিবর্তনের পথ ধরে চললে প্রগতি বিলম্বিত হয়ে থাকেই। বিলম্বিত যেমন হয় তেমনি শ্রেণীসংঘাতশূন্যও হয়। রক্তপাতও পরিহার করা যায়।

তাছাড়া এদেশে রয়েছে বিপ্লবের বা বিদ্রোহের একটা অহিংস বিকল্প। কতক কর্মী এই নিয়েই আছেন। তাঁরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুফলও দেখাচ্ছেন। যেমন ভূমি বণ্টনে, চম্বলের ডাকাতদের অন্তঃপরিবর্তনে। পশ্চিমবাংলাতেও এঁদের অস্তিত্ব আছে। আর কিছু না হোক খাদি ও গ্রামোদ্যোগের কাজ এঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন। লোকে বেশী দাম দিয়েও খাদি কিনছে কেন? কোটি কোটি টাকার খাদি বিক্রী হচ্ছে কেমন করে? এসব প্রশ্নের উত্তর, ভারতের লোক এখনো গান্ধীপন্থায় বিশ্বাস হারায়নি। যদিও সে বিশ্বাস পূর্বের মতো প্রবল নয়। পশ্চিমবাংলার লোকের অন্তরেও সে বিশ্বাস বিদ্যমান।

এই তো সেদিন পূর্ববাংলাতেও শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব অসহযোগের আহ্বান জানালেন। আর দেশশুদ্ধ লোক একযোগে সাড়া দিল। অবশ্য বেশীদিন চালানো গেল না, ভয়ঙ্করভাবে প্রস্তুত হিংসার সামনে প্রস্তুতিশূন্য অহিংসা দাঁড়াতে পারল না। তাতে কিন্তু অহিংসার গৌরব ম্লান হলো না। দীর্ঘদিন ধরে তিলে তিলে প্রস্তুত হলে ইতিহাস অন্যরূপ হতো। গান্ধীজীর শিক্ষাকে সদলবলে অস্বীকার করার বহুকাল পরে হঠাৎ তা দিয়ে কার্যোদ্ধার সহজ নয়।

ভারতের মাটিতে গণতন্ত্রের ঐতিহ্য শতখানেক বছরের পুরনো। অসহযোগ তথা সত্যাগ্রহের ঐতিহ্য অর্ধ শতকের পুরোনো। বিপ্লব বলতে যদি রাষ্ট্রবিপ্লব বোঝায় তবে বিপ্লবের ঐতিহ্য সত্তর বছরের পুরোনো। আর যদি সমাজবিপ্লব বা শ্রেণীযুদ্ধ বোঝায় তবে তেলেঙ্গানায় তার সূচনা। বছর পঁচিশেকের পুরোনো তার ঐতিহ্য। সোসিয়ালিজমের নতুন মদ কোন্ পুরোনো বোতলটিতে ঢালা হবে? যদি গণতন্ত্রের বোতলে হয় তবে গণতন্ত্রকেই প্রথম সুযোগ দিতে হবে। যেমন পশ্চিবাংলায় তেমনি পূর্ববাংলায়। নতুন মদের ঝাঁজে পুরোনো বোতল ফেটে যাওয়া বিচিত্র নয়। তেমন সম্ভাবনা দেখলে কোথাও ঘটে রক্ষণশীলদের প্রভাববৃদ্ধি, কোথাও ফাসিস্টদের প্রতাপবৃদ্ধি।

নতুন সামাজিক শৃঙ্খলা মুখের কথা নয়। প্রাইভেট প্রপার্টির উপর হস্তক্ষেপ না করে ও জিনিস সম্ভব নয়। শ্রমিক কৃষকরাও প্রাইভেট প্রপার্টিতে বিশ্বাস করে। তারা যাতে তাদের সম্পত্তির উপর মালিকানা স্বেচ্ছায় গ্রামসভার অনুকূলে হস্তান্তর করতে রাজী হয় এই লক্ষ্য সম্মুখে রেখে কাজ করে যাচ্ছেন বিনোবাজী ও তাঁর সর্বোদয় কর্মীগণ। লোকের মন কতটুকু গলাতে পেরেছেন জানিনে, তবু লক্ষ্যটা যে স্থির হয়েছে এই অনেক। পশ্চিমবাংলায় এঁদের উদ্যম ক্ষীণ।

৩

এখন সংস্কৃতির কথায় আসা যাক। সব দেশের জীবনেই

এটা পুরাতন ও নূতনের মাঝখানে গোধূলি। সর্বত্র অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ, নীতিসংকট, ধর্মসঙ্কট। সাহিত্যে ও শিল্পে এর ছাপ পড়বেই। বাংলা সাহিত্য ও বাংলার শিল্প তো যুগের বাইরে বা উর্ধ্বে নয়। বাংলার এপার ওপার দুই পারেই যুগের হাওয়া, যুগের আলো। অন্যান্য দেশের মতো দুই বাংলাতেই কত রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। সাধারণত শহর অঞ্চলে। কলকাতায় ঢাকায় চট্টগ্রামে। এতগুলি নাট্য সম্প্রদায়ও কখনো দেখিনি, এতগুলি শিল্পীসম্প্রদায়ও কখনো দেখিনি।

পূর্ববাংলাকে যাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন তাঁরা সেখানকার মানুষকে বুঝিয়েছিলেন যে তারা মুসলিম নামক স্বতন্ত্র এক নেশনের অঙ্গ। তাদের সংস্কৃতি আরব পারসিক সংস্কৃতির অংশ। তাই তাদের রাতের পর রাত উর্দু সিনেমা দেখানো হয়েছে। বাংলা সিনেমা দেখতে দেওয়া হয়নি। সাহিত্যেও একদল ফতোয়া দিলেন যে বাংলা সংস্কৃতি হচ্ছে বিধর্মী, সুতরাং বিজাতীয়। পড়ো উর্দু বা উর্দুতর বাংলা। পাকিস্তানে পূর্ববাংলা সাহিত্যে কেবল সেইটুকু তোমার পাঠ্য যেটুকু মুসলমানের হাত দিয়ে হয়েছে। আর সব হারাম।

এর একটা সুফল হলো এই যে বহু বিস্মৃত বাঙালী কবিকে নতুন করে আবিষ্কার করা গেল। কেই বা এঁদের নাম জানত? কেই বা প্রকাশ করত এঁদের রচনা? ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় ও বাংলা একাডেমি পঁচিশ বছর ধরে গবেষণা চালিয়ে বাংলা সাহিত্যের একটা রত্নভাণ্ডার আমাদের সকলের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। মধ্যযুগের বা উনবিংশ শতাব্দীর এইসব কবিদের সঙ্গে এই প্রথম আমাদের পরিচয় হলো। এঁদের অনেকেই আবার লোককবি। অরণ্যের কুসুম অরণ্যেই সৌরভ বিতরণ করে গেছেন।

এঁদের কারো কারো নাম থেকে মালুম হয় না যে এঁরা মুসলমান। মাগন ঠাকুর বিদ্যাপতি ঠাকুরের জ্ঞাতি নন। আর পাগলা কানাই নন বলরাম দাসের ভাই। এঁদের রচনা হিন্দু ভাবে ভরপুর। বেশীর ভাগই হিন্দু বিষয়ে লিখেছেন। যেখানে ইসলাম প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে সেখানেও অতি মার্জিত সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলা। আরবী ফারসীর পারিভাষিক শব্দও সংস্কৃত থেকে সংগৃহীত। যেসব কাহিনী আরবী ফারসী সাহিত্য থেকে নেওয়া হয়েছে সেগুলিকেও রূপান্তরিত করা হয়েছে। মধ্যযুগের মুসলমান প্রাণপণে চেষ্টা করেছে এই দেশকে তার আপনার দেশ করতে, এই ভাষাকে তার আপনার ভাষা করতে। আরব পারস্যকে ভুলে যায়নি তা ঠিক, কিন্তু প্রতিবেশীর সঙ্গে আত্মীয় সম্পর্ক পাতাতে চেয়েছে। আলাওল, মাগন ঠাকুর ও দৌলত কাজীর ধর্ম ছিল ইসলাম, ভাষা ছিল বাংলা, বিষয় ছিল হিন্দু কিংবা রূপান্তরিত মুসলিম। আর তাঁদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আরাকানের মগ রাজা। সম্ভবত বৌদ্ধ। সবচেয়ে কৌতুকের কথা তাঁদের লেখার হরফ ছিল আরবী। ত্রিশের দশকে সাহিত্য বিশারদ আবদুল করিম সাহেব ও অধ্যাপক এনামুল হক সাহেব তাঁদের সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। তারপর থেকে গবেষণা কার্য আরো অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের মুসলিম ধারাটি এখন আর অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত নয়। কিন্তু তারও তো একটা সীমা আছে। সেও তো পূর্ণাঙ্গ বাংলা সাহিত্য নয়। কেবলমাত্র সেই অংশটুকু পাঠ করেই তো কেউ শিক্ষিত বলে পরিচয় দিতে পারে না। তারই অনুসরণে তো কেউ সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে না। পূর্ববাংলার বাংলা সাহিত্যর ভবিষ্যৎ চিন্তা করলে পশ্চিমবাংলার বাংলা সাহিত্যের বর্তমানের খবর নিতে হয়। তার সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে হয়, তাল রাখতে হয়। রামমোহন বিদ্যাসাগর মাইকেল বঙ্কিমকে অগ্রাহ্য করা চলে না। রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করা তো সূর্যের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। কেবল চাঁদ তারা মার্কা সাহিত্য নিয়েই পূর্ববাংলার মানুষ সন্তুষ্ট থাকবে?

দেশভাগের পর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসও দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে, দুই খাতে প্রবাহিত হচ্ছে দেখে আমাদের মনে কত না উদ্বেগ ছিল। উদ্বেগ বৃথা। প্রাচীনপন্থীরা বছর কয়েকের মধ্যেই প্রভাবভ্রষ্ট হন। স্বভাবভ্রষ্ট হলে প্রভাবভ্রষ্ট হতে হয়।

আধুনিকপন্থীরা স্বভাবের অনুশীলন করে প্রভাবের আসনে অধিষ্ঠিত হন। ইসলামী সংস্কৃতি কোণঠাসা হয়ে মক্তবে মাদ্রাসমায় আশ্রয় নেয়। স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালী সংস্কৃতির জয়জয়কার। বলা বাহুল্য সে সংস্কৃতি হিন্দু মুসলমানের মিলিত সংস্কৃতি। তাতে হিন্দুর দানই বেশী, একথা মেনে নিতেও বাধা থাকে না। আশ্চর্য হয়ে দেখা গেল শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ ঢাকায় ও ঢাকার বাইরে অভিনীত হচ্ছে। অভিনয় করছেন মুসলমান সমাজের তরুণ-তরুণী। রমা ও রমেশের ভূমিকায় মুসলমান। নরেন সেজেছে একটি মুসলিম কন্যা।

এপারের বই ওপারেও পাচার হয়। তার চোরা সংস্করণ বেরোয়। কোনো কোনোটা নাকি লাহোরে ছাপা। একটা বিশেষ তারিখের পর ছাপতে দেওয়া হবে না বলে হুকুম জারী করার পর লক্ষ্য করা গেল পুরোনো তারিখ দিয়ে ছাপা হয়েছে। চাহিদা থাকলে জোগান থাকে। লোকে যদি পড়তে চায় ধার করে ভিক্ষা করে চুরি করে পড়বেই। রাশিয়াতেও পড়ছে, চীনদেশেও পড়ছে।

ইটালীর রেনেসাঁস এসেছিল গ্রীস থেকে। ভারতের রেনেসাঁস ইউরোপ থেকে। পূর্ববাংলার রেনেসাঁস এসেছে অবিভক্ত বাংলা থেকে। কথা ছিল আসবে আরব পারস্য থেকে। উর্দু সাহিত্য থেকে। তা নয়, বাংলা সাহিত্য থেকে। রবীন্দ্র নজরুল জীবনানন্দ থেকে। সেইসঙ্গে বিশ্বসাহিত্য থেকে। ঢাকার ছেলেরা কলকাতার ছেলেদের মতোই সর্বভুক। সেদিন একটি তরুণ লেখক কলকাতায় শরণ নিতে এসেছিলেন। মুসলমান। সামান্য সম্বল, তা দিয়ে খাবার কিনবেন না, কিনবেন কাফকার ছোটগল্প, টলস্টয়ের আনা কারেনিনা। চোখে বিশ্ব আবিষ্কারের নেশা। ডিরোজিওর ইয়ং বেঙ্গলের মতো।

পূর্ববাংলা পাকিস্তানের তাঁবেদারি থেকে মুক্ত হয়ে এখন এক নতুন মোড় নিয়েছে। পশ্চিমবাংলা তেমন কোনো নয়া মোড় নেয়নি। পাকিস্তানের মতো ভারত একটা প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র নয়। ভারত ত্যাগ করলে যেটা হবে সেটা প্রতিক্রিয়ার থেকে মুক্তি নয়। পূর্ববাংলার বিবর্তন আর পশ্চিমবাংলার বিবর্তন সমান্তরাল হয়নি ও হতে পারে না। পশ্চিমবাংলার নেতৃত্ব হয়তো ভারতের অন্যান্য রাজ্য মানবে না, তাই বলে সে ভারতের প্রতি বিমুখ হবে না। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলাই তার কর্তব্য। পূর্ববাংলার বেলা যেটা স্বাদেশিকতা পশ্চিম বাংলার বেলা সেটা প্রাদেশিকতা। প্রাদেশিকতার পথে নয়া মোড় আসবে না। ওটা একটা চোরাগলি।

অবিভক্ত বাংলাদেশের রেনেসাঁস প্রায় দেড়শো বছরের পুরোনো। তার অঙ্গে এখন অবসাদ। কেউ কেউ তো এই বলে তাকে উড়িয়ে দিতে চান যে, পরাধীন দেশের আবার রেনেসাঁস! অথচ স্বাধীন দেশের রেনেসাঁসই বা কোথায়! এই পঁচিশ বছরে পশ্চিমবাংলায় যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা কি নতুন একটা রেনেসাঁস! অপর পক্ষে পূর্ববাংলার জীবনে অবসাদের লক্ষণ নেই। চাষীর ঘর থেকে যে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মণ্ডলীর উদ্ভব হয়েছে তার মধ্যে রেনেসাঁসের সর্বতোমুখ ঔৎসুক্য। বিচার বিশ্লেষণের যুগ এসেছে। গদ্য রচনা জোর কদমে এগিয়ে যাবে। পশ্চিমবাংলার চলতি ভাষাকেই ওঁরা স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছেন। পশ্চিমবাংলার সংবাদপত্রে এখনো এ বিষয়ে দ্বিধা দেখতে পাই। পূর্ববাংলা বহুদিন থেকে দ্বিধাহীন। ঢাকার কাগজেই আমি চলতি ভাষার ব্যবহার সব আগে লক্ষ্য করি। কলকাতার কাগজ তার অনুসরণ করে। ঢাকায় নাকি এখন আঠারোখানা দৈনিক, চট্টগ্রামে চোদ্দ। পঁচিশ বছর আগে তো একখানাও ছিল না।

রেনেসাঁসের সঙ্গে সঙ্গে রেফরমেশনও শুরু হয়ে গেছে। যেমন হয়েছিল অবিভক্ত বাংলায় গত শতাব্দীতে। মুসলিম মহিলারা এখন হিন্দু মহিলাদের মতোই অনবগুণ্ঠিতা। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁদের প্রকাশ। বহুবিবাহ উঠে যাচ্ছে। বাল্যবিবাহও কমে আসছে। শরিয়তী শাসন এখন মনুর শাসনের মতো

সমালোচিত। ধর্মশাস্ত্রের তরফ থেকে এই দাবী করা হয়ে থাকে যে বেদের বা বাইবেলের বা কোরানের প্রত্যেকটি বাক্যই অভ্রান্ত। বেদ ও বাইবেলের পুনর্বিচার করতে হিন্দু ও খ্রীস্টানরা রাজী হয়েছে, কিন্তু কোরানের পুনর্বিচার করতে ইসলামী দুনিয়া রাজী নয়। তাই ইসলামের রেফরমেশন চার শতাব্দীকাল বিলম্বিত। লিবিয়া থেকে এক বাঙালী ভদ্রলোক এসেছিলেন। তাঁর মুখে শোনা গেল বায়োলজির ছাত্ররা ডারউইনের বিবর্তন-তত্ত্ব পড়তে অনিচ্ছুক। কারণ বিবর্তনতত্ত্ব সত্য হলে কোরান মিথ্যা। আর কোরান সত্য হলে বিবর্তনতত্ত্ব মিথ্যা। পূর্ববাংলার মাদ্রাসা ও মক্তবগুলির সংস্কার দরকার। নয়তো সেখানেও লিবিয়ার মনোভাব থেকে যাবে। রেফরমেশন বিলম্বিত হবে। রেফরমেশন বিলম্বিত হলে রেনেসাঁসও এক পায়ে এগোতে পারবে না।

পঁচিশ বছর আগে আমরা বাংলাদেশকে এক ও অবিভাজ্য বলে ভাবতে অভ্যস্ত ছিলুম। এখন আর সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু বাংলাভাষাকে এক ও অবিভাজ্য ভাবা সম্ভব। মাঝখানে মুসলিম লীগপন্থীরা তাতেও বাধা দিয়েছে, কিন্তু এখন আর সে বাধা নেই। কলকাতার শিক্ষিত মহলের ভাষা ও ঢাকার শিক্ষিত মহলের ভাষা এখন এক হয়ে গেছে ও সেইটেই হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড। দেশ ভিন্ন, ভাষা অভিন্ন এই নিয়ে আমাদের বাঁচতে হবে। পূর্ববাংলার ভাষাপ্রেম কেমন অকৃত্রিম তা আজ সকলেই জানে। ভাষার জন্যেই পূর্ববাংলা স্বাধীন হয়ে গেল। শিক্ষাদীক্ষা এখন থেকে কেবলমাত্র বাংলাভাষার মাধ্যমেই চলবে। উচ্চতম শিক্ষার বেলাও তার ব্যতিক্রম হবে না। উর্দুর মতো ইংরেজীও বর্জনীয়।

পশ্চিমবাংলা কিন্তু এ বিষয়ে একমত নয়। ইংরেজী মাধ্যমের পক্ষেও বহু শিক্ষাবিদ রয়েছেন, তাঁদের মতে উচ্চতম শিক্ষার বাহন যদি ইংরেজী না হয় তবে শিক্ষার মান নেমে যাবে। বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞান এখন যে হারে অগ্রসর হচ্ছে তার সঙ্গে বাংলা মাধ্যম পাল্লা দিতে পারবে না। বাংলা পাঠ্যপুস্তক দুদিন বাদে বাসি হয়ে যাবে। আবার নতুন করে লিখতে হবে। এত বইই বা লিখবে কে? তর্জমা করবে কে? প্রকাশ করবে কারা? পোষাবে কেন? ইংরেজী বইয়ের খরিদদার দুনিয়া জুড়ে। বাংলা বইয়ের খরিদদার তো দুই বাংলা জুড়েও নয়। এর সমাধান হতে পারে যদি দুই বাংলার কর্তৃপক্ষ একসঙ্গে কাজ করেন। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে যেমন যৌথ ব্যবস্থা চাই শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্যেও তেমনি যৌথ ব্যবস্থা চাই। যে বই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হবে সেই বই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়ানো হবে। যে বই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হবে সেই বই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়ানো হবে। নয়তো পশ্চিমবাংলার উচ্চশিক্ষা উভয় মাধ্যম স্বীকার করবে।
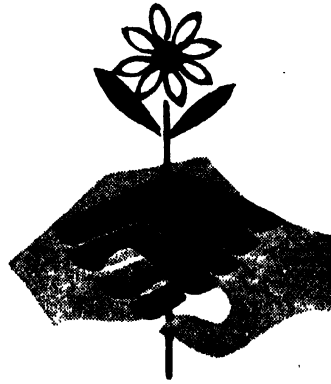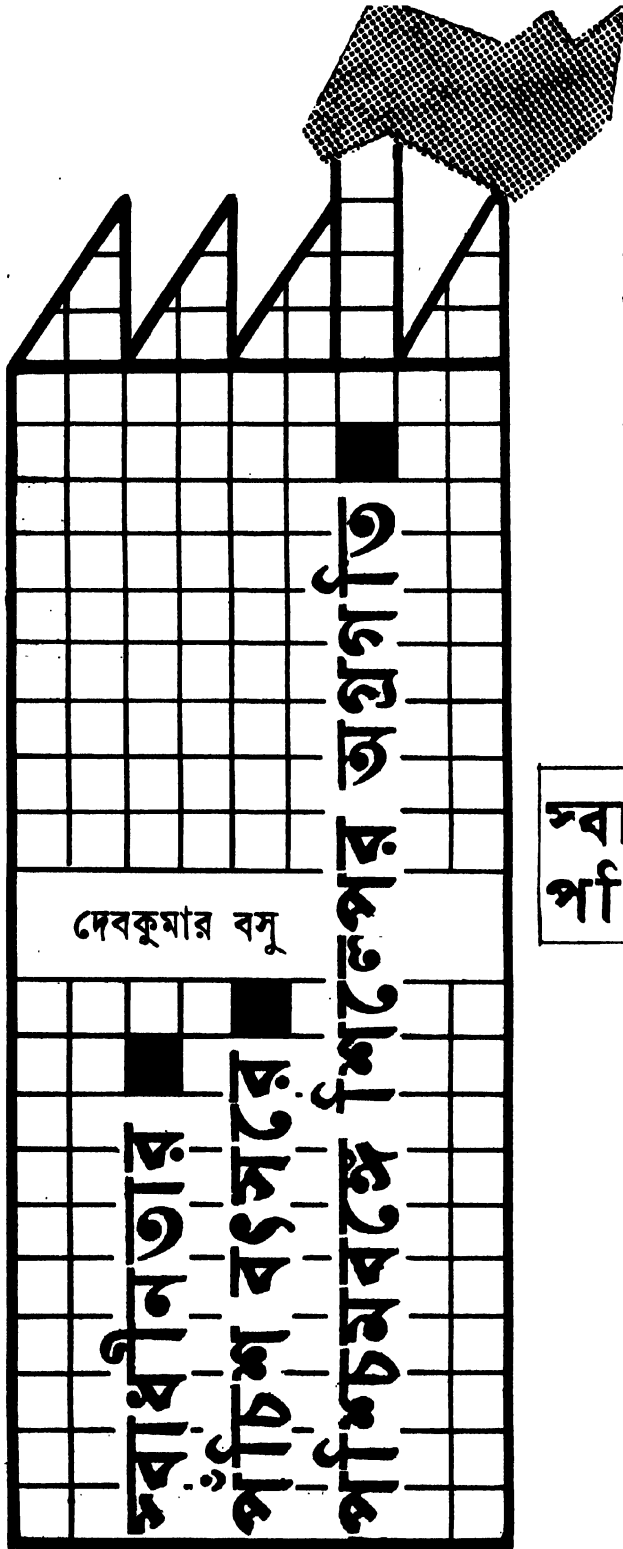
১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষের শিল্প-প্রধান রাজ্যগুলির মধ্যে অগ্রণী স্থান হলো পশ্চিম বাংলার। ভারতবর্ষের শিল্পে নিযুক্ত সমস্ত শ্রমিকের এক তৃতীয়াংশের কিছু কম ও কারখানাগুলির এক-পঞ্চমাংশ ছিলো পশ্চিম বাংলাতেই। পশ্চিম বাংলার এই সময়কার শিল্প, যা ইংরাজ আমল থেকে চলে এসেছিলো, তার ভিত্তি ছিলো চট, সুতিবস্ত্র, চা, ইস্পাত, কয়লা ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প। উন্নত দেশগুলিতে, বিশেষ করে ব্রিটেনের বাণিজ্যের অংশীদার দেশগুলিতে, কাঁচামাল সরবরাহের দায়িত্ব ছিলো এই সমস্ত শিল্পের।

স্বাধীনতা লাভের পর স্বভাবতঃই রাষ্ট্রের লক্ষ্য হলো দেশের সম্পদ দেশের মধ্যে ব্যবহার করে নতুন শিল্প গড়ে তোলা এবং ক্রমশঃ বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানী কমিয়ে ফেলা। এই

স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের অগ্রগতি

সময় দ্রুত উন্নতি হতে থাকে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের আর ইংরাজ আমলের প্রধান শিল্প চট শিল্পের গুরুত্ব কমতে থাকে। ১৯৪৮ সালে পশ্চিম বাংলার রেজিস্ট্রিকৃত কারখানাগুলিতে নিযুক্ত ছিলো ৬ লক্ষের কিছু শ্রমিক। চট শিল্পের প্রায় ৩ লক্ষ শ্রমিক সহজেই এই শিল্পকে রাজ্যের প্রধান শিল্প হিসাবে দাবী করতে পারতো। ১ লক্ষ ৭ হাজার শ্রমিক নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের স্থান ছিলো তারই পরে। এছাড়া সুতি বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্পে সবশুদ্ধ নিযুক্ত ছিলো আরো ২ লক্ষ শ্রমিক।

১৯৫১-র পর থেকে চটকলগুলি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অসুবিধা অনুভব করতে থাকে। যন্ত্রপাতির আধুনিকী করণের সাহায্যে উৎপাদনের খরচ কমানোর যে প্রচেষ্টা চটকলগুলিতে চলতে থাকে তার ফলে এই শিল্পে শ্রমিক নিয়োগ

যায় কমে। অন্যদিকে ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য শিল্পের উন্নতি ঘটতে থাকে। ১৯৬১ সালের মধ্যে সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন তৈরীর কারখানা। বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় মোটরগাড়ী তৈরীর কারখানা। ১০ বৎসরের মধ্যে চটশিল্প ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের কাছে প্রথম স্থান হারায়। নীচের ছকে বিভিন্ন সময়ে রাজ্যে শ্রমবিন্যাসের তথ্য দেওয়া হলো।

ছক নং ১। পশ্চিম বাংলায় রেজিস্ট্রিকৃত কারখানায় শ্রম বিন্যাস

সাল	শ্রমিক সংখ্যা (শত)			
	চট	ইঞ্জিনিয়ারিং	অন্যান্য	মোট
১৯৫১	২,৭৭৫	১,৫৮৪	২,১৬০	৬,৫১৯
১৯৬১	২,১০৫	২,৫০৫	২,৬৬৪	৭,২৭৪
১৯৬৫	২,৫৮৯	৩,২৩৯	২,৯৭৫	৮,৮০৩

১৯৫১র পরবর্তী দশকে রাজ্যের শিল্পের অগ্রগতি ছিলো মন্থর যদিও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে কর্মসংস্থান বাড়ে দেড় গুণেরও বেশী। সমগ্র শিল্পে কর্মসংস্থান বাড়ে বৎসরে শতকরা ৩৬ হারে। কেবলমাত্র ছোট ছোট কারখানা, যেগুলি কারখানা রেজিস্ট্রি আইনের আওতায় পড়ে না, তাদের সংখ্যা যথেষ্ট বেড়ে যায়। নীচের ছকে রাজ্যের সমস্ত কারখানার শ্রমিকদের হিসাব থেকে এটা বোঝা যাবে।

ছক নং ২। পশ্চিম বাংলায় সমস্ত কারখানায় শ্রমবিন্যাস
১৯৫১ ৬১

কারখানার ধরন	শ্রমিক সংখ্যা (শত)		শতকরা বৃদ্ধি
	১৯৫১	১৯৬১	
রেজিস্ট্রিকৃত কারখানা	৬,৫১৯	৭,২৭৪	১১·৫৮
অন্য ধরনের কারখানা	৬,৬২০	১০,৮৮১	৬৪·৩৭
মোট	১৩,১৩৯	১৮,১৫৫	৩৮·১৮
রেজিস্ট্রিকৃত কারখানা শতকরা হিসাবে	৪৯·৬২	৪০·০৭	

ছোট কারখানাগুলির হিসাব এখন পর্যন্ত আদমসুমারির সময় ছাড়া পাবার অন্য উপায় নেই। উপরের হিসাব থেকে দেখা যায় রেজিস্ট্রিকৃত কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা যখন ১০ বৎসরে বেড়েছে শতকরা ১১·৬ হারে, ছোট কারখানাগুলিতে তখন শ্রমিক সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৬৪·৪ হারে। বাস্তবতঃ বড় কারখানাগুলি শ্রমিক নিয়োগ করে অল্প কিন্তু যন্ত্রপাতি নিয়োগ করে বেশী। পক্ষান্তরে ছোট কারখানা অল্প যন্ত্রপাতি দিয়ে চলে এবং শ্রমিক নিয়োগ করে বেশী। ছোট কারখানাগুলি অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ শহরাঞ্চলে, বড় কারখানার পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলি সরাসরি বড় কারখানাগুলির সঙ্গে যুক্ত থাকে। সাধারণভাবে বলা যায় ছোট ও বড় কারখানার উভয়েরই প্রসারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে যদিও এদের গতিবেগ স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। রেজিস্ট্রিকৃত কারখানাগুলির মধ্যেও ছোট কারখানার অগ্রগতির হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। উদাহরণ স্বরূপে বলা যায়, ১৯৫১ থেকে ১৯৬৫-র মধ্যে ৫০০-র বেশী শ্রমিক কাজ করে এমন কারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছিলো ১৫·১ শতাংশ আর ছোট কারখানার ক্ষেত্রে, যেখানে ৫০জনের কম শ্রমিক কাজ করে, সেখানে শ্রমিক সংখ্যা বেড়েছিলো ১২৮·৮ শতাংশ। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত পশ্চিম বাংলার শিল্পের অগ্রগতি যখন শ্লথ, তখন অন্যান্য রাজ্যে শিল্পোদ্যম নতুন করে সুরু হয়েছে। নীচের ছকে ভারতবর্ষের মধ্যে এই রাজ্যের তুলনামূলক অবস্থা দেখানো হয়েছে।

ছক নং ৩। ভারতবর্ষের শিল্পে নিযুক্ত পুঁজি, শ্রমিক ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলার শতকরা অংশ

সাল	কারখানা	উৎপাদক পুঁজি	শ্রমিক	উৎপাদন
১৯৪৬	২৯·০	২৮·৩	৩৩·৬	২৭·৫
১৯৫১	২০·৫	২২·৯	২৮·২	২৭·২
১৯৫৬	১৭·৩	২১·৭	২৬·২	২৩·১
১৯৬১	১৬·১	২১·৪	২২·৩	২০·০

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যে যে হারে শিল্পোন্নতি হয়েছে পশ্চিম বাংলা তার থেকে ক্রমশঃই পিছিয়ে পড়ছে। যদিও পরবর্তী কালে কিছু সময় রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পায় তবুও পশ্চিম বাংলার এই আপেক্ষিক অবস্থানের বিশেষ উন্নতি ঘটেনি।

১৯৬১ সালের পরবর্তী বৎসরগুলিতে পশ্চিম বাংলার শিল্প বিকাশের গতি উৎসাহজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। এর মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের উন্নতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৫-র মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ে শতকরা ২৯। সমস্ত শিল্প মিলিয়ে শ্রমিক সংখ্যা বাড়ে শতকরা ২২·৫। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৫, তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম ৪ বৎসর, পশ্চিম বাংলা তথা ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতির পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিলো। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারী ও মাঝারি শিল্প সম্পর্কে যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয়েছিলো তার ফল এই সময়ে পাওয়া যাচ্ছিলো। পশ্চিমবাংলার চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হলো দুর্গাপুরের নতুন শিল্পাঞ্চল। কলকাতার আশেপাশে গড়ে উঠলো নতুন নতুন কারখানা। এই সবেরই প্রধান ভিত্তি ছিলো পরিকল্পনানুযায়ী সরকারী ব্যয় বরাদ্দ। পরিকল্পনার নীতি গ্রহণ করার পর থেকে ভারতবর্ষে জাতীয় আয়ের মধ্যে সরকারের ভূমিকা বেড়েই চলেছে। ভারতীয় অর্থনীতির বর্তমান পর্যায়ে শিল্প ও বাণিজ্যের অগ্রগতি অনেক পরিমাণে সরকারী ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল। দেশে ব্যক্তিগত মালিকানার শিল্প সংস্থাগুলি পর্যন্ত অনেকাংশে সরকারী অর্ডারের অপেক্ষায় থাকে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় থেকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে যে সব কারখানা গড়ে উঠলো তার জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহের অন্যতম দায়িত্ব পেয়েছিলো পশ্চিমবাংলার ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প। তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যে পশ্চিমবাংলার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি নতুন পুঁজি বিনিয়োগ করে যে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়েছিলো তার হিসাব দেখা যেতে পারে। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৫-র মধ্যে শিল্পের যে প্রসার লক্ষ্য করা যায় তার তথ্য পরিবেশনা করেছেন পশ্চিমবাংলা সরকারের দ্বারা গঠিত ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের পর্যালোচনা কমিটি। নীচের ছকে তার থেকে কিছু তথ্য দেওয়া হলো।

ছক নং ৪। পশ্চিমবাংলার শিল্পে ১৯৫৯-৬৫ সালে উন্নতির হার

উন্নতির হার (বার্ষিক শতকরা)

বিষয়	ইঞ্জিনিয়ারিং	অন্যান্য	মোট
উৎপাদক পুঁজি	২৫·০	১৮·৭	২১·১
মূল্য সংযোজন (value added)	১৬·৮	৭·৯	১১·৭
শ্রমিক সংখ্যা	৮·৩	২·৬	৫·৬

দেখা যাচ্ছে এই সময়ে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের উন্নতির হার অন্যান্য শিল্পের থেকে অনেক বেশী ছিলো। অন্যান্য শিল্পের তুলনায় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে পুঁজির ব্যবহারে উন্নতির হার বেড়েছে দেড়গুণ বেশী, মূল্য সংযোজনের হিসাবে দ্বিগুণ ও কর্মসংস্থানে তিনগুণেরও বেশী।

১৯৬৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকার গুরুতর অর্থসংকটের সম্মুখীন হন। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার জন্য ব্যয়ের একটি অংশ বিদেশী ঋণ ও সাহায্যের দ্বারা পুষ্ট হতো। ভারত-চীন ও ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের সময়ে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার উপর চাপ যখন ক্রমাগত বেড়ে চলেছিলো সেই সময় থেকেই বিদেশী রাষ্ট্রগুলি ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাদের মনোভাবের পরিবর্তন করে এবং বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য দানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। দেশরক্ষা বাবদ ব্যয়ের চাপে দেশের মধ্যে সম্পদ সংগ্রহের পরিমাণ বাড়ানো এক সমস্যা হয়। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পনা খাতে ব্যয় কমাতে বাধ্য হন। ১৯৬৫-৬৬ সালে এই খাতে ব্যয়ের অঙ্ক ছিলো ২০২৩ কোটি টাকা; ১৯৬৬-৬৭ সালে এটা দাঁড়ালো ২২২১ কোটিতে। ১৯৬৮-৬৯ বাদ দিয়ে (২০৭৩ কোটি টাকা) ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত পরিকল্পনা খাতে ব্যয় নীচের অঙ্কেই রইলো। ইতিমধ্যে জাতীয় আয়ের পরিমাণ শতকরা ২·৩ হারে বাড়তে থাকায়, পরিকল্পনা খাতে ব্যয় জাতীয় আয়ের ১১·৩ (১৯৬৫-৬৬) থেকে কমে দাঁড়ালো ৭·২ শতাংশে।

১৯৬৫-র পর সরকারী ব্যয় কমে যাওয়ার ধাক্কা এসে পড়লো যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়েছিল তাদের উপর। অর্ডারের অভাবে তারা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে চাইল। এই সময় থেকেই পশ্চিমবাংলায় কল-কারখানা, বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে, বন্ধ হতে আরম্ভ করে। পশ্চিমবাংলায় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে রেলওয়ে ওয়াগন তৈরীর কারখানাগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ে আছে। রেলওয়ে ওয়াগন তৈরী সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় অর্ডারের উপর নির্ভরশীল। ওয়াগন তৈরী সম্প্রতি কিভাবে কমেছে তা এখানে দেখানো হলো।

ছক নং ৫। পশ্চিমবাংলা ও ভারতে রেলওয়ে ওয়াগন তৈরীর হিসাব

সাল	ওয়াগন তৈরীর সংখ্যা	
	পশ্চিম বাংলা	ভারতবর্ষ
১৯৬৪—৬৫	২০,৭৫৮	৩৪,৫৪৩
১৯৬৫ - ৬৬	১৮,৫২১	৩৩,৫০৫
১৯৬৬ · ৬৭	১১,২৬৪	২১,২০৭
১৯৬৭—৬৮	৮,৫৮৫	১৭,৬৩৩

সারা ভারতে ওয়াগন তৈরী কমে গেছে ১৯৬৫ সালের পর থেকে। আরো লক্ষ্য করার যে, পশ্চিমবাংলার এ বিষয়ে যতটা অগ্রণী ভূমিকা ছিলো এখন আর তা নেই। ১৯৬৬-৬৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় সারা ভারতের ৬০ শতাংশ রেলওয়ে ওয়াগন তৈরী হতো। ১৯৬৭-৬৮তে এটা কমে দাঁড়ালো ৫০ শতাংশে। পশ্চিমবাংলার বিশেষ অবস্থা এর জন্য দায়ী বলা যেতে পারে।

১৯৬৬ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত পরপর যথেষ্ট বৃষ্টির অভাবে ভারতবর্ষের কৃষিতে বিপর্যয় হয়ে যায়। ভারতবর্ষে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প চট, সূতিবস্ত্র, চিনি ইত্যাদি কাঁচামালের জন্য সম্পূর্ণভাবে কৃষির উপর নির্ভর করে। কৃষিতে ফসলের উৎপাদনে ঘাটতি হলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি সাধারণভাবে সর্বত্র মজুরী বৃদ্ধির চাপ সৃষ্টি করে। তাছাড়া গ্রামের অধিবাসী ভারতবর্ষের প্রধান অংশ, প্রায় ৮০ শতাংশ। এদের অর্থনৈতিক অবনতি ঘটলে বাজারে পণ্যের চাহিদা যায় কমে। উপরের ঘটনাগুলির মিলিত প্রভাবে শিল্পে মন্দার ভাব আরো বাড়িয়ে দেয়। পশ্চিমবাংলায় এর সাথে যোগ হলো, কিছুটা এসবের প্রতিক্রিয়া হিসাবেও নিশ্চয়ই, ব্যাপক শ্রমিক বিক্ষোভ ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব। ১৯৬৫ থেকে পশ্চিমবাংলার শিল্পে যে ক্রমাবনতি দেখা গেলো ১৯৭০-৭১ সাল পর্যন্ত যে হিসাব পাওয়া যায় তাতে অবস্থার বিশেষ উন্নতি দেখা যায় না।

সাম্প্রতিক কালে ভারতবর্ষে অর্থনীতির বিকাশে কৃষি-ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি একটি বিশেষ অবদান। প্রচণ্ড খরার বৎসরগুলির মধ্যেও গমের উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত ছিলো। গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ধানের উৎপাদনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এ রকম সাফল্য লাভ করতে পারেনি। তাই পশ্চিমবাংলা নতুন কৃষি পদ্ধতির যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। তবুও বোরো ধানের ও গমের ক্ষেত্রে রাজ্যে উন্নত উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগ উৎসাহজনকভাবে বেড়েছে। নীচের ছকে কৃষিজ উৎ-পাদনের তথ্য এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে।

ছক নং ৬। পশ্চিমবাংলায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন

উৎপাদনের পরিমাণ (হাজার মেট্রিক টন)

বিষয়	১৯৫১-৫২	১৯৬১-৬২	১৯৬৮-৬৯
ধান	৩,৫৩৫	৪,৭৯৯	৫,৭৮০
আউস	৩৬৬	৩৯৭	৭২৮
আমন	৩,১৫৩	৪,৩৬৯	৪,৮৩০
বোরো	১৬	৩৩	২২২
গম	৪১	৩৪	৭১*
ডাল (pulses)	৩৯৭	৩৪২	৩৩৭
অন্যান্য খাদ্যশস্য (other cereals)	৭০	৮০	১২৪
মোট	৪,০৪৩	৫,২৫৫	৬,৩১২

এখানে দেখা যাচ্ছে ১৯৫১-৫২-র তুলনায় ১৯৬৮-৬৯ সালে আমন ধানের উৎপাদন যখন বেড়েছে ১·৫৩ গুণ তখন বোরো ধানের উৎপাদন বেড়েছে ১৩·৮৮ গুণ ও গমের উৎপাদন বেড়েছে ১·৭৩ গুণ। একই সময়ে খাদ্যশস্যের দাম বেড়েছে দ্বিগুণের উপর।

এইসব তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা হয় যে সাম্প্রতিক কালে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের আয় যথেষ্ট বেড়েছে। অনেকেই আশা করেছিলেন যে কৃষকের হাতে এই বাড়তি ক্রয়ক্ষমতা শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য নতুন চাহিদার সৃষ্টি করবে ও শিল্পে মন্দার ভাব কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে। এ আশা পূরণ হয়নি। তার কারণ প্রধানতঃ দুটি। প্রথমতঃ পশ্চিমবাংলার কৃষির সঙ্গে শিল্পের যোগাযোগ মূলতঃ একদিকে, অর্থাৎ শিল্পের জন্য কাঁচামালের যোগানদার হিসাবে। অন্যদিক থেকে শিল্প কৃষিকে সরবরাহ করে অল্পই জিনিষপত্র যথা, রাসায়নিক সার, পোকা-মাকড়ের ওষুধ, পাম্প ও অন্যান্য কৃষিযন্ত্র, বৈদ্যুতিক শক্তি ইত্যাদি। পশ্চিমবাংলার কৃষিতে ব্যাপকভাবে আধুনিক যন্ত্রপাতি, সার ইত্যাদির ব্যবহার না হলে রাজ্যে শিল্প বিকাশের ব্যাপক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না। গ্রামাঞ্চলে বাড়তি আয়ের সদ্ব্যবহার না হওয়ার দ্বিতীয় কারণ আয়ের বিষম বণ্টন। অর্থনীতিবিদ্‌-দের অনেকের মতে কৃষিতে যে উন্নতি হয়েছে তার লভ্যাংশ জমা হয়েছে প্রধানতঃ অবস্থাপন্ন কৃষক ও মহাজন শ্রেণীর হাতে। এর ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য চাহিদা যা বেড়েছে তা ট্রানসিস্টর রেডিও, বাইসাইকেল, ঘড়ি এইসব জিনিষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। যেহেতু গ্রামে অবস্থাপন্ন লোকের সংখ্যা বেশী নয় তাই এঁদের অবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি হলেও শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা ব্যাপকভাবে বাড়তে পারে না। জাতীয় নমুনা পর্যবেক্ষণের National Sample Survey রিপোর্টে দেখা যায় ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে লোকে ভোগ্যপণ্যের জন্য যে ব্যয় করেন, গড়ে তার শতকরা ৭৮ ভাগ যায় খাদ্য, জ্বালানী ও আলো এই খাতে। শহরাঞ্চলে লোকে একই খাতে ব্যয় করেন শতকরা ৬৯ ভাগ। গ্রামবাসীদের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের একটা বড় অংশ গ্রামাঞ্চলেই উৎপাদন করা হয়। আর পশ্চিমবাংলার গ্রামেই বাস করেন শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ।

পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে আয়-বৈষম্য যে বেড়েই চলেছে তার আর একটি লক্ষণ দেখা যায় ক্ষেতমজুরের সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি থেকে। ১৯৬১র আদমসুমারি অনুযায়ী এই রাজ্যের ক্ষেত মজুর ছিলো কৃষিজীবীদের ২৮·৫ শতাংশ। ১৯৭১-এর আদমসুমারিতে এই অনুপাত দাঁড়িয়েছে শতকরা ৪৪·৮এ। দুটি আদমসুমারির হিসাব ঠিক একভাবে করা হয়নি। এর জন্য ১৯৭১-এর হিসাবে ক্ষেতমজুরের অনুপাত কিছুটা বেশী এসে থাকতে পারে। কিন্তু মনে হয় না শুধু হিসাবের পদ্ধতির জন্যই এই অনুপাত এতটা বৃদ্ধি পেতে পারে। কাজেই গ্রামা-ঞ্চলে শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজন বর্তমান আয়-বৈষম্যের পরিবর্তন করে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মানুষের অবস্থার উন্নতি সাধন। এই উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য উপযুক্ত ভূমিসংস্কার ব্যবস্থার সাহায্যে কৃষিযোগ্য জমির পুন-র্বণ্টন আশু প্রয়োজন। জমির পুনর্বণ্টনের মধ্য দিয়েই কৃষিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার সম্ভব।

এ ছাড়া গ্রামাঞ্চলে শিল্পজাত দ্রব্যের প্রসারের অন্য কয়েকটি অন্তরায় দূর করা প্রয়োজন। সারা বৎসর শহরের সঙ্গে রাস্তার যোগাযোগ থাকে এরকম গ্রাম পশ্চিমবাংলায় কমই আছে। বৈদ্যুতিক যোগাযোগ আছে এরকম গ্রাম শতকরা হিসাবে মাত্র ৬·২ (১৯৬৮-৬৯)। এই সময়ে সারা ভারতের গড় ছিলো শতকরা ১২·৫। এর প্রতিফলন দেখা যায় কৃষিতে সেচের জন্য পাম্পের হিসাবে। ভারতবর্ষে প্রতি ১০০০টি গ্রামে গড়ে যখন ১৯৩০টি বৈদ্যুতিক পাম্প ব্যবহার করা হয় তখন এই রাজ্যে ব্যবহার হয় মাত্র ৩৭টি বৈদ্যুতিক পাম্প।

শুধু যে গ্রামাঞ্চলেই অধিকাংশ লোকের, যারা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, ক্রয়ক্ষমতার অভাব ঘটেছে তাই নয়। শহরাঞ্চলেও প্রায়

একই অবস্থা। মাসিক ৪০০ টাকার কম আয় করেন এই রকম শ্রমিকদের সাম্প্রতিক কালের দৈনিক আয়ের তথ্য নীচে দেওয়া হলো।

ছক নং ৭। পশ্চিমবাংলায় মাসিক ৪০০ টাকার নীচে আয় করেন এরূপ শ্রমিকদের অবস্থা:

বিষয়	১৯৬১	১৯৬৫	১৯৬৬	১৯৬৭	১৯৬৮
গড় আয়	৪·৬৯	৫·৯৯	৬·৬১	৭·২১	৭·৬৯
শ্রমিক শ্রেণীর ভোগ্যপণ্যের মূল্যসূচক (কলিকাতা)	১০১	১২৮	১৪৪	১৫৯	১৭১
আসল আয়	৪·৬৪	৪·৬৮	৪·৫৯	৪·৫৩	৪·৫০

মুদ্রাস্ফীতির জন্য টাকার মূল্য হ্রাস পেয়েছে; তার দরুণ কিভাবে প্রকৃত আয় কমেছে তা এখানে দেখা যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে পশ্চিমবাংলায় এই শ্রেণীর শ্রমিকরা যে দৈনিক ৭·৬৯ টাকা হারে মজুরী পান তা মহারাষ্ট্র (৯.০৮) ও গুজরাটের (৮·৩৯ টাকা) শ্রমিকদের থেকে কম। আর যাই হোক, শ্রমিকদের মজুরী পশ্চিমবাংলার শিল্প বিকাশের পথে অন্তরায় হয়নি।

এর উপরে আছে এই রাজ্যে ক্রমবর্ধমান বেকারের সংখ্যা। পশ্চিমবাংলায় ১৯৬৫ সালে রেজিস্ট্রিকৃত কারখানায় শ্রমিক নিযুক্ত ছিলো ৮ লক্ষ ৮০ হাজার। ১৯৬৯-এ ক্রমাগত কমতে কমতে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৭ লক্ষ ৯১ হাজারে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে শহর ও গ্রাম মিলিয়ে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক অংশের ক্রয়ক্ষমতা কমতে থাকলে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা কমতেই থাকবে।

পশ্চিমবাংলায় শিল্পের অগ্রগতির পথে দু'টি প্রধান অন্তরায় হলো বৈদ্যুতিক শক্তি আর উপযুক্ত যানবাহন বিশেষতঃ রেলওয়ে ওয়াগনের অভাব। এই দু'টি বিষয়েই পশ্চিমবাংলা গত দশ বৎসরে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। নীচের ছকে রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা ও বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হয়েছে।

ছক নং ৮। পশ্চিমবাংলায় বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন ও উৎপাদন ক্ষমতা

বিষয়	১৯৫০-৫১	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৯-৭০
বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (হাজার কিলো-ওয়াট)	৫১০·৬	৫৭২·১	১২৪৩·০	১৪৯৮ ৪	১৫২১·৭
বিদ্যুৎ উৎপাদন (লক্ষ কিলো-ওয়াট ঘণ্টা)	১২০৭২	২২৮২২	৪০৮০৩	৪৮১৯৭	৫২৯৯৩

১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন ক্ষমতা যদিও অল্পই বাড়ে তবুও উৎপাদন বাড়ে, ২ গুণের কিছু কম। পরবর্তী ৫ বৎসরে ১৯৬১ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও উৎপাদন দুইই বাড়ে। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে দেশের শিল্পোৎপাদনের অগ্রগতি যে হারে বাড়ে বৈদ্যুতিক শক্তির চাহিদা তার থেকে বেশী হারে বাড়ে। এর প্রধান কারণ সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে কারখানার যন্ত্রপাতি আরো বেশী বিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল হতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যে ১৯৬৫র পরবর্তী সময়ের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। ১৯৬৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন ক্ষমতা অপরিবর্তিত রয়ে গেছে; বিদ্যুৎ উৎপাদনও বেড়েছে অত্যন্ত ধীরগতিতে। এই বৎসরগুলিতে রাজ্যে

শিল্পের উৎপাদন মাত্রা কমতে থাকায় পশ্চিমবাংলায় বিদ্যুতের সংকটের বিষয় সাধারণের নজরে ছিলো না। সাম্প্রতিক কালে রাজ্যের শিল্পে পুনরুজ্জীবনের সূচনা হতেই এটা স্পষ্ট হয়েছে যে পশ্চিমবাংলায় বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন ক্ষমতা যথেষ্ট বেশী না বাড়াতে পারলে শুধু যে শিল্পের সমস্যা মিটবে না তা নয়, অধিকন্তু কৃষিতে যে উন্নত উৎপাদনের পরিকল্পনা হচ্ছে তাও ব্যাহত হবে।

রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থা, বিশেষ করে রেলওয়ে ওয়াগনের ব্যবস্থা, প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ফলে কয়লাখনিতে কয়লা জমে থাকছে। বড় বড় কারখানায় কাঁচামাল সরবরাহের অসুবিধা ঘটায় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। দীর্ঘদিন রাজ্যের রেলওয়ে ওয়াগন উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত থাকায় এই সমস্যা গভীর হয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে কিছু কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। যে রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান রসদ কয়লা উৎপন্ন হয় ব্যাপকভাবে আর যে রাজ্য রেলওয়ে ওয়াগন উৎপাদনে সব থেকে অগ্রণী, সেই রাজ্য এই দুটি বিষয়েই অসুবিধায় পড়বে এটা বিস্ময়ের উদ্রেক না করে পারে না।

এই রাজের শিল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো বিজ্ঞানের অবদানে যে আধুনিক শিল্পগুলি গড়ে উঠছে তার অনুপস্থিতি। এই দিক থেকে অন্যতম হলো পেট্রোলিয়মজাত রাসায়নিক শিল্প ও ইলেক্ট্রনিক শিল্প। সভ্যতার বর্তমান স্তরে পেট্রোলিয়ামজাত রাসায়নিক শিল্পের গুরুত্ব কত বেশী তা রাসায়নিক সার ও প্লাস্টিকের প্রচলন থেকে অনুমান করা যায়। রাসায়নিক শিল্পে বর্তমান সময়ে নানাধরনের বৈচিত্র্যময় এবং মূল্যবান প্রয়োগ পেট্রোলিয়মের উপর নির্ভরশীল। পশ্চিমবাংলার রসায়ন শিল্প এককালে ভারতবর্ষে সর্বাগ্রগণ্য ছিলো। তার মৌলিক উপাদানগুলি গুড় এবং কয়লা থেকে নিষ্কাশিত হয়ে আসছে। পেট্রোলিয়মের নাগাল এখনো রাজ্যের বাইরে। আশা করা হচ্ছে হলদিয়া পরিকল্পনা সফল হলে এই রাজ্যে পেট্রোলিয়ম শিল্পের প্রতিষ্ঠা হবে। রাজ্যে নতুন পরিকল্পনাগুলির মধ্যে ইলেক্ট্রনিকস্ শিল্পও গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে।

পশ্চিমবাংলার শিল্পের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে অর্ডার যাতে রাজ্যের শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার করে উৎপাদন দ্রুত বাড়ানো যায়।

দ্বিতীয়তঃ, কৃষিপ্রধান দেশে শিল্পের উন্নতি কৃষির উন্নতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কৃষিতে উন্নত ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তন হলেই শিল্পজাত দ্রব্য যথা, রাসায়নিক সার, টিউবওয়েল, পাম্প, ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির চাহিদা বাড়তে পারে। অন্যদিকে গ্রামের অধিকাংশ মানুষ যে দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে তাতে শিল্পজাত পণ্যের বাজারও বিস্তৃত হতে পারে না। উভয় দিক থেকেই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন ভূমি সংস্কারের দ্বারা জমির পুনর্বণ্টন যাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন কৃষিতে ব্যাপক হতে পারে এবং আয়ের বৈষম্যের পরিবর্তে আয়ের সুষম বণ্টনের দ্বারা পণ্যের ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হতে পারে।

তৃতীয়তঃ, রাজ্যে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির অবদান আধুনিক শিল্প যথা, ইলেক্ট্রনিকস্, পেট্রোলিয়মজাত রাসায়নিক শিল্প ইত্যাদির প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

চতুর্থতঃ, রাজ্যের শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে অন্যতম অন্তরায় বৈদ্যুতিক শক্তি ও রেলওয়ে ওয়াগনের অভাব। বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা ও রেলওয়ে ওয়াগনের সরবরাহ যথেষ্ট বৃদ্ধি না হলে পশ্চিমবাংলার উন্নতি দুরূহ হয়ে থাকবে।

পশ্চিমবাংলার শিল্পে যে উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমানে অব্যবহৃত রয়েছে তার পূর্ণ ব্যবহারের জন্য উপযেগী ব্যবস্থা মোটেই আয়ত্তের বাইরে নয়। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করলে রাজ্যে শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা যথেষ্ট আশাপ্রদ।

পান্নালাল দাশগুপ্ত

সমষ্টি-উন্নয়ন ও সমাজ-কল্যাণ শব্দ দুটি পরস্পরের পরিপূরক। উন্নয়নটা যদি সমষ্টিগত হয়, জনকল্যাণ সেখানে অবশ্যাম্ভাবী ফলশ্রুতি। কিন্তু পঁচিশ বছরের স্বাধীনতার ফলশ্রুতির সমীক্ষাতে দেখা যায় যে উন্নয়ন হয়েছে বটে, কিন্তু সমষ্টিগত উন্নয়ন হয়নি, ফলে জনকল্যাণের আদর্শ ফলপ্রসূ হয়নি। দেশে শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিক্ষেত্রে গ্রোথ বা উন্নয়ন হয়নি, একথা বলা যায় না। ভারী শিল্প, মাঝারি শিল্প, কৃষিতে সবুজ বিপ্লব ইতস্তত দেখা যায়, কিন্তু তার ফলাফল বা লাভ বা সার্থকতা সকল স্তরের মানুষকে উপকৃত করেনি। শুধু তাই নয়, সকল মানুষকে কাজও দেওয়া যায়নি, বেকার ও অর্দ্ধবেকার সমস্যা আজ আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ ব্যবস্থাকে বিপন্ন করে তুলছে।

পরিকল্পনা কমিশনের হিসেব ও ঘোষণা মতেই আমাদের দেশের শতকরা চল্লিশজনের জীবনমান আজ দারিদ্র-সীমা রেখার (Poverty line) নীচে! ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যমান হিসেবে যাদের আয় বিশ টাকা (মাসিক) অথবা তারও নীচে, এই হিসেবেই দারিদ্র-সীমা নির্দ্ধারিত করা হয়েছে। এই বিশ টাকাও নির্দ্ধারিত হয়েছিল সর্বনিম্ন যে প্রয়োজনের কথা বিশেষজ্ঞরা অনুমোদন করেছিলেন তার অর্দ্ধেক ধরে। ১৯৭২ সালের মূল্যমান ১৯৬০-৬১ সালের অন্তত দ্বিগুণ হয়ে গেছে। তাহলে এখন ধরা হয়, প্ল্যানিং কমিশনের মতে, মাসিক মাথাপিছু চল্লিশ টাকা। মনে রাখা দরকার নিউট্রিশন কমিটির অনুমোদনের নিরিখে এটা নিম্নতম প্রয়োজনের অর্দ্ধেক। (ডঃ কে, এন, রাজের 'ওয়ালচাঁদ মেমোরিয়াল' বক্তৃতা দ্রষ্টব্য)।

এখন পর্যন্ত যে হিসেব পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৭০-৭১ সালে পশ্চিমবাংলার মোট আয় ছিল ২৩০২ কোটি টাকা। সর্বভারতীয় হিসেবে এখন মোট আয়ের শতকরা ৭৯% ব্যক্তিগত ভোগে ব্যয় হয়। তাহলে ঐ সময়ে পশ্চিমবাংলার সাড়ে চার কোটি মানুষের ব্যক্তিগত ভোগের জন্য ছিল ১৮১৯ কোটি টাকা বা গড়পড়তা মাথাপিছু মাসিক ৩৮ টাকা। এর থেকে

সহজেই বোঝা যায় যে সামগ্রিকভাবে সমস্ত পশ্চিমবাংলার মানুষই নিম্নতম বা দারিদ্র-সীমার নীচে। প্রথমেই ধরা যাক সবচেয়ে গরীব ও সবচেয়ে নীচের শতকরা ১০ ভাগ লোকের আয়ের কথা ; এদের মাথাপিছু মাসিক আয় ১১ টাকারও কম—দৈনিক হিসেবে মাথাপিছু ৩৬ পয়সা, যা দিয়ে ২০০ গ্রাম চালও কেনা যায় না। **এভাবে দেখা গেছে পশ্চিমবাংলার লোক সংখ্যার ৭০ ভাগের সবাই এই নিম্নতম মানের নীচে, সর্বভারতে সে হার যেখানে ৪০%!** এই ৭০ ভাগ লোকের সবচেয়ে উপরের ১০ শতাংশের মাথাপিছু ব্যয় মাসিক ৩৮ টাকা বা দৈনিক ১ টাকা ৩৬ পয়সা। বাকি থাকে যে ৩০ ভাগ তাদের গড়পড়তা আয় মাসিক ৪০ টাকার বেশী। (দ্রঃ পঃ বঃ সরকার Economic Review ও চতুর্থ পরিকল্পনা, প্ল্যানিং কমিশন, ভারত সরকার)

পরিকল্পনা কমিশন এবারে তাই নির্দ্দেশ দিয়েছেন সব রাজ্যকেই এমন পরিকল্পনা করতে যাতে এই দারিদ্র-সীমার নিম্নবর্তী ২২।২৩ কোটি লোকের জীবনমান উন্নত হয়। এতকাল, ধরে নেওয়া হয়েছিল যদি দেশের 'গ্রোথ' বা উন্নয়নটা বৃদ্ধি পায়, তবে তার সুফল সকলস্তরে ও নিম্নস্তরের মানুষেরাও পাবে—আপনা-আপনিতেই। কিন্তু সেটা যখন হয়নি দেশে ৩। ৪টা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে অজস্র টাকা ঢেলেও, উপরন্তু দেশে দরিদ্রের সংখ্যা, বেকার সংখ্যা বেড়েই চলেছে, তখন ভাবতে হবে এমন ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা যাতে দরিদ্রদের "মিনিমাম নিড" নিম্নতম প্রযোজন অবশ্যম্ভাবীরূপ দেওয়া চলে। এই নিম্নতম প্রয়োজন কি, এবং কী ভাবে সকলকে কাজ দেওয়া যায় তার একটা গাইড-লাইনও নির্দ্ধারিত করে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন সকল রাজ্যযোজনা পর্যদের কাছে। যদি অনুমান করা হয় যে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় চতুর্থ যোজনার দ্বিগুণ অর্থ বিনিয়োগ করা হবে—এ জাতীয় একটা আভাস আছে—তবে এই 'মিনিমাম নিড'-এর প্রয়োজনে দরকার হবে ১১০০০ হাজার কোটি টাকা, আর স্বাভাবিক গ্রোথ বা উন্নয়ন বাবদ ২১,০০০ হাজার কোটি টাকা, মোট ৩২,০০০ কোটি টাকা। অবশ্য এ হিসেব কোন পাকাপাকি কথা নয়, দেশের যাবতীয় অর্থ ও অন্যান্য সঙ্গতি কী আছে বা হতে পারে তার সামগ্রিক ও খুঁটিনাটি হিসেব না হওয়া পর্যন্ত পাকা কথা কমিশন দিতে পারেন না।

কিন্তু নিম্নতম প্রয়োজন নির্দিষ্ট বা "নিড-বেইজড্" পঞ্চম যোজনা সম্ভব কিনা এ প্রশ্ন অর্থনীতি মহলে ইতিমধ্যেই উঠে গেছে। অর্থাৎ নিম্নতম প্রয়োজন (দারিদ্র-সীমার নিম্নবর্তী লোকদের প্রয়োজন) মেটাতে যে বিপুল অর্থ প্রয়োজন সেটা কি উন্নয়ন বা গ্রোথ থেকে আসবে? ৬ থেকে ১১ বৎসর পর্যন্ত সকল শিশু ও ছেলেমেয়েদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা, ১১ থেকে ১৪ বয়সের শতকরা পঞ্চাশের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা, প্রতি পনের শত অধিবাসীযুক্ত গ্রামের জন্য পাকা রাস্তা, শতকরা তিরিশ ভাগ গ্রামে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, সকলের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা, প্রতি তিরিশ হাজার লোকের জন্য একটি করে প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার, আর প্রতি পাঁচ হাজারে একটি সাব-হেল্থ সেন্টার ইত্যাদি যদি করতেই হয়, তবে তার রসদ জোগাবে কে? ২১,০০০ হাজার কোটি টাকার গ্রোথ বা উন্নয়ন বাবদ লগ্নি থেকে ১১,০০০ হাজার কোটি টাকার উদ্বৃত্ত, 'মিনিমাম নিডে'র প্রয়োজনে খরচবাবদ উদ্বৃত্ত, দেশ সৃষ্টি করতে পারবে তো? মোট কথা গ্রোথের উপর জোর না দিয়ে, বা আয়ের দিকে জোর না দিয়ে, নিড বা প্রয়োজন মেটাবার খরচের দিকে বেশী জোর দিলে কি দেশ দেউলে হয়ে যাবে না? এ যেন এক উভয়-সংকট; গ্রোথের উপর জোর দিলে মিনিমাম নিড বাবদ খরচ কাটতে হয়, আবার মিনিমাম নিডের উপর জোর দিলে গ্রোথ এর বরাদ্দ কমাতে হয়! "গ্রোথ উইথ জাস্টিস" যেন হতে চায় না, একই সঙ্গে উন্নয়ন ও ন্যায়সঙ্গত জনকল্যাণ যেন বিপরীতধর্মী! শ্যাম রাখি না কূল রাখি!

এই উভয় সংকট থেকে মুক্ত হতে জোরকদমে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও ব্যাপক জনকল্যাণের এমন কোন একটা পথ বের করতে হবে যাতে একই সঙ্গে উন্নয়ন এবং তার ফল লাভ

সকলের জন্য, বিশেষ করে দারিদ্র-সীমার নিম্নবর্তী লোকদের পক্ষে অবশ্যলভ্য হয়।

আমাদের বক্তব্য এই যে এ পথ বের করা সম্ভব। এবং সেই পথে অগ্রসর হলে পঞ্চম যোজনাকালেই দারিদ্র-সীমার উপরে সবাইকে টেনে আনা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ, কিন্তু বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারা যাবে, পথে যেতে যেতে আর দিগভ্রম হবে না, পথ থেকেই পথিকের আরও জোর কদমে অগ্রসর হবার শক্তি মিলবে, স্বয়ম্ভর অর্থনীতি, স্ব-পরিপূরক অর্থনীতির শক্ত বনিয়াদ সৃষ্টি হবে, ভিক্ষা করে বেড়াতে হবে না দেশে দেশে—একথা বলা যায়। কেমন করে?

সমষ্টি-উন্নয়ন বা সর্বজনকল্যাণ, মুষ্টিমেয়র উন্নয়ন বা কল্যাণ নয়, তবে তার একটিই মাত্র মৌলিক উপায় আছে। সে হলো সমষ্টিকে কাজে লাগিয়েই সমষ্টির উন্নয়ন, সোজা কথায় সকলকে কাজ দেওয়া, এমন কাজ দেওয়া যাতে উৎপাদন বাড়ে। একদল লোককে দাবিয়ে রাখার জন্য, অপর দলকে কাজ দেওয়া নয়; একদল বেকারকে বেকারভাতা দিয়ে বসিয়ে রাখাও নয়; দেশের শতকরা ৪০টি দরিদ্রকে এটা সেটা দিয়ে, জি-আর, টি-আর দিয়ে বা ভিক্ষা বিতরণ করেও নয়; কাজের নামে অকাজ সৃষ্টি করেও নয়; জেলখানার সশ্রম কয়েদীদের কাজ দেবার মত কাজ দিয়েও নয়; যে কাজে উৎপাদন বাড়ে না এমন কাজ দিয়েও নয়। দেশের এক অংশের শ্রম দিয়ে সর্বাংশকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। মিনিমাম নিড মেটাতে হবেই, কিন্তু তার জন্য দরকার মিনিমাম এমন একটি কর্মকান্ড বা কর্মযজ্ঞ বা কাজের অভিযান, যাতে সকলে সক্রিয় ও ফলদায়ক অংশ নিতে পারে। যেন কারো অনুগ্রহের উপরে কাউকে নির্ভর করতে না হয়।

শ্রমশক্তি ও বুদ্ধিশক্তি দেশে যত আছে, শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত, অশিক্ষিত কর্মক্ষম যত নরনারী আছে—তাদের সকলকে কাজ দিতে হবে। দেশের যতটা শিল্পশক্তি সৃষ্টি হয়েছে, তাদের পরিপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে, কলকারখানা বসে থাকবে না, রাত্রি-দিন কাজ হবে। দেশে যত চাষযোগ্য জমি আছে তাতে সারা বছর চাষ করাতে হবে, বছরে ২।৩টি করে ফসল ফলাতে হবে। কিন্তু কী হয়? কোটি কোটি লোক বেকার ও অর্ধবেকার। বছরে একটার বেশী চাষ হয় না, তাও বৃষ্টি-নির্ভর খরিফ চাষ, আর বৃষ্টির অভাবে খরা অথবা অতিবৃষ্টিতে প্লাবন লেগেই আছে, একটার পর অপরটা, এ রাজ্যে নয়তো ও রাজ্যে। সারা বছর সেচ পায় এমন জমি মোট জমির একশ ভাগের পাঁচ ভাগেরও কম। আকাশের জল, নিয়ন্ত্রিত নদীর জল, খাল বিলের জল, মাটির নীচের জল—সব জলকে সব জমিতে নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার আনতে হবে। বছরে তিনটা করে চাষ নিশ্চিত করতে হবে এবং অধিক ফলনশীল স্বল্পমেয়াদী উন্নত জাতের ফসলের বীজ ব্যবহার করতে হবে। পর্যাপ্ত রাসায়নিক সার তৈরী ও ব্যবহার করতে হবে এবং দিতে হবে সকল জমিতে সকল চাষীকে। কেবল মানুষের খাদ্য নয়, কেবল শিল্পের কাঁচামালই নয়, পশু খাদ্যও তৈরী করতে হবে প্রচুর—চাষ থেকেই। এর জন্য চাই প্রচুর বিদ্যুৎশক্তি, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা। সারা বছর কাজ পাবার জন্য ও উন্নত প্রথায় চাষ বাসের জন্য সর্বসাধারণের আয় যেমন বাড়বে, কাপড় চোপড় জামা জুতা ইত্যাদি ভোগ্য দ্রব্যের চাহিদাও তেমনি বাড়বে—ফলে এসবের শিল্পও প্রচুর কাজ পাবে। কোন শিল্প আর রুগ্ন হবে না। এতবড় উন্নত ধরনের চাষবাস ও শিল্পকাণ্ডের জন্য প্রচুর চাহিদা হবে শিক্ষিত ব্যক্তি-দের, কুশলী কারিগর ইঞ্জিনিয়ার আর বিশেষজ্ঞদের। আর দিতে হবে সবাইকে কাজের জন্য যাবতীয় যোগান। সব কৃষক, ছোট বড় মাঝারি, যেন মূলধনের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, অতএব মূলধন লগ্নির যোগ্যতা সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল রাখলে চলবে না। কিন্তু বর্তমানে কী হয়? দেশের চাষীদের শতকরা পাঁচজনের বেশী জাতীয়কৃত ব্যাঙ্কের মূলধন পায় না। তাছাড়া বহুবিভক্ত বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট জোতের সীমানার মধ্যে নিজ নিজ দায়িত্বে সেচ, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট ইত্যাদি চাষীরা নিতে পারেন না। উন্নয়নের একটা বড় অঙ্গই হলো ইনভেস্টমেণ্ট বা অর্থবিনিয়োগ। এর অভাবে সকলের উন্নয়ন বা সমষ্টি-উন্নয়ন হতেই পারে না। ফলে মুষ্টিমেয়র পক্ষেই মূলধন তথা উন্নয়নের সুযোগ পাওয়া সম্ভব। অথচ মুষ্টিমেয়কে যাবতীয় সহায় সম্বল ও সঙ্গতি

যুগিয়ে দিতে যায় যদি দেশ, মুষ্টিমেয়রাও তার ব্যবহার করতে পারে না, পারবে না। তাছাড়া গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ যাবে, কিন্তু ব্যবহার করতে পারবে মাত্র শতকরা পাঁচজন লোক যে বিদ্যুৎ, সে বিদ্যুৎ প্রকল্প কখনো স্বয়ম্ভর হতে পারে না, বিদ্যুৎ পর্ষদ ও দেশ তাতে দিন দিন দেউলে হতে বাধ্য। আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও তার বাস্তব ব্যবহার আজ সে সবক্ষেত্রেই ফলদায়ক ও লাভজনক হতে পারে যেখানে তার বহুল ব্যবহার, ব্যাপক প্রয়োগের ক্ষেত্র তৈরী হয়। অর্থাৎ সমষ্টি ব্যবহার হয় বা ম্যাস-ইউটিলিজেশন সম্ভব হয়।

দেশের শতকরা ৮০টি লোক আজও গ্রামে পড়ে আছে। পশ্চিমবাংলার শতকরা ৭০টি লোক আজ যে দারিদ্র-সীমার নীচে পড়ে আছে, তাদের শতকরা ৯০টি লোক আজও গ্রামেই। আর গ্রামেই অনেককে কাজ দেওয়া সম্ভব, যদি সব মাঠে সারা বছর চাষ বাসের ব্যবস্থা করা হয়। এমন কোন পিছিয়ে-পড়া অঞ্চল নেই যেখানে জমি পড়ে নেই। কোন্ শিল্পে সবাইকে কাজ দেওয়া যাবে এ কথা বা এ সমস্যা আমাদের নেই, হাতের কাছে যে বিরাট জমি পড়ে আছে তাতেই সারা বছর হাত লাগা-বার ব্যবস্থা করি না কেন? চাষটাই আমাদের প্রধান শিল্প বলে ধরে নিই না কেন? পিছিয়ে-পড়া অঞ্চলগুলিকে অগ্রগামী করার প্রধান উপায় তথাকার চাষটাকে ধরা—ভাল করে ধরা। দেখা যাবে হয়তো সব থেকে পিছিয়ে-পড়া অঞ্চলটার ভবিষ্যৎই সবচেয়ে উজ্জ্বল সম্ভাবনাময়। চাষের উন্নতি বা শিল্পায়িত আধুনিক চাষের সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিক ক্রিয়াকান্ড আপনা থেকেই আসতে থাকবে, যেমন কাণ টানলে মাথাটা আপনিই আসতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে পশুপালন, ডেয়ারী, পোল্ট্রি, পিগারি, রাস্তাঘাট, বাজার, কুটির শিল্প ইত্যাদি দেখা দিতে থাকবে—নানাবিধ উদ্যম ও উদ্যোগ ভূঁইফোড়ের মত ফুটতে থাকবে—ঐ ভূমি থেকেই, ঐ চাষ থেকেই এবং সর্বসাধারণের শ্রম ও বুদ্ধি থেকেই। শিক্ষা, সত্যিকার বুনিয়াদী শিক্ষা, জীবন সংগ্রামে জয়ী হবার শিক্ষা, সহযোগিতার শিক্ষা তখনই দেখা দেবে—কেননা প্রকৃত শিক্ষা ও সহযোগিতা ছাড়া এসব সার্থকও হতে পারে না। সকলের জন্য উন্নত জীবনের ভিত্তি এ থেকেই রচনা করা চলবে।

সমষ্টি উন্নয়নের কথা উঠলেই আমাদের ব্লক ডেভেলপ-মেণ্ট অফিসের কথা মনে পড়ে। স্বাধীন ভারত গ্রামে গ্রামে ব্লক এজন্যই সৃষ্টি করেছিল, আর দিয়েছিল পঞ্চায়েতী রাজের আদর্শ আইন। ব্লক-ডেভেলপমেণ্ট অফিস কতকটুকু করেই তার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। পঞ্চায়েত রাজ পশ্চিমবাংলায় একটা লজ্জাকর প্রতিষ্ঠান হয়ে আছে। প্রতিটি ব্লকের কর্মচারী ও অফিসের মাসিক বেতন ও খরচ কম করে বিশ হাজার টাকা। প্রশ্ন উঠেছে এতটাকা খরচ করার কী অর্থ যদি ব্লক-ডেভেলপ-মেণ্ট-এ ডেভেলপমেণ্টটাই না থাকে? তাই অনেকে মনে করেন, এটা উঠিয়ে দিলেই বা কি ক্ষতি?

এদিকে ব্লক আজ এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা উঠিয়ে দিলে তার পরিবর্তে কী থাকবে—সরকারের হাতে কোন্ বিশেষজ্ঞ হাতিয়ার ও সংগঠন থাকবে যা দিয়ে কোন উদ্যোগ, কোন প্রকল্প, কোন উন্নয়ন করা সম্ভব হবে? পঞ্চায়েত তুলে দিলেই বা জন-গণের সক্রিয় সহযোগিতা ও নেতৃত্ব আসবে কোথা থেকে? এত বছরের ইতিহাসেও ব্লক ও পঞ্চায়েতের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরী হলো না, দুয়ের মধ্যে কোন সেতু বন্ধন হলো না, সরকারের সঙ্গে জনসাধারণের সেতু বন্ধন তৈরী হলো না। পঞ্চায়েত ও ব্লকের প্রাণশক্তি জাগ্রত হলো না কেন? কেন তারা ব্যয়বহুল অথচ কোন্দল-বহুল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে বা হয়েছে? কেন ব্লকগুলি গ্রামের লোকদের তোয়াক্কা করে না? আসলে কাজ নেই বলেই যত প্রকারের নেতিবাচক ক্ষতিকারক দুর্গুণগুলি ফুটে বের হচ্ছে। ব্লক-ডেভেলপমেন্ট অফিস আছে, কিন্তু ডেভেলপমেণ্টের কোন প্ল্যান নেই, ব্লক সব আছে, নেই কেবল উন্নয়নের প্ল্যানিং ইউনিট। গড়ে প্রতি ব্লকে হয়তো আছে ৫০ হাজার একর চাষের জমি। এত জমিতে সারা বছর চাষ-যোগ্য সেচ পাম্প বিদ্যুৎ রাস্তাঘাট শ্রমশক্তি বুদ্ধিশক্তি জনশক্তি কী আছে ও বছর বছর কতটা কাজ হাতে নেওয়া হবে তার জন্য

কোন প্ল্যান নেই। হঠাৎ হয়তো উপর থেকে কিছু টাকা বরাদ্দ হলো, কোথায় কী ভাবে কাজে লাগাতে হবে তার জন্য নেই কোন পূর্ব পরিকল্পনা, যেমন তেমন করে টাকা খরচ করে দেওয়া হবে, হয়তো খরচ করতে পারবে না বলেই গ্রহণ করতেও চাইবে না। অনেক অযোগ্যতা ও অক্ষমতার মধ্যে একটি মাত্র উদাহরণ দেওয়া গেলো।

সবটা যে ব্লকেরই দোষ বা ত্রুটি তা নয়। রাষ্ট্রীয় নীতিই এর জন্য প্রধানত দায়ী। সব জমিতে চাষ হতে বাধ্য, সব চাষীকে মূলধন দিতে বাধ্য, সব শক্তিকে নিয়োজিত করার নির্দেশ ও তদনুগ আইন-কানুন ও ব্যবস্থা আমরা করেছি কি? সমবায়িক উপায়ে চাষবাস শিল্প বাণিজ্য করার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় সংগতির যোগান দেবার ব্যবস্থা করেছি কি? সকলের শ্রমশক্তিকে কাজে নিয়োজিত করা যায় এমন ধরনের পরিকল্পনা কি যোজনা কমিশন করেছেন?

আজ এইসব কথা ভাবতে হবে। সমষ্টি উন্নয়ন ও সর্বজনকল্যাণের কার্যক্রম যদি সত্যি নিতে হয়, সকল মানুষ সকল জমি সকল অর্থ সকল সংগতিকে সমষ্টিগতভাবে সমষ্টির প্রয়োজনে লাগাবার পথ বের করতেই হবে।

পশ্চিমবঙ্গের সম্পদ সম্ভার

নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

বাংলাদেশ একদা যেসব প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল তার কিছু পুরাতন উল্লেখ ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর "বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব" গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

ঐসব উদ্ধৃত উল্লেখ থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের মাটি, জল ও খনি থেকে আহরণযোগ্য সম্পদের সঞ্চয় বড় কম ছিল না। ঐসব উদ্ধৃতির মধ্যে মাছ, আম, মহুয়া, নানাবিধ ফল ও ফসলের উল্লেখ তো আছেই, আরও কিছু কিছু বনজ, খনিজ অথবা জলজ সম্পদের উল্লেখও আছে যেগুলির এখন আর দেখা মেলে না।

বাংলাদেশে যে এক সময় হীরা পাওয়া যেত তার একাধিক উল্লেখ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের টীকাকার লিখেছেন, "হীরামণি" হচ্ছে বাংলাদেশের অন্যতম আকরজ দ্রব্য। হীরামণির খনির উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি পৌণ্ড্রক ও ত্রিপুর (ত্রিপুরা)-এর নাম করেছেন। "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থে মদারণ বা গড় মন্দারণে হীরার খনির উল্লেখ করা হয়েছে। রত্নপরীক্ষা, বৃহৎ-সংহিতা, নবরত্নপরীক্ষা, রত্নসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে বাংলাদেশের হীরার কথা বলা হয়েছে।

বাংলার মাটি থেকে যে এক সময় সোনা ও রূপা পাওয়া যেত তারও কিছু কিছু উল্লেখ এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে আছে। ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে উল্লেখ আছে যে, রাঢ় দেশে লৌহ-খনি আছে। রাঢ়ের দক্ষিণ সমুদ্র থেকে মুক্তা আহরণের কথা উল্লেখ করা আছে রাজেন্দ্র চোলের (একাদশ শতাব্দী) তিরুমলয় লিপিতে।

লবঙ্গের জন্য এখন আমাদের সম্পূর্ণভাবে বিদেশ থেকে আমদানির উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিতে" দেখা যায়, বরেন্দ্রভূমিতে এক সময়ে প্রচুর পরিমাণে লবঙ্গ জন্মাত। ঐ একই গ্রন্থ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ঐ অঞ্চলে খুব ভাল জাতের এলাচের সুবিস্তৃত চাষ ছিল।

প্রাচীন কাল ছেড়ে আধুনিক কালে এলে আমরা দেখতে

পাই যে, খনিজ দ্রব্য উৎপাদনের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের স্থান সারা ভারতবর্ষের মধ্যে দ্বিতীয়। সারা দেশের মধ্যে আর যে একটি মাত্র রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বেশি খনিজ দ্রব্য আহরণ করে সেটি হচ্ছে বিহার।

১৯৬৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে খনিজ দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫১ কোটি ৯৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। এটা সমগ্র দেশের উৎপাদনের ২১ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের মোট খনিজ উৎপাদনের একটা খুব বড় অংশই (৯০ শতাংশের বেশি) জুড়ে আছে কয়লা। কয়লার পর যে খনিজ দ্রব্যটির উৎপাদনে সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য স্থান রয়েছে সেটি হচ্ছে ফায়ারক্লে। এটির উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান বিহার ও মধ্য প্রদেশের পর।

কয়লা হচ্ছে নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ। ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখতে গেলে, পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে ভারতবর্ষের কয়লা শিল্পের সূতিকাগার। ভারতবর্ষের প্রথম কয়লা খনি চালু হয়েছিল বর্ধমান জেলার সীতারামপুরের কাছে এথোরা গ্রামে।

পরিমাণগতভাবে, পশ্চিমবঙ্গের খনিগুলিতে মোট প্রায় ১৩০০ কোটি টন কয়লার সঞ্চয় রয়েছে বলে অনুমান করা হয়েছে। এটা সারা দেশের খনিগুলিতে কয়লার মোট আনুমানিক সঞ্চিত ভান্ডারের প্রায় এক তৃতীয়াংশ।

পশ্চিমবঙ্গের এই কয়লা মোটামুটি তিনটি এলাকায় সীমাবদ্ধ। বর্ধমান জেলার গোটা পশ্চিমাংশ জুড়ে এবং অজয় ও দামোদর নদের তলা দিয়ে দক্ষিণ বীরভূম ও উত্তর বাঁকুড়া জেলার কিছু অংশ পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে রাণীগঞ্জ ও বরাকর কয়লাখনি অঞ্চল। এছাড়া দার্জিলিং জেলায় সামান্য কিছু নিকৃষ্ট ধরণের কয়লা পাওয়া যায়।

রাণীগঞ্জের কয়লা সহজদাহ্য। এখানকার কিছু খনি থেকে ধাতুশোধনের জন্য ব্যবহৃত ভাল জাতের কয়লা পাওয়া যায় আর কিছু খনির কয়লা ঝরিয়ার কয়লার সঙ্গে মিশিয়ে ধাতুশোধনের জন্য ব্যবহার করা হয়। বরাকরের কয়লা সাধারণত ধাতুশোধনের উপযোগী এবং ওয়াশারিতে বাছাই করে নেওয়ার পর ঐ কয়লা সেভাবে ব্যবহার করা হয়।

দার্জিলিং-এর কয়লাখনিগুলির অর্থনৈতিক গুরুত্ব খুব বেশি নয়। এই খনিগুলিতে এক লপ্তে খুব বেশি কয়লা পাওয়া যায় না, যা পাওয়া যায় তাও গুঁড়ো কয়লা। একমাত্র বাগরাকোট অঞ্চলেই অপেক্ষাকৃত ভাল জাতের কিছু কয়লা পাওয়া যায়।

অবিভক্ত বাংলার শিল্প প্রসারের ইতিহাস অনুশীলন করলে দেখা যাবে, এই শিল্প প্রসারের মূল ভিত্তি ছিল কয়লা। পশ্চিমবঙ্গের নিজের ভাল জাতের আকরিক লোহা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠেছে ও কলকাতার আশেপাশে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রধানত এই সহজলভ্য কয়লার আকর্ষণে।

কিন্তু, আবার এ কথাও ঠিক যে, এই কয়লার সম্পদ ভাল ভাবে ব্যবহার করে শিল্পসম্ভার গড়ে তোলার যে সম্ভাবনা ছিল সেটাকে পশ্চিমবঙ্গ পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গের কয়লার প্রধান ও নির্ভরযোগ্য ক্রেতা হল রেলওয়ে। সেই সুনিশ্চিত বাজারের উপর ভরসা করেই পশ্চিমবঙ্গের কয়লা শিল্প নিশ্চিন্ত থেকেছে, উন্নতি বা অগ্রগতির জন্য বিশেষ কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। কাঁচা কয়লা পুড়িয়ে কোক কয়লা তৈরি করা হয়েছে, ঐ পোড়া কয়লার ধোঁয়া থেকে যেসব মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ উদ্ধার করা যেত তা করা হয়নি।

কয়লাকে কাজে লাগাবার সম্ভাবনার বিষয় বিবেচনা করেই ১৯৬২ সালে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক রিসার্চের "টেকনো-ইকনমিক সার্ভে" রিপোর্টে বলা হয়েছিল,

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পঁচিশ বছরে বৃহৎ শিল্পোদ্যোগেও পশ্চিমবঙ্গ অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে। বৃহৎ শিল্প ও শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেশ কয়েক জায়গায়। (বামে) হলদিয়ায় দ্রুত নির্মীয়মান তৈল শোধনাগার তারই বিশিষ্ট স্বাক্ষর। (নিচে দক্ষিণে) হলদিয়ায় যে জনপদ গড়ে উঠছে, তার আবাসন প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ।

(নিচে বামে) হলদিয়া পোতাশ্রয়ের নির্মীয়মান জেটি। এর কাজ সমাপ্তির পথে।

হলদিয়ার বন্দর প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে। (নিচে দক্ষিণে) দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা ও কোক চুল্লী প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের এক বিরাট সাফল্য। বহু শিল্পোদ্যোগ সমন্বিত দুর্গাপুরকে 'ভারতের রূঢ়' এই নামকরণের মূলে এদের অবদান যথেষ্ট।
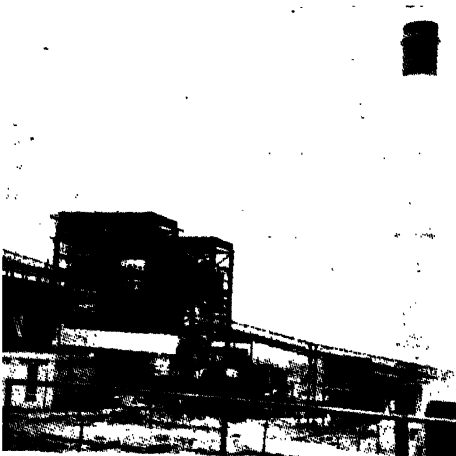
(উপরে বামে) সাঁওতালডিহির বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। এই কেন্দ্র শীঘ্রই চালু হবে।

বিগত পঁচিশ বছরে কৃষি ব্যবস্থার উল্লেখ-যোগ্য উন্নতি হয়েছে পশ্চিম-বঙ্গে। বহুমুখী নদী প্রকল্প ছাড়াও, দূরে দূরে গ্রামে সেচের জল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে ক্ষুদ্র সেচের মাধ্যমে। যেমন, (বামে) অগভীর নলকূপের গুচ্ছ প্রকল্প ও (দক্ষিণে উপরে) গভীর নলকূপের দ্বারা। এর ফলে ফলনের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। (মধ্যে বামে) গমের ফলনে পশ্চিমবঙ্গ অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছে।

(দক্ষিণে মধ্যে) চাষের কাজে কৃষকেরাও অনেক প্রগতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছেন বৈজ্ঞানীক পদ্ধতির ব্যাবহারে। হাওড়ার এক তরুণ চাষী নিজের জমিতে কীটনাশক ঔষধ স্প্রে করছেন।

এইসব ব্যবস্থার ফলে একর প্রতি ফলন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। (উপরে) এক সফল কৃষিজীবী ধান নিয়ে ঘরে ফিরছেন। (বামে) অধিক ফলনশীল আই, আর-৮-এর ধানকাটার পালা শেষ হয়েছে।

বিগত ২৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গের নারীসমাজ পুরুষের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে এসেছেন অনেকখানি। (উপরে বামে) এমনকি পর্বত অভিযানের ক্ষেত্রেও তাঁরা পিছিয়ে নেই। ১৯৭০-এ হিমাচল প্রদেশে লোহুল-এ ললনা পর্বতে সফল অভিযানের শেষে গিরিশৃঙ্গে (বাম থেকে দক্ষিণে) সুদীপ্তা সেনগুপ্তা, সুজয়া গুহ ও কমলা সাহা, শেষোক্ত দুজন প্রত্যাবর্তনের সময় নিহত হন। এমনকি শিল্পাঞ্চলে বিশেষায়নেও নারীরা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। (উপরে দক্ষিণে) সুতা শিল্পের কারখানায় কর্মরতা একজন নারী শ্রমিক। দক্ষতায় পুরুষদের চেয়ে কম নন।

স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েরা বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করেছেন। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা পুরুষদেরও ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। (উপরে বামে) মেয়েদের একটি কলেজের দৃশ্য। শরীর চর্চার ক্ষেত্রেও মেয়েরা অগ্রসর হয়ে গেছেন অনেকখানি। (মাঝে দক্ষিণে) ব্রতচারী নৃত্যের মাধ্যমে মেয়েদের শরীরচর্চা। (নিচে বামে) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মূকবধির নারীরা সিরামিক্সের কাজ করছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার দ্বারা এঁরাও নিজেদের স্বাবলম্বী করে তোলবার সুযোগ পাচ্ছেন। (নিচে দক্ষিণে) সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নারীদের অবদান যথেষ্ট। এখানে তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের লোকরঞ্জন শাখার নারী শিল্পীদের শ্যামা নৃত্য-নাট্যের একটি দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে। সামনের সারিতে : উৎপলা ভট্টাচার্য ও লক্ষ্মী দে।

পশ্চিমবঙ্গের বিচিত্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে তফসিলী আদিবাসীবৃন্দ এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁদেরই কয়েকটি গোষ্ঠীর ছবি এখানে দেওয়া হল। (উপরে বামে ও সর্বনিম্নে দক্ষিণে) বীরহোড় বালিকা (২য় সারির মধ্যে) বীরহোড়দের কুটির।

(উপরে মধ্যে) ওরাঁও সম্প্রদায়ের কৃষিকর্ম। (বামে ও নিচে দক্ষিণে) সাঁওতাল পুরুষ ও রমণীদের নাচ। (সব উপরে দক্ষিণে) কর্মরতা ওরাঁও নারী। (উপরে দক্ষিণে) নিজস্ব অলংকারে সুসজ্জিতা মেচ নারী। (নিচে বামে) রাভা সম্প্রদায়ের এক কর্মঠ যুবক। (নিচে মধ্যে) বন্য সারল্যে ভরপুর এক সাঁওতাল যুবক।

"ব্যাপক ব্যবহারের দিক থেকে (সব খনিজ পদার্থের মধ্যে) কয়লার সম্ভাবনাই উজ্জ্বলতম।" ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছিল, "পশ্চিমবঙ্গে একটি বৃহৎ কয়লা-ভিত্তিক শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে। জোরের সঙ্গে আমরা সুপারিশ করছি যে, পশ্চিমবঙ্গে বৃহৎ একটি কয়লা-ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠার দিকে রাজ্য সরকার যেন দৃষ্টি দিয়ে যেতে থাকেন।"

পশ্চিমবঙ্গে কয়লা-ভিত্তিক শিল্পের এই সম্ভাবনার কথা পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ভালভাবেই বুঝেছিলেন এবং তাঁরই উৎসাহে ও উদ্যোগে দুর্গাপুর কেমিক্যালস্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয়, নানা কারণে দুর্গাপুর কেমিক্যালস্ ডাঃ রায়ের আশা পূরণ করতে পারেনি।

পশ্চিমবঙ্গের কয়লা শিল্পের সামনে যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছে সেগুলির মধ্যে একটি হল পরিবহণের সমস্যা। খনির মুখে কয়লা স্তূপীকৃত হচ্ছে। রেলওয়ে ওয়াগনের নিয়মিত সরবরাহের অভাবে সেই কয়লা সরান যাচ্ছে না। ট্রাকে করে যাতে কয়লা পাঠান যায় সেজন্য খনি অঞ্চলে সড়ক নির্মাণের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু সেই পরিকল্পনার কাজ আশানুরূপ অগ্রসর হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে কয়লা শিল্পের আর একটি সমস্যা হল যন্ত্রের ব্যবহার প্রবর্তনের। এই শিল্পের অগ্রগতি করতে হলে কয়লা কাটার কাজে যন্ত্র নিয়োগ করতে হবে। কিন্তু কয়লা খনির কাজে যন্ত্র ব্যবহার করা যাবে কিনা সেটা আবার নির্ভর করছে অর্থ লগ্নি করার ক্ষমতা ও ইচ্ছার উপর, যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে কিনা তার উপর এবং বেকারির সম্ভাবনা সম্পর্কে শ্রমিকদের আশঙ্কা দূর করা যাবে কিনা তার উপর।

কয়লার পরেই যেটি পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ সেটি হল "ফায়ারক্লে।" রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে এটি পাওয়া যায়। ফারনেসের তাপসহ ইট তৈরি হয় এই ফায়ারক্লে দিয়ে। পাথরের জিনিসপত্র ও স্যানিটারি ফিটিংস তৈরি করতেও এই খনিজ পদার্থের প্রয়োজন হয়।

শিউড়িতে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার অধিবেশনে বীরভূম জেলার খনিজ সম্পদের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এইসব খনিজ সম্পদ কাজে লাগাবার জন্য একটি কর্পোরেশন গঠনেরও প্রস্তাব হয়েছে। বীরভূম থেকে যেসব খনিজ পদার্থ পাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলির মধ্যে একটি হল কাল পাথর বা "ব্ল্যাকস্টোন।" কাল পাথর থেকে পাথরকুচি পাওয়া যায় আর এই পাথরকুচি যেকোন নির্মাণ কার্যে অপরিহার্য। সকলেই জানেন, চাহিদার তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে পাথরকুচির অভাব কত বেশি। পাথরকুচির অভাবে ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেণ্ট অথরিটির কাজ আটকে যাচ্ছে। এই পাথরকুচি এখন পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়। একটি হিসাবে প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গের আগামী বছর পাঁচেকে প্রায় ৩০ কোটি ঘন ফুট পাথরকুচির দরকার হবে যার দাম ৭২ কোটি টাকা। বীরভূম জেলার শিউড়ি শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে মহম্মদবাজার ব্লকে কাল পাথরের যে সঞ্চয় আছে তা যদি কাজে লাগান হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের এই চাহিদা তার নিজের সম্পদ থেকে সহজেই মিটে যেতে পারে।

শিউড়িতে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার সাম্প্রতিক অধিবেশনের সময় বীরভূম জেলার দ্বিতীয় যে আর একটি খনিজ পদার্থকে কাজে লাগাবার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে "চায়না ক্লে" বা খড়িমাটি। ঐ জেলার মহম্মদবাজার ব্লক, রামপুরহাট ব্লক ও নলহাটি ব্লকে খড়িমাটি পাওয়া যায়। (বাঁকুড়া জেলার মেজিয়াতেও খড়িমাটি আছে।) পশ্চিবঙ্গে এই খনিজের চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। চাহিদা যে জায়গায় দেড় লাখ টন সে জায়গায় পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে মাত্র ১৬ হাজার টন। রাজ্যের নিজস্ব পোর্সিলেন শিল্পের চাহিদা পূরণ করতেই সুদূর গুজরাট ও কেরল থেকে খড়িমাটি আমদানি করতে হয়। রবার, কাগজ, চামড়া, সুতি কাপড়, কীটনাশক ইত্যাদি শিল্পেও খড়িমাটি ব্যবহার করা হয়। টেকনো-ইকনমিক সার্ভে রিপোর্টের সুপারিশ হচ্ছে, বৈদ্যুতিক ইনসুলেটর, ল্যাবরেটরিতে ব্যবহারের উপযোগী

পাত্র, বৈয়ম প্রভৃতি তৈরির জন্য পশ্চিমবঙ্গের চীনা মাটি কাজে লাগান যায়।

বাড়ি তৈরির অন্যান্য মাল-মশলার মত পশ্চিমবঙ্গে সিমেন্টেরও খুব অভাব। এই সিমেন্ট তৈরির একটা উপকরণ হল চুণাপাথর বা লাইমস্টোন। পুরুলিয়া জেলার ঝালদা অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে চুণাপাথরের অস্তিত্বের কথা জানা আছে। পশ্চিমবঙ্গের খনি বিভাগ যে অনুসন্ধান করেছেন তাতে এই পাথরের কিছু সঞ্চয়ের খবর পাওয়া গেছে। ভারতের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগ একটি এলাকায় নিবিড়ভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে প্রায় ৩০ লাখ টন চুণাপাথরের খোঁজ পেয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খনিবিষয়ক উপদেষ্টা সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে অবশ্য এই চুণাপাথর ব্যবহারে একটি অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের এই চুণাপাথরে সিলিকা ও অন্যান্য খাদের পরিমাণ খুব বেশি। স্বল্প ব্যয়ে এই খাদ দূর করার কোন পদ্ধতি যদি বার করা যায় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের লাইমস্টোন দিয়ে সিমেন্ট কারখানা চালু করা যেতে পারে। এখন পশ্চিমবঙ্গে একটিও সিমেন্টের কারখানা নেই।

একথা অনেকেই জানেন যে, হরিণঘাটার দুধ যোগাবার জন্য যে কাঁচের বোতল দরকার হয় সেটা পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হয় না। অথচ দশ বছর আগেকার টেকনো-ইকনমিক সার্ভে রিপোর্টে বলা হয়েছে, শিউড়ির কাছে যে স্যান্ডস্টোন পাওয়া যায় তার মধ্যে কাঁচ তৈরির উপযুক্ত বালির সন্ধানও পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া রঘুনাথপুরে যে ভাল জাতের কোয়ার্টজ রয়েছে তার ভিত্তিতেও কাঁচ শিল্প গড়ে তোলা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে যে এক সময়ে প্রচুর পরিমাণে আকরিক লোহা আহরণ করা হয়েছে তার বহু প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। রাণীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলে এই লোহা কাজে লাগান হয়েছে। লোহা গলিয়ে ঐ অঞ্চলে যেসব গাদ ফেলে রাখা হয়েছে সেগুলি এখনও সেখানে স্তূপীকৃত হয়ে আছে। বরাকর আয়রন ওয়ার্কস ও কুলটির আয়রন অ্যান্ড স্টিল ওয়ার্কসে এক সময়ে রাণীগঞ্জ অঞ্চলের এই আকরিক লোহা ব্যবহার করা হয়েছে। এখন অবশ্য আর হয় না। তার কারণ এই নয় যে, পশ্চিমবঙ্গের সেই আকরিক লোহার সঞ্চয় ফুরিয়ে গেছে অথবা ঐ আকরিক লোহা নিকৃষ্ট ধরনের (আসলে, রাণীগঞ্জের লোহা পাথরে লোহার ভাগ নাকি ইংল্যান্ডের সাধারণ লোহা পাথরের তুলনায় বেশি)। রাণীগঞ্জের লোহাপাথরের ব্যবহার কালক্রমে বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রকৃত কারণ হল, পরবর্তী কালে সিংভূম-কেওনঝর-বোম্বাই অঞ্চলে অনেকে উৎকৃষ্টতর ধরণের আকরিক লোহার উৎস আবিষ্কৃত হয়েছে।

রাণীগঞ্জ অঞ্চলে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ পাওয়ার সম্ভাবনা নিতান্তই ঘটনার যোগাযোগে নষ্ট হয়ে গেছে। দ্বিতীয় যুদ্ধের আগে সেখানকার ল্যাটারাইট শিলাস্তর থেকে অ্যালুমিনিয়াম আহরণের একটি অল্পব্যয়সাধ্য পদ্ধতি বাতলে দিয়েছিলেন একজন জার্মান বিজ্ঞানী। কিন্তু ঐ পদ্ধতি হাতে কলমে প্রয়োগ করার আর সুযোগ পাওয়া গেল না। কারণ, ইতিমধ্যে যুদ্ধ বেধে গেছে এবং ঐ জার্মান বিজ্ঞানী তৎকালীন বৃটিশ সরকারের হাতে বন্দী হয়েছেন। অথচ, এদিকে ঐ বিশেষ পদ্ধতির ভরসায় জে কে নগরের অ্যালুমিনিয়াম কারখানা প্রতিষ্ঠার কাজ অনেকখানি এগিয়ে আছে। অগত্যা, পশ্চিমবঙ্গের অ্যালুমিনিয়ামের ভরসা ছেড়ে অন্য জায়গা থেকে আমদানি করা অ্যালুমিনিয়ামের ভিত্তিতেই ঐ কারখানা চালু করতে হল।

পশ্চিমবঙ্গের খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে একটি সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হল ম্যাঙ্গানিজ। মেদিনীপুর জেলায় বেলপাহাড়ির কাছে এই খনিজ পদার্থ আবিস্কৃত হয়েছে। তবে, ঐ ম্যাঙ্গানিজের উপযুক্ত ব্যবহার নির্ভর করছে রেল ও সড়ক যোগাযোগের উন্নতির উপর। টেকনো-ইকনমিক সার্ভে রিপোর্টের সুপারিশ হচ্ছে, ড্রাই সেল ব্যাটারিতে যে ম্যাঙ্গানিজ

ডায়োক্সাইড ব্যবহার করা হয় সেটা তৈরি করার জন্য পশ্চিম-বঙ্গের ম্যাঙ্গানিজকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতে হবে।

ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে বিশেষ ধরনের হাতিয়ার তৈরি করার জন্য টাংস্টেন কার্বাইড নামে একটি জিনিসের দরকার হয়। এটি পাওয়া যায় উলফ্রাম নামক খনিজ পদার্থ থেকে। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত শিল্পে এর বিশেষ চাহিদা আছে। এর দামও খুব বেশি—টন প্রতি ৩০ হাজার টাকার মত। ভারতবর্ষে উলফ্রামের উৎপাদন খুবই সামান্য। পাওয়া যায় রাজস্থানে এবং বাঁকুড়া জেলার ঝিলিমিলি অঞ্চলে।

ভারতবর্ষে তামার ঘাটতি খুব বেশি, একথা সকলেই জানেন। স্বভাবতই তামার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জোরদার সন্ধান চালান হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেলায় পুরান তামার খনির কিছু আভাস পাওয়া গেছে। কোন কোন জায়গার নামও পুরান তামার খনির স্মৃতি বহন করছে। এরকম একটি জায়গা হল পুরুলিয়া জেলার তামাখান। পশ্চিমবঙ্গের খনি বিভাগ এবং পরে ভারতের ভূতত্ত্ব সমীক্ষা ঐ গ্রামে তামার সন্ধানে মাটি খুঁড়েছেন। অনুসন্ধানে ১৮ ফুট চওড়া একটি তামার স্তরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। এই স্তরে তামার ভাগ দুই শতাংশের বেশি।

উত্তরবঙ্গের জয়ন্তি অঞ্চলে ভাল জাতের প্রচুর পরিমাণ ডলোমাইট আছে। এই ডলোমাইট ইস্পাত কারখানায় দরকার হয়। কিন্তু ইস্পাত কারখানাগুলি যে অঞ্চলে অবস্থিত সেখানে আনতে হলে এই ডলোমাইটের দরুন যে পরিমাণ রেলভাড়া দিতে হবে তাতে খরচে পোষাবে না। শুধু সেই কারণেই জয়ন্তি অঞ্চলের ডলোমাইট পুরোপুরি কাজে লাগান যাচ্ছে না।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গে অনেক অনুসন্ধান চালিয়েও এখন পর্যন্ত সাফল্য অর্জন করা যায়নি। সেটি হচ্ছে তেল। ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে দেখতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের মাটির তলায়, বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চলে, তেল পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। এর আগে আমেরিকার ষ্টানভ্যাক কোম্পানি (বর্তমান নাম এসসো) এবং পরে সোভি-য়েট বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় ভারত সরকারের তেল ও প্রাকৃ-তিক গ্যাস কমিশন অনুসন্ধান চালিয়েছেন। এখন পর্যন্ত সাফল্য লাভ করা যায়নি। কিন্তু ১৬৫০০ ফুট পর্যন্ত গভীর তৈলকূপ খনন করার উপযুক্ত যন্ত্র বসিয়ে অনুসন্ধান করলে সাফল্য লাভ করা যেতে পারে, এমন সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল।

বনসম্পদ যে কোন দেশেরই একটা বড় প্রাকৃতিক সম্পদ। বন থেকে আমরা শুধু যে আসবাব পত্র, কাগজ, দিয়শলাই, ভেনেস্তা প্রভৃতি তৈরির কাঠ, ও লাক্ষা, মধু, বাঁশ, আঠা, জ্বালানি, ভেষজ প্রভৃতি পাই তাই নয়, বনভূমিক্ষয় নিবারণ করে, জলসম্পদ সংরক্ষণে সহায়তা করে, আবহাওয়ার তীব্রতা হ্রাস করে এবং মানুষকে আদিম প্রকৃতির ও বন্য প্রাণীর সান্নিধ্যে নিয়ে গিয়ে তার বৈজ্ঞানিক ও আত্মিক কৌতুহল চরিতার্থ করে।

বনসম্পদে পশ্চিমবঙ্গ যে খুব সমৃদ্ধ তা অবশ্য বলা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের জন্য মাথাপিছু বনাঞ্চলের গড় পরিমাণ হল ১১ শতক (প্রায় সাড়ে ছয় কাঠা)। সারা ভারতে এই গড় হল আধ একর অর্থাৎ প্রায় দেড় বিঘা। আমাদের জাতীয় বননীতিতে বলা হয়েছে, পাহাড় অঞ্চলে ৬০ শতাংশ এবং সমতলে ২০ শতাংশ জমিতে বন থাকা উচিত। সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে এই দুটি হার হচ্ছে—পাহাড়ে ২০·১ শতাংশ ও সমতলে ১১·৫ শতাংশ।

পশ্চিমবঙ্গের বন আছে তিনটি অঞ্চলে, বলতে গেলে, তিনটি প্রান্তে—উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে। এই তিনটি অঞ্চলই আয়তনে প্রায় সমান—১২০০ থেকে ১৭০০ বর্গমাইল। পশ্চিম-বঙ্গের ছয়টি জেলায় বন বলতে কিছুই নেই।

রাজ্যের তিনটি বনাঞ্চল আয়তনে প্রায় সমান হলেও তিন-

টিই সমান মূল্যবান নয়। শতখানেক বছর আগে উত্তরবঙ্গে যে সেগুন গাছের আবাদ শুরু করা হয়েছিল প্রধানত এখন তারই দৌলতে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির বনাঞ্চল থেকে একর পিছু গড়ে ১৫/১৬ টাকার মত আয় হয়। রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে, প্রায় ফরাক্কার কাছ থেকে সুবর্ণরেখা পর্যন্ত, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান ও বীরভূম জেলা জুড়ে রয়েছে প্রধানত শালের জঙ্গল আর তার সঙ্গে মেশান কিছু পিয়াশাল, মহুয়া ও অন্যান্য গাছ। এসব গাছের কোনটিই করাতে চিরবার মত নয়। এইসব গাছের মূল্য প্রধানত জ্বালানি হিসাবে। তাছাড়া খুঁটি বানাবার জন্যও শাল গাছের চাহিদা আছে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদও এখন যথেষ্ট পরিমাণ কংক্রিটের খুঁটির অভাবে শালের খুঁটি ব্যবহার করছেন। স্বভাবতই বনসম্পদের দিক থেকে পশ্চিমের বনাঞ্চলের মূল্য উত্তরের বনাঞ্চলের তুলনায় কম। উত্তর অঞ্চলের বন থেকে যেখানে প্রতি বছর একর পিছু গড় আয় হয় ১৫/১৬ টাকা সেখানে পশ্চিম অঞ্চলের বন থেকে আয় হয় ৮/৯ টাকা। দক্ষিণের, অর্থাৎ সুন্দরবনের, বনাঞ্চলের প্রধান প্রধান গাছ হল গরান, গেওঁয়া, বায়েন, সুন্দরী, গোলপাতা, হেন্তাল প্রভৃতি। এই জঙ্গল থেকে আমাদের লভ্য শুধু জ্বলানি, গোলপাতা ও মধু। এই অঞ্চলের বন থেকে একর পিছু বাৎসরিক গড় আয়ের পরিমাণ দু টাকারও কম।

পশ্চিমবঙ্গের বনসম্পদ উন্নয়ন ও ঐ বনসম্পদকে কাজে লাগাবার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথম কাজই হচ্ছে অবশ্য বনসংরক্ষণ ও বনসৃজন। রাজ্যে যেটুকু বন আছে সেটুকুও যাতে লোকবসতির চাপে ও অবৈধ ব্যবহারে নষ্ট না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। বনাঞ্চলগুলিতে পরিকল্পনা অনুসারে পুরানো গাছ কাটার ও নতুন গাছ লাগাবার কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তাছাড়া, যেখানেই গাছ লাগাবার মত ফাঁকা জায়গা পাওয়া যাবে সেখানেই সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে গাছ লাগাবার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

বনাঞ্চলে, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ী এলাকার বনগুলিতে, ভাল রাস্তাঘাট তৈরি করলে এ অঞ্চলের বনসম্পদ আরও ভাল ভাবে আহরণ করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে চারটি কাগজের কল আছে। এই কাগজের কলগুলিতে মণ্ড তৈরি করার জন্য বিপুল পরিমাণ বাঁশ ও অন্যান্য কাঠের চাহিদা রয়েছে। এই চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। এখন পর্যন্ত প্রধানত বিহার, ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশ থেকে আমদানি করে এই চাহিদা মেটান হচ্ছে। কিন্তু ক্রমশই এটা কঠিন হয়ে উঠছে। কারণ, ঐ সব রাজ্য নিজেদের কাগজের কলগুলির চাহিদা আগে মেটাবার নীতি গ্রহণ করছে। সুতরাং, ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে পশ্চিমবঙ্গে কাগজের মণ্ড তৈরির উপযুক্ত বাঁশ ও ইউ-ক্যালিপ্টাস জাতীয় গাছের আবাদ বাড়াবার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। সামান্য শালের খুঁটির জন্যও এখন আমরা ক্রমেই বেশি করে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছি। সুতরাং শালের জঙ্গলও বাড়ান দরকার।

গোয়ালিয়রের কারখানায় প্রমাণ হয়ে গেছে যে, কাঁটা বা বেউড় বাঁশ থেকে রেয়ন তৈরি করা যায়। পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের বাঁশের ব্যাপক চাষ করে রেয়ন শিল্পের ভিত্তি তৈরি করার সুযোগ আছে।

চামড়া ট্যান করার জন্য যে ট্যানিন লাগে সেটি আসে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি গাছের ছাল থেকে। পশ্চিমবঙ্গে ঐসব গাছ লাগাবারও ভাল সুযোগ আছে। এখন এইসব গাছের ছাল প্রধানত আফ্রিকা থেকে আমদানি করে আনা হয়।

ইদানীং ঝাউ গাছ থেকেও ট্যানিন পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেছে। বিশেষ করে সমুদ্রের বালুকাময় বেলাভূমির পক্ষে ঝাউ একটি অত্যন্ত প্রয়োজনোপযোগী গাছ। ঝাউ সমুদ্রের বেলাভূমিকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করে, বালিয়াড়ির বিস্তার রোধ করে চাষের জমি বাঁচায় এবং যেসব এলাকার অনুর্বর

মাটিতে অন্য গাছ জন্মায় না বললেই চলে সেসব এলাকার মানুষকে সহজলভ্য জ্বালানি যুগিয়ে দেয়। রাজ্য সরকারের বন বিভাগের চেষ্টায় সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার কাঁথি অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ঝাউ লাগাবার ব্যাপারে উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে বলে প্রকাশ। এটা সুলক্ষণ।

ওপরে পশ্চিমবঙ্গের যে খনিজ ও বনজ সম্পদের কথা বলা হল সেটা এই রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদের একটি অংশ। এই সম্পদ আমাদের সংরক্ষণ করতে হবে, বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজে লাগাতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের সুপরিকল্পিত সমৃদ্ধির জন্যই এটা প্রয়োজন।
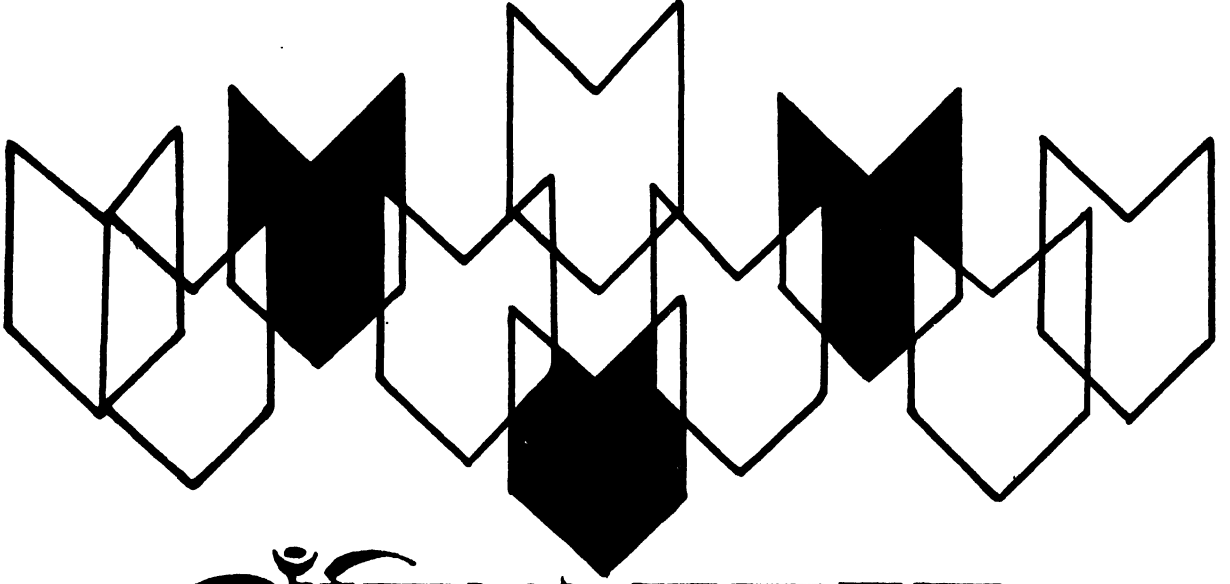
পঁচিশ বছরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে শিক্ষার প্রসার

নিখিলরঞ্জন রায়

'ফসল ফলাতে চাই এক বছরের প্রযত্ন,
ফল ফলাতে দশ বছর,
মানুষ গড়তে চাই একশো বছর।'

—প্রাচীন চীনা প্রবাদ

উনিশশ সাতচল্লিশের অগস্ট মাস। স্বাধীনতার পথে জাতির নতুন পরিক্রমা সুরু হয়েছিল সেদিন। দীর্ঘ পরদেশী শাসনের অশুভ পরিণাম, বিয়াল্লিশের মনুষ্য-সৃষ্ট ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আর সর্বোপরি উগ্র সাম্প্রদায়িকতা প্রসূত দেশ-বিভাগ—এতগুলি বিষম সংকটের গুরুভার বহন করতে হয়েছিল নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে।

দেশ বিভাগ জনিত পরিস্থিতি

দেশ বিভাগের অনিবার্য পরিণাম—অসংখ্য মানুষের বাস্তু-ত্যাগ এবং পূর্ববঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের পশ্চিম-বঙ্গে আগমন। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর চাপে পশ্চিমবঙ্গের অর্থ-

নীতি যেমন বিপন্ন হয়েছিল তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছিল নানা কঠিন সমস্যা। রাজ্যের বহুস্থানে এবং বিশেষ করে কলকাতার আশে পাশে অনেকগুলি জনবহুল উদ্বাস্তু উপনিবেশ গড়ে উঠল। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু সন্তান-সন্ততির শিক্ষা-ব্যবস্থার ভার নিলেন সরকার। একদিকে ত্রাণ ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তর এবং অপর দিকে রাজ্যের শিক্ষা-বিভাগ নূতন নূতন বিদ্যালয় স্থাপন ও পুরনো বিদ্যালয় সমূহের সম্প্রসারণে উদ্যোগী হলেন। সরকারী অনুদানে বহু উদ্বাস্তু বিদ্যালয় (যথা স্পেশাল-কাডার স্কুল, ডিস্‌পারসেল কলেজ ইত্যাদি) স্থাপিত হল। পূর্ববঙ্গাগত কয়েক হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করতে হল সঙ্গে সঙ্গে।

সার্বিক শিক্ষা-পরিস্থিতি

তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-পরিস্থিতি যে খুব আশা-ব্যঞ্জক ছিল তা বলা চলে না। বরঞ্চ এর বিপরীতটাই ছিল বহুলাংশে সত্য। আনুমানিক আড়াই কোটি জনসমষ্টির প্রায় তিন-চতুর্থাংশই ছিল অক্ষরজ্ঞানহীন। এই বিপুল নিরক্ষর জন-সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের জন্য সর্বজনীন ও অনায়াসলভ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করাই ছিল রাজ্যের অন্যতম প্রধান সমস্যা। বিদেশী শাসকের শিক্ষানীতির পুনর্মূল্যায়ন এবং জাতীয় শিক্ষার সুষ্ঠু নীতি নির্ধারণের আশু প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃতি পেল। সেদিন এ রাজ্যের শিক্ষা-সংস্কার ও সম্প্রসারণের কাজ সূচিত হয়েছিল দুটি মূল্যবান পরিকল্পনাকে অবলম্বন করে। প্রথমটি মহাত্মা গান্ধী পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষা বিষয়ক এবং দ্বিতীয়টি কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা কমিটির যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পুনর্গঠন পরিকল্পনা (নামান্তরে সার্জেণ্ট রিপোর্ট)। বিষয় ও পন্থাগত কিছু পার্থক্য থাকলেও উক্ত পরিকল্পনা দুটির মধ্যে উদ্দেশ্য ও নীতির আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। রাজ্য সরকার পরিকল্পনা দুটির মৌলিক নীতির ভিত্তিতেই শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উৎকর্ষ সাধনে তৎপর হলেন। এই বিপুল কর্মানুষ্ঠানের প্রথম ও প্রধান চিন্তাই অর্থচিন্তা। সার্জেণ্ট রিপোর্ট সুপারিশ করল যে, যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার তুল্যজ্ঞানে শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত অর্থসংস্থান আবশ্যক। গান্ধীজী শিক্ষাকে স্বয়ম্ভর করবার জন্য নূতন পন্থার ইঙ্গিত দিলেন তাঁর "নঈ তালিম" পরিকল্পনায়। অর্থাৎ শিক্ষার আবশ্যিকতার উপর উভয় পরিকল্পনাই সম গুরুত্ব আরোপ করল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৪ সনে ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত শিক্ষা-আইন বিধিবদ্ধ হবার পূর্বে প্রকাশিত সংসদীয় শ্বেত পত্রে বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে, জন-সাধারণের শিক্ষাই জাতির ভবিষ্যৎ পুনর্গঠনের একমাত্র উপায়। এই গুরুত্বপূর্ণ উক্তির পূর্ণ স্বীকৃতি পাওয়া যায় ইংলণ্ডের তৎকালীন দুঃসাহসিক শিক্ষা-পরিকল্পনায়। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের বিরাট ব্যয়ভার আর অপরিমিত ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি নিয়েও শিক্ষা পুনর্গঠনের জন্য প্রাক্‌যুদ্ধ ব্যয়বরাদ্দ প্রায় দশগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকার। জাতির শিক্ষা চাহিদার গুরুত্ব সম্যক্ উপলব্ধ হলে আর্থিক অভাব কোন অজুহাত বা অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে না।

শিশু-লালন ও শিক্ষা

শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রারম্ভিক ধাপ শিশু-লালন বা নার্সারি শিক্ষা। কলকাতা ও শহরাঞ্চলের অভিজাত শ্রেণীর সন্তান-সন্ততির জন্য খৃষ্টান মিশনারীরা কিছু সংখ্যক নার্সারি ও কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয় পূর্ব থেকেই চালিয়ে আসছিলেন। কিন্তু এ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল নগণ্য, এবং স্বাধীনতার পূর্বে সরকারী স্বীকৃতি বা আর্থিক দাক্ষিণ্য এদের ভাগ্যে জুটত কদাচিৎ। গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনায় প্রাক্-বুনিয়াদী অর্থাৎ ৩—৬ বৎসর বয়স্ক শিশুর শিক্ষার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। নব নব অভিজ্ঞতা অর্জন, সু-অভ্যাস গঠন ও সদাচরণের মাধ্যমে চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনই শিশু-লালন ও শিক্ষার উদ্দেশ্য।

নঈ তালিম আদর্শানুযায়ী প্রাক্-বুনিয়াদী বিদ্যালয় এবং কিণ্ডারগার্টেন ও মন্তেসরী-পদ্ধতির শিশু-বিদ্যালয়ের

সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। সরকার এগিয়ে এলেন এইসব প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকল্পে। সরকারী অনুদানে নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হল। অনেক ক্ষেত্রে সরকার নিজের হাতে পরিচালনার দায়িত্বও গ্রহণ করলেন। নিম্নোদ্ধৃত পরিসংখ্যান থেকে পশ্চিমবঙ্গে শিশু-শিক্ষা প্রসারের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়ঃ—

বৎসর	নানাবিধ শিশুবিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্র-সংখ্যা	মোট ব্যয়
১৯৫০-৫১	১২.	১,৬৭৩.	১,০৯,৫১০
১৯৬৩-৬৪	১৪৯	৭,৫৬৪	৬,৭৪,০৫৪

পরিসংখ্যানের মূল্য ও মাহাত্ম্য যাই হোক না কেন, এই শিশু-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-ব্যবস্থায় এক অভিনব সংযোজনই নয়, রাজ্যের ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের পরিপ্রেক্ষিতে এক প্রয়োজনীয় অবদান।

প্রাথমিক শিক্ষা

সাধারণতন্ত্রী ভারতের সংবিধানে ৬-১৪ বৎসর বয়সের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের আবশ্যিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হয়েছে। ৬-১৪ বৎসর বয়স্কদের শিক্ষা অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাই জাতীয় শিক্ষার প্রকৃত বনিয়াদ। মহামতি গোখলে থেকে মাহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত সব দেশহিতাকাঙ্ক্ষী নেতাই প্রাথমিক শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মহাত্মাজী পরিকল্পিত নঈ তালিম অর্থাৎ বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থা জুনিয়র এবং সিনিয়র দুই স্তরে বিভক্ত, এবং ছয় থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়স্কদের জন্য এই ব্যবস্থা। বুনিয়াদী শিক্ষা স্বাধীন ভারতের শিক্ষানীতি রূপে গৃহীত হলেও দেশের যাবতীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে আজও পর্যন্ত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত করা সম্ভব হয় নি। তবে নূতন নূতন বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন এবং পুরনো ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রূপান্তরও ঘটেছে প্রচুর। আজকাল গ্রামে গ্রামে সুদৃশ্য বিদ্যালয়-গৃহ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বেশি দিন আগেব কথা নয় পল্লীঅঞ্চলে পাঠশালা ঘরটাই ছিল সব চেয়ে নিকৃষ্ট ও দীনহীন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দৌলতে বহু বুনিয়াদী বিদ্যালয়-গৃহের দর্শনীয় সৌষ্ঠব ও সম্প্রসারণ সাধিত হয়েছে। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক/বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি নিম্নে প্রদর্শিত হলঃ—

বৎসর	প্রাথমিক/নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা	সর্বস্তরে প্রাথমিক ছাত্র-সংখ্যা	শিক্ষকের সংখ্যা
১৯৫০-৫১	১৪,৭৮৩	১৬,৩৩৭৮৭	৪৩,১৯২
১৯৬৩-৬৪	৩২,৪৩৮	৩৬,০৭৮০২	৯৮,২৬০

বৎসর	প্রাথমিক/নিম্নবুনিয়াদী খাতে সরকারী/বেসরকারী খরচের পরিমাণ
১৯৫০-৫১	১,৮৫,১৭,৪৩১ টাকা
১৯৬৩-৬৪	১০,৪৪,৩৬,৮৪৭ টাকা

চিন্তন-মনন শক্তি উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সৃজনাত্মক শক্তির পরিপোষণ দ্বারাই মানুষের শিক্ষা সুষম ও সার্থক হতে পারে। শিশুর সুষম শিক্ষাই বুনিয়াদী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। শিক্ষার্থীর চরিত্র-গঠনে ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সাধনে এবং গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অবদান সর্বজনস্বীকৃত।

বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনাকে যথাযথ রূপদানের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথমেই বিশেষ শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সাহায্যে গড়ে তুললেন বাণীপুরের বুনিয়াদী শিক্ষণ-কেন্দ্র। জুনিয়র, সিনিয়র এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল এবং এখানে নানা স্তরের বুনিয়াদী শিক্ষক, বিদ্যালয়-পরিদর্শক এবং শিক্ষা-প্রশাসক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গের পল্লীঅঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যতঃ অবৈ-

তনিক এবং আবশ্যিক। শিক্ষাবিভাগের একটা হিসাব অনুযায়ী ১৯৬৩-৬৪ সনে ৬-১১ বৎসর বয়স্ক, অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা লাভের যোগ্য ছেলেমেয়ের সংখ্যা ছিল ৩৭,০৭,৬৪৪। তার মধ্যে ৩৬,০৭,৮২০ জন ছিল স্কুলগামী।

মাধ্যমিক শিক্ষা

তারাচাঁদ কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ স্কুল এডুকেশন কমিটি (১৯৪৮) (নামান্তরে রায়চৌধুরী কমিটি) এবং মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশনের (মুদালিয়র কমিশন) সুচিন্তিত সুপারিশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ সংস্কার সাধিত হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের ভার কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হাত থেকে তুলে নিয়ে নবগঠিত স্বয়ংশাসিত মধ্য শিক্ষা পর্ষদের হাতে অর্পণ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশক্রমে দশশ্রেণীর উচ্চবিদ্যালয়গুলিকে এগার শ্রেণীতে উন্নয়ন এবং নবম শ্রেণী থেকেই ছাত্রের স্বাভাবিক ঝোঁক বা প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রেখে মানব-বিদ্যা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, বাণিজ্য বিদ্যা, কৃষি বিদ্যা ইত্যাদির যে কোন একটি ধারায় তার পড়াশুনার সুযোগ করে দেওয়া এই নূতন ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর্থিক কারণে রাজ্যের দশ-শ্রেণীর সব বিদ্যালয়-গুলিকেই এগার শ্রেণীর বিদ্যালয়ে উন্নীত করা সম্ভব না হলেও এ বিষয়ে অগ্রগতির পরিমাণ অনুল্লেখ্য নয়। নিম্নে প্রদত্ত খতিয়ান থেকে পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা-প্রসারের পরিষ্কার আভাস পাওয়া যায়ঃ

বৎসর	উচ্চ/উচ্চতর মাঃ বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্র-সংখ্যা	সর্বস্তরে মাধ্যমিক শিক্ষক-সংখ্যা	সরকারী-বেসরকারী মোট ব্যয় (টাকা)
১৯৪৮ ৪৯	৮৫৮	৩,৮৬,৯৭২	—	—
১৯৫০-৫১	১১০৭	৩,৯৩,২৫১	২১,৪৯৬	২,৭৬,৮৫,৬৩৮
১৯৬৩-৬৪	২৫০৪	১০,৬৫,৩৮৬	৫৪,১৫১	১২,০৭,৫৩,৬৯৪

এ-ছাড়া আছে মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায়ভুক্ত জুনিয়র হাই এবং উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং পাঠরত ছাত্র-সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নপ্রদত্ত পরিসংখ্যান অগ্রগতিরই পরিচায়কঃ—

বৎসর	বিদ্যালয়ের সংখ্যা		ছাত্র-সংখ্যা
১৯৫০-৫১	জুনিয়র হাই, মিড্‌ল এবং উচ্চ বুনিয়াদী	১২৬১	১,৩৯,২১৬
১৯৬৩-৬৪	„	২৪৯১	২,৭৭,৯৯৩

উচ্চ শিক্ষা

বাংলাদেশ তথা ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে আধুনিক উচ্চ শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল ১৮৫৭ সনে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে।

তদবধি বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার প্রসার জাতীয় প্রগতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান জুগিয়ে আসছে। দেশ বিভাগের ফলে বাংলাদেশের বহু কলেজই পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়ে। কিন্তু পূর্ববঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা আগমনে এবং সরকারী-বেসরকারী যৌথ উদ্যমের ফলে পশ্চিমবঙ্গে কলে-জের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪৮ সনে পশ্চিমবঙ্গে কলেজের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৫। সে ক্ষেত্রে বর্তমানে এক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই আছে দুই শতাধিক কলেজ, তা ছাড়া উত্তরবঙ্গ বর্ধমান ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ, সমূহ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এখন অন্যূন ২৫০টি কলেজ আছে। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও বেড়েছে। বিশ্বভারতী, যাদবপুর, বর্ধমান, কল্যাণী, উত্তরবঙ্গ ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা আলোচ্য সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কোঠারী কমিশনের রিপোর্টে উচ্চশিক্ষার যে সর্বভারতীয় সমীক্ষা প্রদত্ত হয়েছে তাতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থান রাজধানী দিল্লী রাজ্যের পরেই। সর্বভারতীয় সমীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষার প্রসারে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। এ রাজ্যের লোক সংখ্যার প্রতি দশ লক্ষে প্রায় চার হাজার ছ'শ জন

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। খাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বর্তমানে প্রায় দুই লক্ষ সাত হাজার। সারা ভারতের উচ্চ-শিক্ষার্থী মোট ছাত্র-সংখ্যার ১২ শতাংশ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র।

পরিসংখ্যানই শিক্ষার প্রকৃত অগ্রগতির পরিমাপক হতে পারে না। নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট অব হায়ার স্টাডিজ, গবেষণাগার ও কলেজ ইত্যাদি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে নব নব ফ্যাকাল্টি এবং নূতন নূতন বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার বহুবিধ সুযোগেরও সৃষ্টি হয়েছে। স্বাধীনতার উত্তর কালে পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ শিক্ষার ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত আছে।

প্রযুক্তি, কারিগরী ও বৃত্তিশিক্ষা

প্রযুক্তি বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার প্রসার ঘটেছে বহুল পরিমাণে। টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট, ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী কলেজ, কৃষি মহাবিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, পশুচিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ রাজ্যের ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

তা ছাড়া চর্মশিল্প, বয়নশিল্প, সেরামিক শিল্প ও পাট-শিল্প ইত্যাদির প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ সুবিধাও বহুগুণে বেড়েছে গত পঁচিশ বছরের মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-শিল্প ভিত্তিক অর্থনীতির স্বার্থে শিল্প-কারিগরী-বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার অপরিহার্য। উচ্চ পর্যায়ের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে ২৪টি পলিটেকনিকে এল, সি, ই, এল, এম, ই; এল, ই, ই এবং ড্রাফটসম্যানশীপ কোর্স প্রচলিত আছে। আর এক শ্রেণীর প্রযুক্তি বিদ্যালয় হচ্ছে ১৯টি টেকনিক্যাল স্কুল এবং নানা ধরনের কুটির-শিল্প শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। বিকলাঙ্গদের বৃত্তি-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা পাঁচটি। এই তথ্যাদি পশ্চিমবঙ্গে বৃত্তি-শিক্ষার প্রসারের নিঃসন্দেহ প্রমাণ।

স্ত্রী-শিক্ষা

ভারতীয় সংবিধানে সর্বক্ষেত্রেই স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত। স্বাধীনতার উত্তর কালে সামাজিক সংস্কার, অথবা রক্ষণশীলতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। অর্থনৈতিক জীবন ক্রমশই হয়ে উঠেছে কঠোর ও জটিল। ঘনায়মান অর্থ-নৈতিক সংকটে আজ বহু মহিলা অন্দরমহল ছেড়ে রুজিরোজ-গারের পথে নেমেছেন এবং অনেক স্থলে তাঁরা হয়েছেন পুরুষের প্রতিযোগিনী। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারকল্পে গ্রামাঞ্চলে ১ম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজে ছাড়াও, মেয়েরা আজ ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় শিল্প-শিক্ষালয়, মেডিক্যাল কলেজ, শুশ্রূষা-বিদ্যালয়, বাণিজ্য-বিদ্যালয়, চারুকলা প্রতিষ্ঠান ও নানা ধরনের নৃত্যগীত-অভিনয় বিদ্যায়তনে যোগদান করছে। বিংশ শতকের প্রারম্ভে যেখানে সারা দেশে প্রাথমিক স্তরে প্রতি একশ বালকের অনুপাতে বালিকার সংখ্যা ছিল মাত্র ১২জন, এবং মাধ্যমিক স্তরে মাত্র ৪জন, সেক্ষেত্রে ১৯৬৫ সনে বালিকা শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রতি একশ'তে যথাক্রমে ৫৫ ও ২৬। নিঃসংশয়ে একে অগ্রগতিসূচক বলা চলে।

জনশিক্ষা

স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যতই বাড়ুক দেশের সমগ্র জনসমষ্টির অনুপাতে তা এখনও খুব আশাপ্রদ নয়। স্কুল-কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের বাইরে রয়েছে এক বিপুল শিক্ষা-বঞ্চিত জনসমষ্টি, এই বিপুল জন-সমষ্টির বেশির ভাগই অক্ষরজ্ঞানহীন। নিরক্ষরতা আজও দেশের এক বিরাট ও জটিল সমস্যা। ১৯৪৮ সনেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই গুরুতর সমস্যাটির দিকে নজর দিলেন। সরকার নিযুক্ত করলেন Adult Education Committee। এই কমিটির সুচিন্তিত সুপারিশগুলি সরকার অনুমোদন করলেন এবং তদনুযায়ী একটা কার্যকর কর্মপন্থাও গৃহীত হল। নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা, নব্যসাক্ষরদের ব্যবহারোপযোগী সাহিত্য-রচনা, নূতন নূতন পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা এবং লোকরঞ্জন

অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে সমাজ-শিক্ষা আন্দোলনকে রূপায়িত করার নানা প্রয়াস চলতে থাকে। শিক্ষা এবং সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে ও অনুদানে বয়স্কদের শিক্ষার প্রসারকল্পে বহু নৈশ বিদ্যালয়, মহিলা সমিতি ও গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। সরকারী প্রচেষ্টা ও অর্থানুকূল্যে স্থাপিত হয়েছে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জিলা গ্রন্থাগার, মহকুমা ও শহর গ্রন্থাগার এবং আঞ্চলিক গ্রামীণ গ্রন্থাগার। এইসব গ্রন্থাগারে সংগৃহীত বই-পুস্তক এবং পাঠকের সংখ্যা যুগপৎ বৃদ্ধি পাচ্ছে। একদিকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং অন্যদিকে নানা শিক্ষণ-মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সমাজ-চেতনা এবং নাগরিকতাবোধ জাগিয়ে তোলাই সমাজ-শিক্ষা কর্মসূচির উদ্দেশ্য।

সমাজ শিক্ষার অগ্রগতি

বৎসর	বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র	শিক্ষার্থী সংখ্যা	সাক্ষরীকৃত
১৯৫০-৫১	৮০২	৩৫,৯৪৪	১৬,৩৯৫
১৯৬৩-৬৪	৪৪৫১	১,৮৮,৪২১	৬৩,৬৪৭

পাবলিক লাইব্রেরি

বৎসর	সাহায্যপ্রাপ্ত লাইব্রেরি	সংগৃহীত পুস্তক	পঠিত পুস্তক	পাঠক-সংখ্যা
১৯৫০-৫১	—	—	—	—
১৯৫৭-৫৮	৮৭৫	৬,৩৪,০৯৩	১৬,২৪,৬৭৬	১৮,৯,৮৬৭
১৯৬৩-৬৪	১৯২০	২৯,২২,৪৩৯	৪১,৬২,২৭৮	৩,৬৭,২৬৭

উপরোক্ত পরিসংখ্যানে রাজ্য কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির হিসাব ধরা হয়নি। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ বাঙালী ঐতিহ্যের বড় সম্পদ। সমাজ শিক্ষার কর্মসূচি এবং লাইব্রেরি সংগঠনের মাধ্যমে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঞ্জীবনী ধারা জনসাধারণ্যে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে।

শেষ কথা

সেদিন বিধানসভায় চলতি ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বৎসরের জন্য শিক্ষাখাতে ৭৮,৩৯,০০,০০০ টাকার ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর হল। শিক্ষামন্ত্রী সখেদে বললেন যে, অর্থের অপ্রতুলতাই পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার আশানুরূপ বিস্তার ও সংস্কারের প্রধান অন্তরায়। এ রাজ্যের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে চারকোটি। শিক্ষার দরুণ গড়ে মাথাপিছু ব্যয় মাত্র সতের টাকা। অর্থের অঙ্ক যে প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয় তা বলাই বাহুল্য। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় যে, স্বাধীনতা লাভের পূর্বে অবিভক্ত বাংলার প্রায় সাতকোটি মানুষের শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারী ব্যয়-বরাদ্দ ছিল অনধিক মাত্র চার কোটি টাকা, অর্থাৎ মাথাপিছু কমবেশী আট আনা। রাজ্য সরকারের মোট ব্যয়-বরাদ্দের অনুপাতে শিক্ষা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমশই বাড়ছে। একটা সরকারী হিসাবের আংশিক উদ্ধৃতি থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়ঃ—

বৎসর	রাজস্বখাতে মোট খরচ	শিক্ষাখাতে খরচ	শতাংশ
১৯৫৭-৫৮	৭১,১৯,০০,০০০	১২,০৭,০০,০০০	১৭·০৯
১৯৬৩ ৬৪	১,১৭,২৫,০০,০০০	২৪,৫৯,০০০০০	২০·৯৭

প্রায়-শূন্যতা থেকে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, বিগত পঁচিশ বছরের পরিক্রমায় তার আরব্ধ সাফল্য ও সার্থকতা আজ বিতর্কাতীত। চক্রবৃদ্ধিহারে বর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলা যে কোন পরিকল্পনার পক্ষেই দুঃসাধ্য। এই অনিবার্য সত্যকে মেনে নিয়েই আজ সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে রাজ্যের হিমালয়-প্রমাণ শিক্ষা-সমস্যার সমাধানে দৃঢ়-পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হবে। তাই —

"ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা-ভরা আহ্লাদে।
বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙালী ধাতার আশীর্বাদে॥"

শান্তি কুমার মিত্র

কৃষি বিপ্লব। যা এক অর্থে আশায় বিপ্লব। প্রত্যাশায় বিপ্লব। রকফেলার ফাউণ্ডেশন ভারতের কৃষি নিয়ে তাঁদের তথ্য সমীক্ষা রিপোর্ট 'সাফল্যের কাহিনীতে যথার্থই বলেছেন, "ভারতে কৃষি বিপ্লব সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে; পর্যাপ্ত জলের সঙ্কুলান রয়েছে, এমন জায়গায় ফসল ফলনের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই 'বিপ্লব' প্রত্যক্ষ। কিন্তু সত্যকারের বিপ্লব যা ঘটেছে তা চাষাবাদের ক্ষেত্রে নয়—ঘটেছে কৃষকদের জীবনে; সে বিপ্লব আশার বিপ্লব।" ১৯৬৯ সালের এ রিপোর্ট। এরপর গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র দিয়ে আরো জল গড়িয়ে গিয়েছে। দিনে দিনে এই পালাবদল স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে। নিঃসন্দেহে কৃষককুলের মানসিকতায় পরিবর্তনের সুস্পষ্ট চিহ্ন। এবং কৃষিতে অগ্রসরমান রাজ্যগুলির এই পংক্তিতে পশ্চিমবঙ্গও দলছুট নয়। তুল্য মূল্য বিচারে ডিগ্রির তফাৎ হতে পারে, এই মাত্র। তবে পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধেও নির্দ্বিধায় এটুকু বলা যায়, চাষ বা কৃষি আজ এ রাজ্যেও শিল্প-বাণিজ্য পর্যায়ে উন্নীত। চাষী আজ লাভালাভ খতিয়ে দেখছেন। অবশ্যই সৌভাগ্যের ভাগ-বাঁটোয়ারা সুসম নয়; জমির পরিমাণ, সংস্থান-সঙ্গতির অনুপাতে তারতম্য বর্তমান। স্বল্প-বিত্ত, মধ্য-বিত্ত, সম্পন্ন চাষীর বোল-বোলাও এক হতে পারে না। তাহলেও বলতে পারি, পশ্চিমবঙ্গের কৃষক ক্রমেই সেই টিঁকে থাকার, কায়ক্লেশে দিন গুজরানের দিন পেরিয়ে আসছেন। 'পেরিয়ে এসেছেন', এক নিঃশ্বাসে বলতে পারলে খুশিই হতাম; বলতে পারছি না এই কারণেই

যে, সেচ সংস্থান এ রাজ্যে এখনো যথেষ্ট মন্থর। না হলে 'যেখানে জল সেখানে চাষ', এই বাংলায় এ এক নয়া প্রবচন। এবং সে চাষ উচ্চ ফলনশীল ধানের। এবং সংবৎসর চাষ। যা ক'বছর আগে অকল্পনীয়ই ছিল।

গত বছরেরই মে মাসের কথা। কেন্দ্রীয় কৃষি কমিশনার ডঃ এ এস চীমা এসেছিলেন। শেষ বৈশাখের খর তাপের দিনেও হুগলি-বর্ধমানের মাঠে বোরো চাষের সমারোহ দেখে তাঁর সন্তোষের অন্ত নেই। দৃঢ় প্রত্যয় তাঁর, পশ্চিমবঙ্গে বিপ্লব স্থায়ী রূপ নিতে চলেছে।—পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক কৃষির মূল কথাই হলো, চাষের প্যাটার্ন বদলে গিয়েছে। আমন ধানের চিরা-চরিত খরিফ চাষের অনিশ্চয়তার চেয়ে অনেক অঞ্চলেই গ্রীষ্ম-কালীন ধান চাষ বেশি পছন্দ। 'নতুন ধান্যে হবে বনান্ন।' হেমন্তে নবান্ন উৎসব। কারণ নতুন ধান উঠতো কেবল ঐ সময়ই—অগ্রহায়ণ-পৌষে। তা, এখনো ওঠে। বেশিই ওঠে। পশ্চিমবঙ্গে এক কোটি একর জমিতে আমনের আবাদ হয়। তবে নতুন ধান এখন প্রায় সর্ব ঋতুতে। কিন্তু বছর পাঁচ-ছ' আগেও ভিন্ন ছবি ছিল। ১৯৬৬তে পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ ফলনশীল বীজে চাষাবাদের কর্মসূচির সূচনা। তারপরই বছর বছর এ রাজ্যে ফসল ফলনের চেহারা পাল্টাতে থাকে; ঢং, রীতি বদলায়। আবহমান কাল থেকে আমনই বাংলাদেশে প্রধান চাষ। কালেভদ্রে একই জমিতে কেউ দু ফসল তুলতেন। না হলে ধানের জমি, আলুর জমি, পাটের জমি সব আলাদাই ছিল। তিন ফসল ভাবনার মধ্যেই ছিল না। কোনো কোনো অঞ্চলে কিছু আউশ হতো—অবশ্য নদীয়ায় আউশের চাষ ভালোই ছিল। বোরো চাষ বেশ কম। ধান রোয়ার প্রচলিত পঞ্জি এই রকম—আউশ চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ; আমন আষাঢ় শ্রাবণ, ভাদ্রে; বোরো অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘে। চাষের প্রকৃত মরশুম বর্ষার ক'মাস। আর শীতের গোড়ার দিকে ধান কাটা, তোলার কাজ। শীতে রবি শস্যের চাষ। তুলনায় কম জমিতে। আর এখন? কৃষিপঞ্জি একাকার। এই তো এ বছরেই এরাজ্যে ৭ লাখ ৭৩ হাজার একরে বোরো চাষ হয়েছে। তিন চার বছর আগে হতো মাত্র ৭০ হাজার একরে। ১৯৬৬-'৬৭ সনে হয়েছিল ৬৮ হাজার ৩শ একরে। গম? আগেকার দিনে এ বঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলায় সামান্য কিছু জমিতে যা গম চাষ হতো। ১৯৬৬-৬৭ সাল থেকে ভারতের গম চাষের মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গেরও নাম যুক্ত হয়। ১৯৭১-৭২এ ১০ লাখ ২৭ হাজার একর জমিতে গম চাষ হয়েছে। ১০ লাখ টনের মত গম ফসল। উৎপাদনের হারও ভালো—পাঞ্জাবের পরেই পশ্চিম-বঙ্গের স্থান।

এ রাজ্যে ফসল-ফলনের বিস্তারিত হিসাব-নিকাশে বসার আগে একটা কথা বলা দরকার, চাষের এই হাল বদলে সংস্কার, অভ্যাস, প্রচলিত প্রথার প্রতি আসক্তি বিন্দুমাত্র বাধা হয়নি, তা বললে সত্যের অপলাপই হবে। তবে হাতে-নাতে ফল পাওয়া, যাকে বলে নজির, দৃষ্টান্ত সৃষ্টি, তা মস্ত বড় শিক্ষক। এখানেও সেভাবেই শিক্ষা হয়েছে। নতুবা উত্তর ২৪ পরগণার আম-ডাঙ্গায় গভীর নলকূপে জলসেচ দেখতে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে এ কাহিনীও কি শুনিনি একদিন যে, প্রথম প্রথম চাষীদের কতই না দ্বিধা। 'পাতালের জলে' চাষ করলে শাপ মুন্যি লাগবে, আখেরে জমির পাট নষ্ট হয়ে যাবে। কিছুতেই আর এ বিশ্বাস ভাঙ্গা যায় না। এরই মধ্যে যে দু একজন এগিয়ে এলেন, তাঁরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সারা বছর চাষ দিলেন, খামারে বেশি ফসল তুললেন এবং কোনো অভিশাপের কোপেও পড়তে হলো না তাঁদের—এ সবই যখন প্রতিবেশীরা সভয়ে, সসঙ্কোচে দেখলেন, দ্বিধা ঘুচতে শুরু করলো। বীরভূমের গাঁয়েও এই একই কাহিনী। বছর সাড়ে তিন আগের কথা। চাষের কাজে, চাষের প্রচারে ছাত্ররা অংশ নিচ্ছেন, দেখতে গিয়েছি। সিউড়ি থেকে মাইল ছয় দূরে ভুরকুনা গ্রামের ছেলে, সিউড়ির বিদ্যাসাগর কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পড়ুয়া। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গেই চাষ চালিয়ে যাচ্ছেন শ্রীধর মুখো-পাধ্যায়। বলেছেন, বোঝবার মতো বয়স হওয়া থেকেই দেখছি, বাড়ির অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয়ে যাচ্ছে, উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে বেশ খানিকটা উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়ি। পড়ার ইচ্ছে, অথচ বাড়ির ওপর চাপ পড়ছে। চাকরিও হঠাৎ জোটে কোথায়! খোঁজ করি। আর ততই নিরাশ হই। এ সময়েই গ্রামসেবক যামিনীদা ডেকে চাষের কথা বললেন। বাবাকে বলি। তা তিনি এই নতুন ধান

চাষে ইতস্তত করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে রাজি করালাম, জমি থেকে যা তিনি পান, তা তাঁকে দেবো, বাকি অতিরিক্ত ফসল আমি নেবো। সেই শুরু। ঘাড় নেড়েছেন, না, পড়াশোনার ব্যাপারে আর কোনো সমস্যা নেই। ঐ কলেজেরই তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শান্তিরাম মুখোপাধ্যায়। ৮ বিঘে জমি বিক্রি করে বোনের বিয়ে দিতে হয়। পড়া বন্ধ হবার উপক্রম। তা তিনি নতুন চাষে বিশ্বাস করলে হবে কি, বাড়িতে তীব্র বাধা, জমিতে সালফেট দিবি কি! ভাগ্যক্রমে ওঁর নিজের নামে সামান্য জমি ছিল। সার ঋণ মিলল। সরকার থেকে বীজ পাওয়া গেল। ১৯৬৬ সালে তাইচুং-৬৫ দিয়ে শুরু। তারপর দু বছর আই আর-৮। গাঁয়ের ভাষায় 'দেড়ে বাড়ি নেওয়া বন্ধ', অর্থাৎ 'এক' ধার নিয়ে 'দেড়া' শোধ দেওয়ার কাল গত। ঐ সময়েই সিউড়ির আরো কয়েকজন কলেজ ছাত্রের সঙ্গেও কথা বলেছি। তাঁদেরও অভিমত, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষি আজ পেয়িং। অর্থাৎ টাকা আসছে। এই বেকার সমস্যার যুগে ঐ সুযোগ অবহেলা করি কী করে?

অর্থাৎ বাস্তব লাভালাভের হিসাব কষে চাষী দেখেছেন, ফলে সংস্কার কাটতে দেরি হয়নি। হয়তো বা দ্রুততরই এ বদল ঘটে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে কৃষির নয়া হালচাল, কৃষকের নয়া আশা-প্রত্যাশা-ভাবনা বুঝতে হলে এই পালাবদলের গোটা পটক্ষেপটা জানা থাকা দরকার। একদা কতই না শুনতে হয়েছে যে, বাংলাদেশের কৃষক অত্যন্ত রক্ষণশীল। গরুর গাড়ির যুগ থেকে ওদের বার করে আনে কার সাধ্য। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার উল্টোটাই দেখা গেল। রকফেলার ফাউন্ডেশনের রিপোর্ট প্রণেতা বলেছেন, "জাপানে নতুন বেঁটে জাতের ধানের বহুল প্রচলন হতে ২০ বছর লাগে। কিন্তু যা আভাস দেখা যাচ্ছে, ভারতে সেজন্য অর্ধেক সময় লাগবে; কারণ এখানে ধান-চালের গবেষণায় এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে।...যে গতিতে ভারতীয় কৃষকরা ও বিজ্ঞানী সমাজ—বিদেশ থেকে কিছু উপকরণ-সরঞ্জাম ও পরামর্শ সাহায্য নিয়ে সহসা দেশকে প্রচুর খাদ্য সংস্থানের দিকে মোড় ঘুরিয়ে চালিয়ে দিয়েছেন, পৃথিবীর আর কোথাও এত দ্রুত দিক্ পরিবর্তনের নিদর্শন নেই। অথচ এঁদের যাত্রা শুরু হয়েছিল বলতে গেলে একেবারে গোড়া থেকে।"—নিশ্চয়ই কথাটা উঠবে, কৃষির আধুনিকীকরণ বলতে যা বোঝায়, তা কতদূর কী ঘটেছে এখানে। ঠিকই, সে অবস্থায় পৌঁছোতে এখনো অনেক দেরি। তাছাড়া আমাদের দেশের জনবল, জোত জমির পরিমাণ, কৃষি-নির্ভর অর্থনীতি, বেকার সমস্যা ইত্যাদি বিচারে পুরো যান্ত্রিকীকরণ আজ কাম্য কিনা, উপযোগী কিনা, তাও কম বড় প্রশ্ন নয়। তবে গাঁ-ঘরে কিছু কিছু যন্ত্রপাতির জন্য চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে। যন্ত্রে বিরাগ নেই। রক্ষণশীলতা দূরে অস্ত। তার জায়গা নিয়েছে উপযোগিতার প্রশ্ন, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনবোধ। হুগলি জেলার হরিপাল থানার চাষী বলছিলেন, তাইচুং-এ মাসে তিনবার কীটনাশক ওষুধ স্প্রে করতে হয়। স্প্রেয়ার খুব চলতি। তত না হলেও সীড ড্রিলেরও (ধান বীজ রোপণ যন্ত্র) চাহিদা ভালো। হুইল-হোরও (নিড়েন যন্ত্র) প্রচলন হচ্ছে। পাম্প তো চাষীরা চানই।

এসব থেকে একটি উপসংহারেই পৌঁছোতে হয় যে, পশ্চিমবঙ্গে কৃষির নব রূপান্তর অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। তা এ রাজ্যেও সবুজ বিপ্লবের জোয়ার পৌঁছে গিয়েছে, না পশ্চিমবঙ্গ এখন সবে কৃষি বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে, সেটা মতামতের ব্যাপার হতে পারে; তবে এ বিষয়ে কোনো সংশয়ই নেই যে, জগদ্দল পাথর নড়েছে। আজ সম্মুখ গতি। নতুন পর্যায় শুরু হয়েছে ১৯৬৭-৬৮ থেকেই। ১৯৬৭ সালে প্রথম জাতীয় ভিত্তিতে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের চেষ্টা হয়। এবং ১৯৬৮ সাল থেকে উল্লেখযোগ্য আর্থিক সংস্থানের সাহায্যে সারা ভারতে সুসংহত কার্যক্রম নিয়ে অভিযান আরম্ভ। পরিসংখ্যানের ভাষায়—১৯৬৫ সালে এ রাজ্যে যেখানে এক লক্ষ একর জমিতে উচ্চ ফলনশীল ফসল হতো সেখানে ১৯৭১-৭২ সালে তা বেড়ে ১০ লক্ষ একরে পৌঁছেছে। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার এবারে তাঁর বাজেট ভাষণে আশা প্রকাশ করেছেন বছর দু-এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যে স্বয়ংভর হবে। খাদ্যশস্যের ফলন বাড়ার যে হিসাবটা তিনি দিয়েছেন তা হলো এই: ১৯৬৬-৬৭ সালে খাদ্যশস্য

ফলন হয় ৪৯·৫৬ লক্ষ টন। আর ১৯৭১-৭২এ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২ লক্ষ টনে। ১৯৬৯-৭০এ কেবল চালই হয় ৬৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন। মোট খাদ্যশস্য ৭৩ লক্ষ ৬০ হাজার টন। '৭১-৭২-এ দৈব-দুর্বিপাকে কিছু কমে যায়। সেদিন এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলছিলেন, '৭২-৭৩-এ ৮০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আশা করছেন।

অঞ্চলেও চাষ দেওয়া হয়। গম ছাড়াও রবিশস্য, ডাল, বার্লি, ভুট্টা চাষও বেড়েছে। একটা কথা বলে রাখা ভালো, সরকারের ঘরে, সরকারী ছাপা পত্র-পত্রিকায় পরিসংখ্যানে হেরফের বড় চোখে পড়ে। তবে সংখ্যা-পরিসংখ্যানের গোলক ধাঁধায় বেশি করে নাই বা ঢুকলাম; তাতেও কিন্তু মোটামুটি কৃষি-চিত্রটি পেতে কোনো অসুবিধা হয় না।

পশ্চিমবঙ্গে চাষাবাদে এই অগ্রগতির হার আরো কিছুটা বাড়লে অদূর ভবিষ্যতেই খাদ্যশস্যের দিক থেকে স্বয়ংভর হওয়া কিছু অবাস্তব চিন্তা নয়। এ রাজ্যে জনসংখ্যা ১৯৭১এ দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ। মোটামুটি ৮৬ লক্ষ টনের মতো খাদ্যশস্যের চাহিদা। এই চাহিদা পূরণে বহুমুখী চাষ পরিকল্পনা, উচ্চ ফলনশীল বীজে চাষ বাড়ানো ফলপ্রদ উপায় তো বটেই। বিশেষ করে যেখানে কৃষি জমির পরিমাণ মাথাপিছু গড়ে মাত্র এক বিঘা। এবং যেহেতু জমি এক লপ্তে করার, যৌথ খামার করার কথা এখনই ভাবা হচ্ছে না। কাজেই নয়া প্রথায় ব্যাপক চাষেই বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এ প্রসঙ্গেই স্মরণ করা যেতে পারে যে, দেশ স্বাধীন হবার অব্যবহিত পরে —১৯৪৭-৪৮এ এ রাজ্যে ধান ফলেছিল ৩৫ লক্ষ ৫ হাজার টন। আর আজ তা দ্বিগুণ বেড়েছে তো বটেই এবং নয়া চাষের কল্যাণেই। এ সত্যটা সরকারও বুঝেছেন। তাই কৃষিমন্ত্রীর ঘোষণা আরো ৮ লক্ষ একর জমিকে সেচের আওতায় আনা হবে; অতিরিক্ত আরো ৮ লক্ষ একরে বোরো ধান ও ১ লক্ষ একরে পাট চাষ করা হবে। অর্থাৎ পাট চাষ বেড়ে চার লক্ষ একরে দাঁড়াবে। কতদিনে এসব হবে? কৃষিমন্ত্রী দু বছরে করতে চান। এছাড়া প্রকল্প-পরিকল্পনার পর্যায়ে রয়েছে, গ্রামীণ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আর-ডি-এ) গড়ে ক্রম পর্যায়ে জেলায় জেলায় ১০ হাজার একরে এক একটা উন্নত চাষাবাদ ইউনিট বা অঞ্চল সংগঠন করা। সাধু পরিকল্পনা বৈকি। হাঁ, চাষবাসের কথায় অবশ্যই অন্যান্য চাষের কথাও ওঠে। পাট তো বটেই। তুলো চাষেও নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ১৯৬৯-৭০এ সুন্দরবন অঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম তুলো চাষ করা হয়। ১৯৭০-৭১-এ হাওড়া ও মেদিনীপুরের উপকূল

কিন্তু যা বলছিলাম, কথায় ও কাজে ফারাক যদি থাকে। যদি কেন, থাকছেই। বাধা বিপত্তির কি বিরাম আছে? তবে কৃষির অনুকূল হাওয়া এখন গাঁ-ঘরে। কৃষি মর্যাদা পাচ্ছে। কৃষিতে মূলধন নিয়োগের প্রবণতাও বাড়ছে। চাষবাস, কৃষক কল্যাণ নিয়ে মাথা ঘামান এমন একটি সাময়িকপত্র লিখছেন, 'আধুনিক চাষবাসে যত লাভ তা অন্য কোনো শিল্পে সম্ভব নয়। আধুনিক চাষ বলতে বোঝায় সারা বছরে দু-তিনটে করে চাষ, উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার, যথেষ্ট রাসায়নিক সার, অধিক ফলনশীল বীজ, সেচ, বিদ্যুৎ, নলকূপ, পাম্প, ট্রাকটার; টিলার; গুদাম ও মার্কেটিং ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, ট্রাক, লরি ইত্যাদির ব্যবহার। চাষ থেকে ৪০০-৫০০ পারসেণ্ট লাভ ওঠানো সম্ভব। কেন না আমাদের দেশের চাষের উৎপাদনের মান পৃথিবীর মধ্যে নিকৃষ্ট। যে উদ্যোগে শতকরা ৪০০-৫০০ ভাগ লাভ ওঠানো যায় সেখানে প্রচুর পরিমাণে বা যথেষ্ট মূলধন প্রয়োগ হবে না কেন?' অত লাভের জন্য লোভ নাই বা করা হলো, তবে সেচ সংস্থান আর কৃষির জন্য মূলধন, এখন এই দুটিই মূল চাহিদা। সাদাসাপটা হিসাব হলো, উন্নত প্রথায় চাষে জল, সার, লাঙ্গল, কিষেণ সব খরচ-খরচা ৫০০ টাকার মতো পড়ে বিঘে প্রতি। হেসে খেলে ২৫ মণ ধান ওঠে। ৪০ টাকা মণ ধানের দর ধরলে হাজার টাকা আসে। অর্থাৎ নীট লাভ ৫০০ টাকা। তাছাড়া খড় আছে। চাষী নিজে চাষ দিলে লাঙ্গল, নিড়েন, এসব খরচা সাশ্রয় হয়। সেক্ষেত্রে লাভ আরো বাড়ে। সাধারণভাবে পশ্চিমবাংলার কৃষকরা একর প্রতি গড়ে ৭০-৭৫ মণ ফসল বোরো ধান চাষে তুলছেন। আরামবাগের ডিহিবাগনানের শ্রীবিজয় অধিকারী জয়া ধানের একর প্রতি ফলন ১৩৯ মণ পেয়েছেন। অবশ্যই এ আদর্শ

কৃষকের সফল চাষের কাহিনী। বলার কথা, প্রারম্ভিক এই খরচ ছোট চাষীদের সঙ্গতির ওপর বেশ চাপ সৃষ্টি করে। যদিও আখেরে লাভ ভালোই থাকে। উল্লেখ্য, যে দু চারজন চাষী ট্রাকটার ব্যবহার করছেন, বিক্ষিপ্তভাবে নিজেদের জমিতেই তা করছেন। কিছু ভাড়াও খাটাচ্ছেন। সেটা কতদূর কী কার্যকর হচ্ছে, খরচে পোষাচ্ছে কিনা, তা তৌল করে দেখার বিষয়। তবে আজ এও এক প্রবাদ বাক্যের মতো যে কৃষিতে টাকা ঢাললে টাকা আসে। কাজেই সুবিধাটা বেশি সম্পন্ন চাষীদেরই। তবে একেবারে গোড়ায়ই বলেছি না, জল থাকলে আজ আর চাষীদের বলতে হয় না। সে তাঁরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চাষের প্যাটার্ন নিজেরাই ঠিক করে নিচ্ছেন। বীজের জন্য দরবার করছেন, সারের জন্য হন্যে হয়ে ছুটছেন; ব্লক অফিসে হাঁটাহাঁটিতে ক্লান্তি নেই। এবং জলের জন্য দল বেঁধে অগভীর নলকূপ বসাবার ঝোঁকও বাড়ছে। নদীয়ায় বরণবেড়িয়ায় 'অগভীর নলকূপগুচ্ছ প্রকল্প' দেখে এসেছি। মুর্শিদাবাদেও একটি। সেদিন দেখে এলাম ভিন্ন ব্যবস্থাপনায় বাগনানের কাছে বাইনানে একটি ভিন্ন প্রকল্প। ব্যাংক অর্থের জোগানদার, ব্যবস্থাপক একটি সংস্থা। চাষীরা চাষ করছেন। এসবই বিক্ষিপ্ত প্রকল্প। তবে সব নজিরেরই একটা প্রভাব পড়ে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে জলে যেমন জল বাড়ে, তেমনি চাষেও চাষ বাড়ে। কিন্তু সাফল্যের মূল সূত্রটুকু রয়েছে এখনো সেচ সংস্থানে। সে বিচারে এ রাজ্যের ছবি মোটেই উজ্জ্বল নয়। খোদ মন্ত্রীর স্বীকৃতি অনুসারেই রাজ্যে চাষযোগ্য এলাকা হলো ১৩৭ লক্ষ একর, আর সেচের অধীন মাত্র ৪৬·৪৮ লক্ষ একর। ঠিকই সেচ প্রকল্প বেড়েছে, তেমনি যাকে বলে প্রাইভেট সেচ, সেই পুকুর বিলের সেচ তো বহু ক্ষেত্রেই নিঃশেষ। নদী থেকে জল তুলে সেচ সংস্থানের প্রকল্প যা চালু, তা হচ্ছে ৯৪৩টি; ৩১ হাজারের মতো অগভীর নলকূপ। গভীর নলকূপ ১৭৫৬, চালু বা বিদ্যুতায়িত হয়েছে ১৫৪৭টি। কিন্তু দরকার এখনো অনেক। এই চাহিদা যেমন যেমন মিটবে, চাষের বাড়-বাড়ন্তও হবে সেই অনুপাতে।

ভারতের কৃষি কমিশনার ডঃ চীমার বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গ শীঘ্র চালের ক্ষেত্রে কেবল উদ্বৃত্তই হবে না, উপরন্তু লক্ষ লক্ষ কৃষি পরিবারের কর্ম সংস্থানও করবে। উন্নত চাষাবাদের ফলে গ্রামে কৃষিশ্রমিকদের কাজ সংকুলান যে কিছুটা হচ্ছে, তা প্রমাণিতই। ১৯৭২-এর মার্চ পর্যন্ত একটা খসড়া হিসাব দেখ-ছিলাম। কৃষিতে কর্মহীনের সংখ্যা এরাজ্যে ১৭ লক্ষ মানুষ। গড়ে বছরে যদি জমিতে আড়াইটা ফসলও হয়, কৃষিতে কর্ম-সংস্থান হবে ৭৬ লক্ষ থেকে ৯৫ লক্ষ মানুষের। এখন কর্ম-সংস্থান হচ্ছে ৫২ লক্ষের। অর্থাৎ আরো ২৪ থেকে ৩৪ লক্ষ লোকের কাজ হতে পারে। আধুনিক কারিগরি জ্ঞানের পূর্ণ সদ্ব্যবহার হলে তা বেড়ে ৫০-৬০ লক্ষও হতে পারে।

কথায় বলে, যে ঠাকুরের যে পুজো। তা আজ আর সফল ফলাও আন্দোলন করতে হয় না, দরকারও করে না। তাইচুং, আই আর-৮, জয়া, পদ্মা এইসব নয়া ধান, সোনারা নয়া গম গাঁয়ের শিশুরাও জানে। বহু ফসল চাষ বা যাকে বলে একই জমিতে মাল্টিপল ক্রপিং বা নিবিড় চাষ—এ আজ চাষীদের অতি সুপরিচিত। সরকারী প্রচারের কল্যাণেই বলুন বা প্রগতি-শীল চাষীদের নয়া টেকনিকের প্রতি আগ্রহের দরুণ ও নয়া বীজ আমদানির ফলে—যেজন্যই হোক, এই প্রণালীতে চাষাবাদে বিশ্বাস স্বতঃই দৃঢ় হয়েছে চাষী মহলে। বারবারই বলেছি, চাষী আজ চাষ করছেন হিসাব কষে। কিন্তু এখানেই কি উদ্যোগ-আয়াসের ইতি ঘটবে? নিশ্চয়ই না। সরকারও তা আদৌ ভাবেন না। বরং কী ভাবে সেচ পৌঁছে দেওয়া যায়, গাঁয়ে বিদ্যুৎ নিয়ে যাওয়া যায়, ছোট ছোট শিল্প গড়ে জমির ওপর চাপ কমানো যায়, পাম্প সুলভ করা যায় সে সবই ভাবছেন। সেজন্য তৎপরতা বাড়ছে বৈ কমছে না। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ বোরলগ কিছুকাল আগে একবার একটি আলোচনাচক্রে যোগ দিতে দিল্লি এসেছিলেন। তিনি তখন বলেন, চাষীদের বিক্রেয় কৃষি পণ্যের ন্যায্য দর পাওয়া চাই। তাছাড়া সার লভ্য হওয়া প্রয়োজন এবং যন্ত্রপাতি ও সার কেনার মতো ঋণ পাওয়াও দরকার। ফসল বোনা ও ফলন প্রক্রিয়া হাতে কলমে দেখাবার পদ্ধতিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আর এক জায়গায় আর একটি খাঁটি কথা বলেছেনঃ এই পরিবর্তন

সুনিশ্চিত করতে হলে চাই উচ্চ সরকারী পর্যায়ে সঠিক অর্থ-নৈতিক রীতিনীতি নির্ধারণ ও তা রূপায়ণ।—অর্থাৎ সবুজ বিপ্লবকে স্থায়ী করতে হলে এখনো অনেক করণীয়ই রয়েছে এবং তা সরকারের অজানাও নয়। এক্ষেত্রে সেসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ কম। তবে যা অত্যাবশ্যক করণীয় সেগুলি হলো—ভূমি সংস্কার, গ্রামীণ বিদ্যুৎ, সেচ, কৃষি সরঞ্জাম কেনার জন্য অর্থ সংস্থান, নামমাত্র সুদে ছোট চাষীদের ঋণ দান। হাঁ, আজ না হলেও কাল কৃষি বীমার কথাও ভাবতে হবে। ঋণজর্জর কৃষকদের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। অধুনা তেমন কোনো সামগ্রিক সমীক্ষা হয়নি। বেশ ক'বছর আগে রিজার্ভ ব্যাংক এক নমুনা সমীক্ষা চালান—তাতে দেখা যায়, ছোট চাষীরা ক্রমশ বেশি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। এই ঋণ 'মোরাটোরিয়াম' (ঋণ পরিশোধ স্থগিত রাখার আইনতঃ অধিকার প্রদান) করা যায় না? এইভাবে—সত্যকার মমতা নিয়ে, আন্তরিকতা, দরদ নিয়ে চললে, প্রশাসনের লালফিতের বাঁধন আলগা করতে পারলে পশ্চিমবঙ্গ অগোণে খাদ্যে স্বয়ংভর তো হবেই, খাদ্যশস্যও উদ্বৃত্ত হওয়া মোটেই বিস্ময়ের নয়। গাঁয়ের চেহারাই যাবে পাল্টে। কৃষি সম্পদ তখন দেশের সামগ্রিক উন্নতিরই পরিপোষক। দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদটাই তখন সুদৃঢ়। সেদিনই হবে পশ্চিমবঙ্গে সত্যকার সবুজ বিপ্লব। সবুজ বিপ্লব তখন পশ্চিমবঙ্গের কৃষককুলের আবেগে, আকুতিতে সীমাবদ্ধ থাকবে না, ফলেন পরিচীয়তেও হবে।
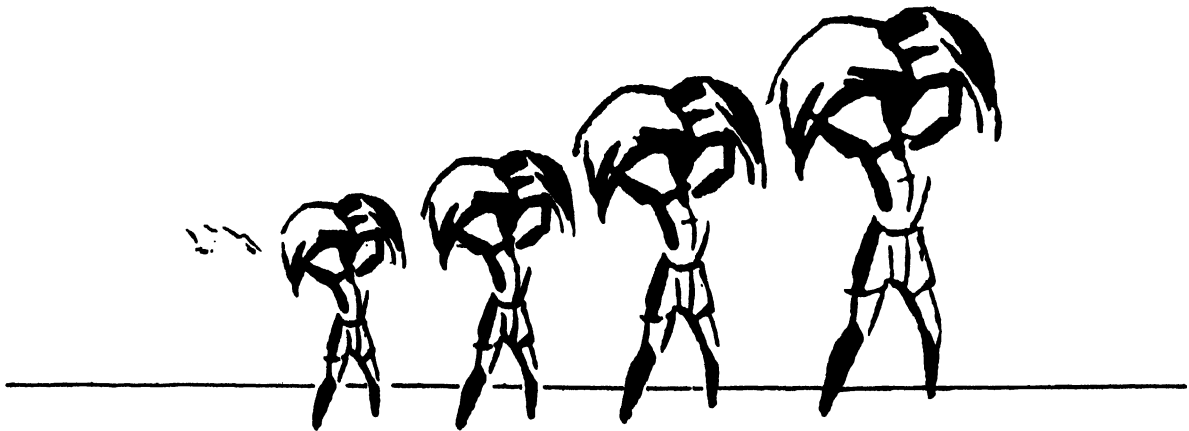
যিনি বলেছিলেন, “আজ বাংলা যা চিন্তা করছে আগামী কাল সারা ভারত তাই চিন্তা করবে”, কলকাতা শহর এবং এই শহরের নারী সমাজের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল এই শতাব্দীর প্রথম পাদে। বঙ্গপ্রেমিক এই মারাঠী নেতা অসময়ে মারা যাওয়ার পর তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখবার জন্য সার্থকতম যে আয়োজনটুকু করা হয়েছিল কলকাতায় সেই গোখলে বালিকা বিদ্যালয়টি গড়ে তুলেছিলেন তাঁর অনুরাগিনী কয়েকটি বাঙালী মহিলাই। মনে হয় এই পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও গুণগ্রাহিতা না থাকলে অতবড় প্রশংসা বাঙালী সেদিন পেত না। দীনহীন অযোগ্য বংশধররা যেমন করে মহিমান্বিত পিতৃ-পুরুষের মহামূল্যবান কিন্তু জীর্ণ একটি শাল কিংবা বিবর্ণ একটি রূপোর আলবোলা সযত্নে জমিয়ে রাখেন এবং মাঝে মাঝে পাঁচজনকে দেখিয়ে আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন আমরা আজও তেমন করেই জমিয়ে রেখেছি ঐ বাক্যটি: What Bengal

thinks today, India thinks tomorrow!
কিন্তু পাঁচজনকে ডেকে শোনাবার মুখ আর নেই। কারণ এ তো মহার্ঘ বস্তু নয়, এ মহৎ কর্মের স্বীকৃতি। প্রতিদিন এই প্রশংসা বাক্যের যোগ্য কর্ম না করতে পারলে এ বাক্য আমাদের মুখে তো মানায়ই না, অপরেও মুখে আনে না আর সে কথা।

স্বাধীনতা অর্জনের ভারতব্যাপী প্রয়াস যখন চলছিল তখন যে প্রশংসা আমরা পেয়েছিলাম স্বাধীনতা অর্জনের পর আমরা সে প্রশংসায় অধিকার হারালাম কেন? কারণ অবশ্যই আছে। দৈব ও পুরুষকার দুই-ই আমাদের প্রতিকূল ছিল। যে দুটি প্রদেশকে স্বাধীনতার জন্য সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতে হয়েছিল বাংলা তার মধ্যে একটি। বলতে গেলে এ আমাদের ভাগ্যের মার। অবশ্য দুর্ভাগা দেশকে এ মার সম্বন্ধে বহু পূর্বেই সাবধান করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তবে আমরা তাকে কাব্যকথা বলে যথেষ্ট গ্রাহ্য করিনি। কিন্তু এই যে মার খেয়েও মরব না এমনতর পণ পাঞ্জাবে যতটা দেখেছি বাংলায় ততটা দেখিনি। সংগ্রামের দিনে বাংলা সারা ভারতকে অসংখ্য নেতা সরবরাহ করেছিল—রাজনীতিতে, শিক্ষায়, সাহিত্যে, শিল্পে, সমাজ সংস্কারে, ধর্মপ্রচারে, কিসে নয়? আর স্বাধীনতার পরবর্তী কালে ঐ নেতৃত্বে দৈন্যই আমাদের দেউলে করে দিল। অবশ্য আন্দোলনের পক্ষে বাঙালি চরিত্রের উপাদানগুলি যত উপযোগী সংগঠনের পক্ষে তত নয়, এমনতর সমালোচনাও শোনা গেছে; তবে তার সত্যমিথ্যা যাচাই করার ক্ষেত্র এটা নয়। কিন্তু এ জাতীয় বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও বলা যায় যে স্বাধীনতার পরবর্তী কালে বেশ কিছু চোখে পড়বার মতো পরিবর্তন এই বাংলাতেও ঘটে গেছে।। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য যা, তার একটি অবশ্যই বাঙালী নারীসমাজের প্রগতি।

সমাজ আদৌ অগ্রসর হয় কিনা অথবা চক্রবৎ ঘূর্ণিত হয়ে একই জায়গায় ফিরে ফিরে আসে সে বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিক বিতর্কে প্রবেশ না করে আপাতত ধরে নেওয়া যাক যে অন্তত কিছুকালের মতো মানব সমাজের কোনো কোনো অংশে বিশেষ কোনো দিকে কিছুটা অগ্রসরণের লক্ষণ দেখা যায়। কোনটাকে অগ্রসরণ বলবো তারও কিছু সর্বজনগ্রাহ্য লক্ষণ আছে বটে। শিক্ষার প্রসার ও নৈতিক উন্নতি কতটা হোলো ; আর্থিক স্বাচ্ছল্য সমাজের সব স্তরে সকলকে স্পর্শ করলো কিনা; আইনসংগত অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা সবাই পেল কিনা; প্রত্যেকের আত্মস্ফুরণের সুযোগ কি পরিমাণে বাড়লো—ইত্যাদি বিষয়ে পরিসংখ্যান বিচার করে একটা রায় দেওয়া যায় বটে যে গত ২৫ বছরে বঙ্গীয় সমাজের অবনতি হয়েছে না উন্নতি। কিন্তু পরিসংখ্যান-বিশেষজ্ঞ যে ছবি আঁকেন সমাজের, তার তুলনা মেলে শুধু অস্থিবিদের (anatomist) আঁকা দেহের চিত্রে। রবীন্দ্রনাথের 'কঙ্কাল' গল্পের অশরীরিণী নায়িকা বলেছিল, "তোমার কাছে কি করিয়া প্রমাণ করিব যে, সেই দুটো শূন্য চক্ষুকোটরের মধ্যে বড়ো বড়ো টানা দুটি কালো চোখ ছিল এবং রাঙা ঠোঁটের উপরে যে মৃদু হাসিটুকু মাখানো ছিল এখনকার অনাবৃত দন্তসার বিকট হাস্যের সংগে তার কোনো তুলনাই হয় না।"—পশ্চিম বাংলার মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার, তাঁদের আর্থিক উন্নতি ও কর্মসংস্থান, সামাজিক সুবিচার, আইন-সংগত অধিকারের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ক্ষেত্র থেকে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে যদি নারী প্রগতির কঙ্কালসম চেহারাটি শুধু ধরে দেওয়া যায় তবে আমিই বা কি করে প্রমাণ করবো এই পঁচিশ বছরে কতখানি মহিমা অর্জন করেছেন পশ্চিমবাংলার কন্যারা? মহারাষ্ট্র, কেরল, গুজরাট, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ইত্যাদি অঞ্চলের পরিসংখ্যানের সংগে যদি তুলনা করা হয়, তবেই তো বোঝা যাবে, পশ্চিমবাংলা কতো পেছনে পড়ে আছে! তাছাড়া সরকারী ও বেসরকারী প্রয়াসে সংগৃহীত পরিসংখ্যানও খুব প্রচুর নয়, সুলভ তো নয়ই। পরিসংখ্যান সম্বন্ধে বিশ্ব জুড়ে এখন যে সন্দেহের ভাব এসেছে তার সংগে অবশ্য আমাদের এই স্থানীয় অনীহার কোনো সম্পর্ক নেই। সে যাই হোক, সংখ্যার বিচার ছাড়াও তো আরও একটা বিচার আছে। সে বিচার গুণের বিচার। বোধহয় এ বিচারে পশ্চিমবাংলার মেয়েদের খুব তেমন অবহেলা করা যাবে না।

ভারতবর্ষের যে তিনটি প্রধান নগরীতে সব প্রথম ইংরিজি শিক্ষার প্রসার হয় সে তিনটি নগরীই স্বমহিমাসচেতন তিনটি আঞ্চলিক সংস্কৃতির কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। বাঙলা, মহারাষ্ট্র, তামিলনাদ এই তিনটি অঞ্চলের মানুষই নিজেদের সাহিত্য-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেশ গৌরববোধ করেন বলেই পশ্চিমী শিক্ষার প্রভাব এ'দের একেবারে উন্মূল করতে পারেনি চিরাচরিত ঐতিহ্যের জমি থেকে। কিংবা হয়ত এই অহঙ্কারের অনেকটাই বিদেশী শিক্ষার পরোক্ষ সুফল। স্বাদেশিকতার রাজনৈতিক চেতনা যেমন যেমন দানা বাঁধতে লাগলো স্বদেশী সংস্কৃতি নিয়ে গৌরববোধও সেই সঙ্গেই প্রবল হয়ে উঠল। প্রতি-তুলনায় মধ্য এশিয়া কিংবা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মহিলাদের দেখলে বোঝা যাবে যে তাঁরা অন্তরে এখনও অষ্টাদশ/ঊনবিংশ শতকে বাস করলেও পোশাকে পরিচ্ছদে পশ্চিমের আধুনিকতম ধারার অনুসারিণী। আমাদের সৌভাগ্যবশত পশ্চিমী শিক্ষায় আমাদের অন্তরঙ্গ পরিবর্তন যতটা হয়েছে সে তুলনায় বহিরঙ্গে ছাপ পড়েছে কম। অবশ্য বাঙালী মেয়েরাও পাশ্চাত্যের প্রথম ধাক্কায় একটু বেসামাল হয়েছিলেন বই কি। কিন্তু তাঁরা অচিরেই প্রত্যাবর্তন করেছিলেন নতুন অথচ ঐতিহ্যপ্রভাবিত একটি আশ্রয়ে। ব্রাহ্ম বালিকারা প্রথম প্রথম য়ুরোপীয় কনেদের অনুকরণে বিবাহের পোশাক তৈরি করাতে শুরু করেছিলেন বলে লিখেছেন সরলা দেবী তাঁর "জীবনের ঝরাপাতা"য় কিন্তু কিছু কাল পরেই নাকি লাল বেনারসী তার হৃতসম্মান ফিরে পেল। তাই বলে অবশ্য তৎকালীন আধুনিকারা ব্লাউজ শেমিজ জুতো মোজা পরার "বেহায়াপনা" অথবা ঘেরাটোপবিহীন পাল্কী চড়ে ইস্কুল যাওয়ার "নির্লজ্জতা" পরিত্যাগ করলেন না। অর্থাৎ আধুনিকতা, শোভনতা ও চিরাচরিত রীতির মধ্যে যথার্থ ভারসাম্য খুঁজে পেতে খুব দেরী হয়নি তাঁদের।

স্বাধীনতা পাওয়ার প্রায় একশ বছর আগেই আধুনিক শিক্ষার আয়োজন করা হয়েছিল বাঙালী মেয়েদের জন্য। অবশ্য সে শিক্ষার অধিকার পেয়েছিলেন গোণাগুনতি কিছু মেয়ে। তবু তার ফলেই সমাজে একটা জাগরণ দেখা দিয়েছিল। সামাজিক জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েদের উপস্থিতি অল্প বিস্তর অনুভব করা যাচ্ছিল। অতএব মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া যে উচিত এবং দিলে যে তাঁরা নানা দায়িত্ব নিতে পুরুষের সমকক্ষ এর প্রমাণ স্বাধীনতা লাভের আগেই মোটামুটি পাওয়া গিয়েছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী কালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোলো স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপক প্রসার এবং নানা বিচিত্র জীবিকার ক্ষেত্রে, এমন কি এ্যাডভেঞ্চারের সন্ধানে বিপথেও মহিলাদের পদসঞ্চার। দেশ বিভাগের রাজনৈতিক দুর্ভাগ্য যে আর্থিক ও সামাজিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল তাতেই বাঙালী মেয়েদের জীবনে সম্ভবত এত বড় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে পারলো। নয়ত কেবল সংস্কারধর্মী প্রয়াসের ভিতর দিয়ে এতখানি জাগরণ সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। বাস্তুত্যাগের এই আঘাতে ঐতিহ্যের মুঠো শিথিল হয়েছে এবং মেয়েদের স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার স্ফুরণে সাহায্য করেছে। নিশ্চিন্ত সুব্যবস্থিত আশ্রয় থেকে ভাগ্য তাঁদের টেনে এনেছে জীবন রণাঙ্গনে, অর্থাৎ লাঞ্ছনা-বেদনা-কৃতিত্ব-সার্থকতার নতুন স্বাদ এনে দিয়েছে বাঙালী মেয়েদের জীবনে। অবশ্য পরিবর্তনটা ঘটেছে প্রধানত মধ্যবিত্ত মেয়েদের মধ্যেই। তাঁদের পাশাপাশি উচ্চ মধ্যবিত্ত সংসারের মেয়েরা শিক্ষার অধিকার পেলেও সংগ্রামের স্বাদ ততটা পায়নি, যদি না ব্যক্তিগতভাবে ভাগ্যের বিড়ম্বনার সঙ্গে যুঝতে বাধ্য হয়ে থাকেন কেউ কেউ। আর নিম্নবিত্ত সংসারের মেয়েরা সংগ্রামটাই চালিয়ে যাচ্ছেন, এমন কি শিক্ষার অধিকার পাবার জন্যও তাঁদের লড়াই করতে হচ্ছে। তুলনায় প্রায় অপরিবর্তিত রয়ে গেছে দরিদ্র, দিন-এনে-দিন-খাওয় চাষী মজুর ইত্যাদি সমাজের মেয়েদের জীবন।

শিক্ষার ব্যাপকতর সুযোগ, আর্থিক স্বাধীনতার ক্রমবর্ধমান ক্ষেত্র, সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণের সহজতর ও উন্নততর উপায়—এক বাক্যে বলতে গেলে এই পাঁচটি হোলো স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে নারী প্রগতির পথে পাঁচটি লক্ষণীয় পদক্ষেপ। শাস্ত্র, লোকাচার ও কুসংস্কারের দেয়াল তোলা দূরে থেকে হঠাৎ যেন

খোলা হাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন মেয়েরা। অবশ্য এখনও পণের কড়ি জোগাতে পিতারা গলদঘর্ম হচ্ছেন কখন কখনও। পিতার কাছ থেকে অপরিমিত যৌতুক নিতে শিক্ষিতা, এমন কি উপার্জনকরা মেয়েদেরও আত্মসম্মানে বাধছে না, গ্রামাঞ্চলে কোনো কোনো জায়গায় শুনি বিশেষত মুসলিম ঘরের মেয়েরা সহশিক্ষালয়ে পড়াশোনা করতে গেলে বাপ-মা প্রায় একঘরে হচ্ছেন, আর্থিক নির্ভরতা এবং সামাজিক কেলেঙ্কারীর ভয়ে স্বামীর নানা ধরনের অত্যাচার, এমন কি বেআইনীভাবে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণও মাথা পেতে নিচ্ছেন বহু মেয়ে, হিন্দু সমাজেও। এ জাতীয় অবিচারের তালিকা আরও স্ফীত করা যায়। তবু মনে রাখা ভালো যে এর জন্য সমাজে প্রগতিশীল চেতনার অভাব এবং ভাগ্যকে মুখ বুঁজে মেনে নেওয়ার চিরাগত অভ্যাস যতখানি দায়ী দেশের আইন কি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ততখানি দায়ী নয়। যে অধিকার বলতে গেলে হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে মেয়েদের, সে অধিকারটুকুও হাতে করে নেবার ক্ষমতা যদি তাঁদের না থাকে তবে সে মূঢ়তা ও জড়তার জন্য দোষী করব কাকে? অবশ্য শত শত বৎসরের জড়তা কাটতেও তো সময় লাগে! তা ছাড়া এই অধিকারগুলি অর্জন করবার জন্য বাংলা তথা ভারতের নারী সমাজকে তো সরকারের বিরুদ্ধে বা পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারী মুক্তি (Women's liberation) আন্দোলন চালাতে হয়নি প্রধানত কয়েকটি হৃদয়বান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষই সংগ্রাম করেছেন তাঁদের হয়ে। সহজে এবং বিনা আন্দোলনেই প্রায় এই অধিকারগুলি পাবার ফলে অধিকার বোধটাও সঞ্চারিত হয়নি ভালো করে। এ যেন অকস্মাৎ মধ্যযুগের অন্ধকারে বিংশ শতাব্দীর তীব্র আলোক সম্পাত।

এই নবযুগের আলো সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে নি বটে তবু সমাজের যে সব ক্ষেত্রে মহিলাদের জীবনযাত্রায়, চিন্তায় ভাবনায় অভাবিত পরিবর্তন ঘটেছে সে দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করব এবং প্রত্যাশা করব যে অচিরেই এ আগুন ছড়িয়ে যাবে সবখানে। দেশের সর্বত্রই তো একই অবস্থা। একদিকে বিজ্ঞানচর্চার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে দেশে, আবার সেইসঙ্গে নানা ধরনের কুসংস্কার ও মূঢ়তারও নতুন করে জয়জয়কার দেখছি চতুর্দিকে। আধুনিকতম শিল্পকলার চর্চা হচ্ছে কত এবং সেইসঙ্গে লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবনও চলছে! অথচ কী শ্রীহীন আমাদের নগর, গ্রাম, গঞ্জ! দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি নিয়ে বড়ো বড়ো আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পসিয়াম হচ্ছে প্রতিদিন অথচ নিরক্ষরতা, অজ্ঞানতা এখনও জগদ্দল পাথরের মতো চেপে আছে দেশের বুকে। আধুনিকতম প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ এবং বৈদিক যুগের যন্ত্রপাতির ব্যবহার পাশাপাশি চলছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের নবতম আবিষ্কার এবং হাতুড়ে চিকিৎসক ও গণকঠাকুরের ব্যবসায়ে কোনো বিরোধ নেই এ দেশে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাড়ি, হোটেল, রেলগাড়িও আছে, আবার পথের পাশে খোলা আকাশের তলায় জীবনধারণের সব প্রক্রিয়াই চলছে। অর্থাৎ এখনও সবদিক থেকেই সেই নানা বৈপরীত্যের সমাহার আমাদের এই ভারতবর্ষ। তাই বাংলার মেয়েদের আত্মবিকাশও যদি হয় ললিতে-কঠোরে, জ্ঞানে-মূঢ়তায় প্রাচুর্যে-দৈন্যে, স্বনির্ভরতায়-অসহায়তায়, ক্ষুদ্রতায়-মহিমায় বিপরীত তাহলে অবাক হবার কি আছে? পশ্চিম দেশে বসে অনেকে দেখি এ ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেন না, কারণ একই কালে একই দেশে কি করে অনেকগুলি যুগ পাশাপাশি সহ-অবস্থান করতে পারে সেটা স্বচক্ষে না দেখলে সব সময় হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হয় না। এই আলো-অন্ধকারে আঁকা বিচিত্র ছবির কয়েকটি দিক মাত্র তুলে ধরব। সবটুকু তো ধরবে না এই পরিসরে।

পশ্চিম বাংলায় স্কুলের বয়সী সব মেয়েরাই স্কুলে যাবার সুযোগ কবে পাবে তা জানি না। তবে একথা বলা যায় যে মেয়েদের মধ্যে পড়াশোনা করার যে প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়েছে তার উপযুক্ত আয়োজন এখনও করে ওঠা সম্ভব হয়নি। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজীয় শিক্ষার ব্যবস্থাও অপ্রচুর আর বয়স্ক শিক্ষার কথা তো না তোলাই ভালো। হিন্দুসমাজে পর্দা ও রক্ষণশীলতা একটু কম থাকায় এবং দেশবিভাগের ফলে উদ্বাস্তু সংসারে প্রয়োজনও বেশি হওয়ায় শিক্ষার যতটুকু সুযোগ পাওয়া

গেছে তার প্রায় সবটুকুই সদ্ব্যবহার করেছেন হিন্দু কন্যারা—কিন্তু তুলনায় মুসলিম সমাজে এ চেতনা বিলম্বে এসেছে। সেদিক থেকে মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার অবস্থা বিবেচনা করার তাৎপর্য হোলো বৃহত্তর বঙ্গীয় সমাজে সাংস্কৃতিক ব্যবধান (Cultural lag) দেশবিভাগের পর কতখানি কমে আসছে তার হিসেব নেওয়া। সম্প্রতি আমি পশ্চিম বাংলার মুসলিম মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা বিষয়ে খোঁজ খবর করে কিছু ইন্টারেস্টিং তথ্য পেলাম। দেখছি দেশ বিভাগের পরেই কয়েক বৎসর বিভ্রান্ত মুসলিম সমাজ কুর্মবৃত্তি অবলম্বন করে সরে থাকলেও গত এক দশক যাবৎ সব দিক থেকে আবার আত্মপ্রসারণে মনোযোগী হয়েছেন মুসলমানরা। ১৯৪৭ সালের পর থেকে মুসলিম মেয়েদের ইস্কুলগুলি—সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল (১৯১১), আঞ্জুমান গার্লস্ স্কুল (১৯০৯) ইত্যাদি—অতিদ্রুত ছাত্রীশূন্য হয়ে গিয়েছিল যেহেতু মধ্যবিত্ত মুসলমানরা দলে দলে দেশত্যাগ করেছিলেন। তখন কোনো কোনো স্কুল হিন্দু ছাত্রীদের নিয়ে চালু রাখতে হয়েছিল। কিন্তু ইদানীং আবার মুসলিম ছাত্রী সংখ্যাও বাড়ছে এবং নতুন নতুন স্কুলও স্থাপন করা হচ্ছে। গত দশ বারো বছরের মধ্যে কলকাতা শহরে অন্তত এক ডজন ইস্কুল খোলা হয়েছে মুসলিম মেয়েদের জন্য কলুটোলা, খিদিরপুর, পার্ক সার্কাস ইত্যাদি অঞ্চলে। ততোধিক উল্লেখযোগ্য এবং প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার হোলো যে গ্রামাঞ্চলে আজকাল মাদ্রাসাগুলিতেও ছাত্রীদের নেওয়া হচ্ছে। তবে সাধারণ Co-educational মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে মেয়েদের পাঠানোটা সমাজের নেতৃস্থানীয়রা তত পছন্দ করেন না যদিও জাতীয় সংহতির দিক থেকে সেটাই বেশি ভালো হোত। তবু আশা করা যায় যে মুসলিম মেয়েদের মধ্যে এই হারেও শিক্ষার প্রসার হতে থাকলে আগামী দশ বছরের মধ্যেই তাঁরা আর ততটা পিছিয়ে থাকবেন না এবং নিজেদের সামাজিক অধিকার বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠবেন। হিন্দুসমাজের মেয়েরা উন্নততর আইনের সাহায্যে যে সুযোগ সুবিচারগুলি পেয়েছেন আশা করা যায় তখন মুসলিম মেয়েরাও সেসব দাবী করতে পারবেন। এর ফলে সামাজিক একটা মস্ত বড় বৈষম্য দূর হবে। মেয়েরা সমাজের অনুন্নত অংশ আজও এদেশে। নানা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেয়েরা আবার আরও পিছিয়ে আছেন। আর্থিক স্বাচ্ছল্য অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে এই অনুন্নত সমাজগুলির দিকে দেশের দৃষ্টি পড়া দরকার। জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার এটাই সবচেয়ে বড় উপায়।

মেয়েদের পরিণত ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে সবচেয়ে বড় অন্তরায় কি, এ প্রশ্ন যদি কেউ করেন তবে আমি বলব সে হোল বৃহৎ পরিবারের দায়িত্ব। জীবনের যে সময়টা রুচি, বুদ্ধি, হৃদয়বৃত্তি বিকাশের প্রকৃষ্ট সময় তখনই যদি এক বছর অন্তর অন্তর একটি করে সন্তানের জন্ম দিতে হয় তাহলে আর যাই হোক চারিত্র্য-বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না। এ সত্ত্বেও কোনো কোনো মহিলা হয়ত অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন, বহু সন্তানের জন্ম দিয়েও সুলেখিকা কিংবা সমাজসেবিকা হয়েছেন কিংবা বহু কৃতী পুরুষের প্রেরণাদাত্রী হয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশের পক্ষেই বহু সন্তানবতী হওয়ার অর্থ জীবনের বহু গভীরতর, বিচিত্রতর অভিজ্ঞতা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা। এই একটি ব্যাপারে প্রকৃতির উপর বিজ্ঞান তার জয়কে প্রতিষ্ঠিত করে মেয়েদের সামনে অনন্ত সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছে। এর ফলে একদিকে বাঞ্ছিত মাতৃত্ব ও সন্তানপালন হয়েছে অবিমিশ্র আনন্দের উৎস, অন্যদিকে কত বেশি অবসর এসেছে অন্যান্য সম্ভাবনাগুলিকে সার্থক করবার। সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করবার জন্য আজকে আর কোনো অঘোরকামিনী দেবীকে চোখের জলে ব্রহ্মচর্য স্বীকার করতে হয় না। সংসার সামলে আর সন্তান মানুষ করেই মেয়েদের সমস্ত চাহিদা, সব সম্ভাবনা পূর্ণ হয়ে যায় একথা হয়ত কেউই আর বলবেন না আজ। পঁচিশ বছর আগে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে জ্ঞান সমাজে প্রায় ছিল না বললেই চলে। অথচ আজ বোধহয় এমন কোনো মধ্যবিত্ত নেই যিনি এ বিষয়ে অল্পবিস্তর অবহিত নন। বলতে গেলে একটা নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে এদিক দিয়ে, যদিও আমাদের যতদূর সাধ্য সে তুলনায় আমরা খুবই কম প্রয়াস করেছি এর প্রচারে। আমাদের পার্লামেন্ট যে আমাদের সমাজ থেকে এবং সরকার থেকেও অনেকটা এগিয়ে আছে তার আরও একটি পরিচয় পাওয়া গেল

ভ্রূণনাশ বৈধ করণে। ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, গোহত্যার মতো জঘন্য পাপ বলে ঘোষণা করেছেন একে শাস্ত্রকাররা শত শত বছর ধরে। অথচ কত অন্যায়াসে এই আইন পাস হয়ে গেল ক'মাস আগে। মেয়েদের হাতে এবার সেই নিরঙ্কুশ অধিকার এসে গেল যাতে তাঁরাই স্থির করতে পারবেন যে সন্তানের জন্ম তাঁরা দেবেন অথবা দেবেন না। এ নিয়ে ভয় ভাবনার শেষ নেই এবং সবটাকে অমূলক ভয় বলে উড়িয়েও দেওয়া যায় না। তবু মনে হয় পশ্চিম বাংলার মেয়েরা এই কঠিন দায়িত্ব বহনের পক্ষে অযোগ্যা নন। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় দেখলাম যে ভ্রূণমোচন বৈধকরণের পর থেকে কলকাতায় যে-ক'টি হাসপাতালে এর ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে যাঁরা এই সাহায্যের জন্য আসছেন তাঁদের মধ্যে শতকরা ৯৫জনই বিবাহিতা ও তিনের অধিক সন্তানবতী এবং অধিকাংশই দারিদ্র্যজর্জরিতা। দায়িত্বজ্ঞানহীন উচ্ছৃঙ্খলতার ফলভাগী হয়ে এসেছে এমন মেয়ের সংখ্যা কম। অবশ্য সে জাতীয় জীবনযাত্রায় যারা অভ্যস্ত তারা বেশির ভাগ প্রাইভেট নার্সিং হোমের শরণাপন্ন হয়। তবু এই কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় যে আমাদের দেশে শিক্ষিতা-নাতিশিক্ষিতা-অশিক্ষিতা নির্বিশেষে অধিকাংশ মেয়ের মধ্যেই প্রাচীন ঐতিহ্যবাহিত একটি স্থৈর্য, একটি আত্মসম্মানবোধ এখনও এতটা প্রবল রয়েছে যা এই ভয়ানক ক্ষমতার অপপ্রয়োগ হতে তাঁদের রক্ষা করবে। তবে বলা বাহুল্য এর ফলে 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষের' অনেক অবিচার তাঁরা আর মাথা পেতে নিতে বাধ্য থাকবেন না। তাছাড়া বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন প্রণয়ন হওয়াতে যেসব মেয়েদের পক্ষে বিবাহিত জীবন যন্ত্রণার নামান্তর তাঁদের সামনে শাড়িতে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরান ছাড়াও বাঁচবার একটা পথ খুলে গেল।

একদিকে বিজ্ঞানের কল্যাণে প্রাকৃতিক কিছু নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়েছেন মেয়েরা। অন্যদিকে শিক্ষায় অধিকার আরও ব্যাপক হয়েছে বলে এবং কিছু ন্যায়সঙ্গত আইন প্রণীত হবার ফলেও পশ্চিমবাংলার মহিলা সমাজের আত্মসচেতন অংশটি নতুন নতুন ক্ষেত্র খুঁজে নিচ্ছেন আত্মপ্রকাশের। সবচেয়ে বেশি আগ্রহ অবশ্য দেখা যায় আর্থিক স্বাধীনতা লাভের দিকে। অর্থোপার্জনের দিকে যাঁরা মন দেন তাঁদের অধিকাংশেরই প্রয়োজনের তীব্র তাগিদ আছে, কেউ কেউ হয়ত আরও একটু আর্থিক স্বাচ্ছল্য চান, আবার এমনও অনেক আছেন যাঁরা বৈচিত্র্য, স্বাধীনতা অথবা আত্মপ্রকাশের জন্যই একটা কিছু কাজ বেছে নেন। উদ্দেশ্যও যেমন বিচিত্র, আজকাল মহিলাদের কর্মক্ষেত্রগুলিও হয়েছে তেমনি অভিনব। পঁচিশ বছর আগেও জীবিকার ব্যাপারে মেয়েদের আনাগোনার ক্ষেত্র ছিল সীমিত। ক্ষেতখামার খনিতে এক শ্রেণীর মেয়েরা চিরকালই কাজ করেছে, আজও করছে, তাদের জীবনে বৈচিত্র্য, স্বাধিকার, আত্মস্ফুরণ ইত্যাদি শব্দগুলি আজও বাহুল্য। তবে মধ্যবিত্ত মেয়েদের জীবিকা অর্জনের নব নব পথ খুলে যাচ্ছে। আগে ভদ্র মতো জীবিকার জন্য অধিকাংশ মধ্যবিত্ত মেয়েই যেতেন শিক্ষকতায়, কেউ কেউ চিকিৎসা ব্যবসায়ও গ্রহণ করতেন। ধাত্রী এবং সেবিকার কাজও নিতেন স্বল্পশিক্ষিতারা অনেকে। টেলিফোন অফিসেও কিছুকাল যাবৎ কাজ পেয়ে আসছিলেন অনেক মেয়ে, তবে এ কাজে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজের মেয়েদের প্রাধান্য ছিল। এই তো কয়েকটা মাত্র পথ খোলা ছিল তখন। তুলনায় বর্তমান কালে মেয়েদের বিচরণ ক্ষেত্র কি অবাধ! ওকালতী, জজীয়তী, হাকিমী, মন্ত্রীত্ব কোনটাই বা বাদ গেছে? গত পঁচিশ বছরের মধ্যে পশ্চিমবাংলাতেই রাজ্যপালের পদেও এসেছিলেন একজন মহিলা, যদিও অবশ্য মুখ্যমন্ত্রিত্বের পাশ ঘেঁসতে পারেননি। তাঁরা কেউ। যাঁদের দেখলে এখনও লোকে অবাক হয় তাঁরা হলেন মেয়ে-পুলিশ, এনজিনীয়র, আর্কিটেক্ট, বিমানচালিকা ইত্যাদি। কিন্তু চারুহাসিনী স্বাগতকারিণী (receptionist) ভিন্ন অভিজাত একটি অফিস অথবা প্রিয়দর্শিনী সেবিকা (air hostess) ভিন্ন বিমান আজ আর কেউ কল্পনাই করতে পারেন না। শিক্ষা-বিভাগের প্রাথমিক এবং প্রাক্-প্রাথমিক (pre-primary) স্তরগুলিও ক্রমে মেয়েদের হাতে এসে পড়ছে সবদেশে, এ দেশেও। সেই সঙ্গে চাকুরীজীবিনী মায়েদের সন্তান পালন করবার জন্য শিশুপালনাগারগুলিও (creche) আস্তে আস্তে মেয়েদের চেষ্টাতেই গড়ে উঠছে এই শহরে। কোনো কোনো কারখানাতেও মহিলাকর্মী বিশেষ ভাবে পছন্দ করা হয়, যেমন কিনা রেডিও কি ঘড়ি তৈরির কারখানায়। অবশ্য

ঘাড়ি পশ্চিমবাংলায় এখনও তৈরি হচ্ছে না। তবে সেলাই কল তৈরির কারখানায় মেয়েদের নেওয়া হয়। একঘেয়ে এবং সেজন্যই ক্লান্তিকর কাজেও মেয়েরা নাকি বেশি ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে থাকেন। তবে পুরনো ধরনের কাপড়ের কল, চটকল ইত্যাদিতে মেয়েদের চাহিদা নাকি কমে যাচ্ছে। তার কারণ হিসেবে বলা হয় যে মেয়েরা ছুটি বেশি নেন, তাছাড়া ভারবহন ইত্যাদি ব্যাপারে পুরুষের সমকক্ষ নন তাঁরা। অন্যদিকে অফিসের টাইপিস্টের কাজ, টেলিফোন অপারেটরের কাজও আবার মেয়েদের দখলেই চলে যাচ্ছে। পোস্ট অফিসে এবং ব্যাঙ্কেও কয়েকটি চেয়ারে বিষণ্ণ নারী মুখ আজকাল দেখতে পাওয়া যায়। তবে ব্যবসায় বাণিজ্যে এ রাজ্যের মেয়েরা খুব তেমন কৃতিত্বের পরিচয় দেননি; অবশ্য বাঙালী পুরুষরা তো গর্ব করেই বলে থাকেন যে ওটা বাঙালীর ধাতে সয় না। গুজরাটি মহিলাদের মতো অত দক্ষ না হলেও কিছু কিছু ব্যবসায়ে বাঙালী মেয়েদের এখন দেখা যাচ্ছে বটে, প্রধানত 'অন্নপূর্ণা' জাতীয় রেস্টুরাণ্টের ব্যবসায়ে কিংবা পোশাক পরিচ্ছদের ব্যবসায়ে। তাছাড়া সাজসজ্জা, চুলবেঁধে দেওয়ার ব্যবসাটাও মেয়েরা বেশ ভালোই আয়ত্ত করছেন।

ব্যবসায়ের কথা যখন উঠলই তখন মেয়েদের আদিমতম ব্যবসায়ের প্রসঙ্গটা একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। এই একটি ব্যবসায় যার শ্রীবৃদ্ধি হলে সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হয় এমন কথা বলা কঠিন। তবে সমাজের বিশেষ বিশেষ সংকটজনক অবস্থায় এই ব্যবসাও যে ফেঁপে ফুলে ওঠে সে প্রবণতাটা সব দেশেই লক্ষ করা গেছে। বাংলাদেশে তেমন একটা অবস্থা এসেছিল চল্লিশের দশকে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, অভাব, অনটন, কালো বাজার, কাঁচা টাকা, দাঙ্গা ইত্যাদির মলিন নিষ্ঠুর পরিবেশে বাংলার বহু ভদ্রঘরেও মধ্যবিত্ত নীতিবোধ শিথিল হয়ে গিয়েছিল। সেই ভয়াবহ অবস্থা এখন অনেকটাই কেটে গেছে বটে কিন্তু তার কিছু বীজ ছড়িয়ে রয়েছে দেশের মাটিতে। লাইসেন্স নিয়ে সোজাসুজি যারা দেহের বেসাতি করে তারা ছাড়াও ঐ লাইনে আরও বহু চোরা কারবারি ঢুকে পড়েছে। এক সময়ে ম্যাসাজ ক্লিনিকে কলকাতা ছেয়ে গিয়েছিল, এখন শুনি কিছুটা কমেছে। তবে 'হাফ গেরস্ত' মেয়ে এখনও নাকি সুলভে মেলে, ঠিক মতো খোঁজ করতে পারলে—এবং তারা সবাই নিম্নবিত্ত সমাজের নয়। এদের মধ্যে নাকি ইস্কুল কলেজের ছাত্রী, নানা ধরনের স্বল্প-আয় সংসারের মেয়ে, ভাগ্য-সন্ধানী মেয়েরাও আছে, ঘরের বৌরাও আছে। এক ধরনের হোটেলে নাচগান, নিঃসঙ্গ পুরুষকে সঙ্গদান ইত্যাদি কাজের জন্যও এইসব মেয়েদের পাওয়া যায়। অর্থসামর্থ্যের বিচারে আরও যারা একটু ওপরে সেই সমাজেও আর এক ধরনের দেহ ব্যবসায় দেখা যায়। সংসারে মোটামুটি আর্থিক স্বাচ্ছল্য থাকলে, মেয়েরা শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে আত্মনির্ভর হতে পারলে এবং মেয়েদের প্রতি যেসব সামাজিক অবিচার হয়ে থাকে সেগুলি দূর হলে এ ব্যবসায়ের প্রসার কমবে এরকম একটা আশা করে থাকেন সমাজ সংস্কারকরা। কিন্তু অতি ধনী দেশগুলির দিকে তাকালে এই ভুল ভেঙে যাবে। আমাদের দেশেও এ জাতীয় একটি দুশ্চিন্তাজনক ঝোঁক সমাজের কোনো কোনো স্তরে অল্পবিস্তর দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এই সমস্যাটা এত বড় এবং এর এত দিক আছে বিবেচনা করার মতো যে এর আলোচনা এক অনুচ্ছেদে শেষ করা যায় না। তবে মনে রাখা ভালো যে নারীপ্রগতির সঙ্গে এই ব্যবসায়ের প্রসারের কোনো বিপরীতমুখী সম্পর্ক (inverse co-relation) তো দেখা যায়ইনি বরং দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করি যে নারী মুক্তির ফলে যৌন সম্পর্ক শিথিল ও অবাধ হবে এরকমটা যেন স্বাভাবিক বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে পশ্চিমে এবং এ দেশেরও কোনো কোনো মহলে। নারীর মূল্য, নারীর আত্মসম্মানবোধ আরও বাড়বে বলেই কি আমরা স্বাধিকার দাবী করিনি? নিষ্ঠুর জীবন সংগ্রামে নেমে কিছু কলঙ্কময় অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে বাধ্য হতে পারেন কোনো মেয়ে। তার জন্য তাকে একঘরে করারও দরকার নেই আবার স্ত্রী স্বাধীনতার নামে সমস্ত সামাজিক বাধাবন্ধন হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়ার কি দরকার তাও বুঝি না। একেও নিশ্চয়ই মেয়েদের বা সাধারণভাবে সমাজের প্রগতি বলব না। বোধি, চিত্তবৃত্তি ও সামাজিক ব্যবহারের উপর যে স্বাধিকারবোধ যথেষ্ট সংযম আনে না সে স্বাধিকার অর্জন করার সার্থকতা কি এ প্রশ্ন জাগতেই পারে। অবশ্য জগৎ জুড়ে যে উচ্ছৃঙ্খলতা

এসেছে তার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারবে ভারতবর্ষ বা পশ্চিমবাংলার মেয়েরা এত বড় প্রত্যাশাও হয়ত করতে পারি না। তবু আশা করতে দোষ কি যে নারীর স্বাধিকার এখনই এদেশে স্বৈরাচারে পরিণত হবে না কারণ যেতে যেতেও চিরাগত মূল্যবোধের সম্পূর্ণ অবক্ষয় আজও ঘটেনি!

এ আশা অবাস্তব নয়। কারণ সামাজিক ও প্রাকৃতিক বন্ধন যত শিথিল হচ্ছে ততই অসংখ্য মেয়ের মধ্যে সামাজিক কর্মপ্রেরণা, সৃজনশীলতা, অজানাকে জানবার আগ্রহ, দুর্জয়কে জয় করবার (সে শুধু দুর্জয় পুরুষ হৃদয় নয়) উন্মাদনা প্রকাশ পাচ্ছে। সুন্দর কিংবা মহৎ কিছু কর্মের ভিতর দিয়ে যদি সুস্থ আত্মপ্রকাশের সুযোগ আসে তাহলে অনেক আবিলতা আর ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে থাকা সহজ হবে। সঙ্গীতচর্চা, নৃত্যচর্চা, শিল্প কলার চর্চা—এগুলি নতুন নয়। তবে এর যে ব্যাপকতা এবং বৈচিত্র্য দেখতে পাই সেটা নতুন। ঘর সাজানো, পুষ্পরচনা (ikebana) নানা দেশী-বিদেশী রান্না শেখা—এসব অভিনব বটে। অর্থাৎ সংসারের শ্রীবৃদ্ধির দিকেও নতুন করে নজর যাচ্ছে মেয়েদের। কারণ অধিকাংশ মেয়েই এখনও আসল তৃপ্তিটুকু ঐ সংসারের ভিতর দিয়েই পেতে চান এবং মনে হয় আরও বহুদিন চাইবেন। তবু সেই সঙ্গেই জ্ঞানচর্চায়, সাহিত্যকর্মে, শিল্পসাধনায়, রঙ্গমঞ্চে, চলচ্চিত্রে ও নানা ধরনের কলাচর্চায় আত্মপ্রকাশ করে আনন্দ পেতে ও দিতে উৎসুক আজকের অসংখ্য মেয়ে। কেউ কেউ এখনও প্রত্যাশা করেন বটে যে পুরুষের এই বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেও মেয়েরা যেন কিছু বৈশিষ্ট্য বজায় রাখেন তাঁদের আত্মপ্রকাশে। দর্শন বিজ্ঞানের চর্চায় তা যদি না সম্ভব হয় অন্তত সাহিত্যে শিল্পে যেন মেয়েলী স্পর্শটুকু থাকে। এ প্রত্যাশা কতদূর সমর্থনযোগ্য জানি না তবে অবস্থা যা দেখছি তাতে মনে হয় প্রত্যাশা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা কম। নারী পুরুষের কিছু বিশিষ্ট ভূমিকা আছে বটে সমাজে কিন্তু সেখানে সে ধরনের কর্মবিভাগ নেই, যেসব ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষ (তিনি স্ত্রীই হোন আর পুরুষই হোন) নিজের নিজের ক্ষমতা আর রুচি অনুযায়ী সাধনক্ষেত্র খুঁজে নেন সেখানে মহিলা জনোচিত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা বোধহয় কঠিন এবং অপ্রয়োজনীয়।

যে দেশের মহিলারা অসূর্যম্পশ্যা ছিলেন চিরকাল, যে শহরের মেয়েরা এ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও ইস্কুল কলেজে পড়তে যাওয়ার জন্য কখনও নিন্দা, কখনও বিস্ময় আকর্ষণ করতেন, এমন কি আজও যেখানে বহু মেয়েই নিজের ভালো মন্দের ভাবনা পুরুষ সমাজের (পিতা, স্বামী, পুত্র) হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত, যাদের হয়ে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছিলেন, "নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার, হে বিধাতা?" সেই দেশের সেই মেয়েদের মধ্যেই একটি সম্পূর্ণ নতুন উন্মাদনা লক্ষ্য করে আমি আনন্দিত, বিস্ময়ে অভিভূত হই। বাঙালী মেয়েদের জয়যাত্রার এটি একটি প্রতীক। তাই এর উল্লেখ করে আমার এই নিবন্ধ শেষ করব।

হিমালয় এদেশের আশ্রয়হীনা, স্বামী পরিত্যক্তা, লাঞ্ছিতা, বঞ্চিতা মেয়েদের চিরদিন আশ্রয় দিয়ে এসেছে। সমাজ নির্মম অকৃতজ্ঞতায় যাদের আবর্জনার মতো সরিয়ে দিত সেই মেয়েরা সান্ত্বনা খুঁজতেন হিমালয়ের তীর্থে তীর্থে। আমাদের সেই পিতামহীরা কি ভাবতে পেরেছিলেন যে একদিন তাঁদেরই ঘরের কন্যারা আসবে হিমালয়ে দুর্গমতর লক্ষ্যের সন্ধানে; হাতে জপের থলি নিয়ে নয়, তুষার কুঠার নিয়ে; পায়ে থাকবে তুষারক্ষেত্রে অবিচল পদক্ষেপে চলবার জন্য কাঁটা লাগানো বুট; তারা আসবে বিজয়িনীর ভঙ্গিতে, পরাজিত আত্মসমর্পণের রূপে নয়! যে রাধানাথ শিকদারের গর্বে বাঙালিরা গর্বিত ছিলেন বহুকাল আজ আর তাঁর নাম বিশেষ শোনা যায় না। ১৯৫৩ সালে তেনজিং এডমান্ড হিলারীর সঙ্গে এভারেস্ট বিজয়ের সম্মান অর্জন করার পর হঠাৎ এ্যাডভেঞ্চারের এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল বাঙলার সামনে। দার্জিলিঙে সরকারী উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হোলো Himalayan Mountaineering Institute প্রতি বৎসর সেখানে সারা ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েরা পাহাড়ে চড়া শিখতে আসেন। অবশ্য এমনতর শিক্ষাকেন্দ্র ভারতবর্ষে

আরও আছে। তবে দার্জিলিঙে তেনজিং থাকায় একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। এই শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা পেয়ে বাঙালী কন্যারাও আজ পর্বতশৃঙ্গ জয় করতে বার হয়েছেন। প্রাণও দিয়েছেন কয়েকটি দুঃসাহসিকা মেয়ে। প্রথম এই সম্মান অর্জন করেন অণিমা সেনগুপ্ত। তিনি অবশ্য কোনো অভিযানে যাননি। এই সাহসিকা শিক্ষয়িত্রী স্কুলের ছুটির সময়ে গিয়েছিলেন পর্বতারোহণ শিখতে। ১৯৭০ সালে লাহুল অঞ্চলে ২০,১৩০ ফিট একটি পর্বতশৃঙ্গ বিজয় করে ফিরবার সময়ে তুষার প্রবাহে প্রাণ হারান সুজয়া গুহ আর কমলা সাহা। জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য জ্ঞান করতে পেরেছে যে মেয়েরা তাদের স্মৃতিরক্ষার জন্য কোনো আয়োজন হয়েছে কি? তাছাড়া সার্থক অভিযানের কীর্তি অর্জন করেছেন যে কন্যারা তাঁরাই বা দেশের কাছ থেকে কতটুকু সহায়তা পেয়েছেন? ১৯৬৭ সালে গাড়োয়াল অঞ্চলের রোণ্টি শৃঙ্গ আরোহন করতে যান আটটি বাঙালী মেয়ে, শ্রীমতী দীপালী সিংহের নেতৃত্বে। ১৯,৮৯৩ ফিট উঁচু এই শৃঙ্গে জাতীয় পতাকা স্থাপন করে এসেছেন শ্রীমতী স্বপ্না মিত্র। তারপর থেকে এ-জাতীয় অভিযান আরও কয়েকবার হয়েছে, অভিযাত্রিনীরাই সাহসে ভর করে পুরুষ অভিভাবক বিনা যাত্রা করেছেন। কলকাতায় পর্বতারোহিণী মেয়েদের একটি সার্থক-নামা প্রতিষ্ঠান রয়েছেঃ "পথিকৃৎ"। শাস্ত্র-সমাজের যূপে বলি হোত যে মেয়েরা, যে দেশে সহমরণ ছিল বিধবার সসম্মানে আত্মরক্ষার উপায়, সে দেশের মেয়েরা আজ হিমালয়ের বুকে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে চলতে পারছেন, "আমরা হার মানি নি"। 'অবলা'র দেশে এর চেয়ে বড় আর কি নজীর তুলে ধরব প্রগতির? তবু ভুলিনি যে দেশের সব মেয়েকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা, সেও এক Himalayan task, হিমালয় জয় করার মতো কঠিন কাজ। সেই দুর্গম বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে আরও কতকাল লাগবে?
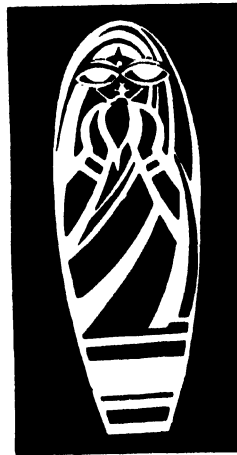
পশ্চিমবাংলায় জনস্বাস্থ্যের প্রচুর উন্নতি হয়েছে, মশার বংশ ধ্বংস হচ্ছে, ম্যালেরিয়ায় আজ আর মানুষ মরে না। মহামারী কলেরা, বসন্ত, রোগের প্রাদুর্ভাব কমছে, রোগের প্রতিষেধক ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়েছে। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটেছে, কিন্তু এখনও এই চিকিৎসা শহরকেন্দ্রিক হয়ে রয়েছে। গ্রামের চিকিৎসার সুযোগ বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের কাজ আরও দ্রুততর হওয়া অত্যাবশ্যক।

পশ্চিমবাংলায় নাগরিকদের গড় আয়ু অনেক বেড়েছে, মৃত্যুর হার ক্রমশ কমছে, কিন্তু জন্মের হার ততটা কমছে না,

জনস্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা

প্রফুল্লরতন গঙ্গোপাধ্যায়

বরং ক্রমবর্ধমান হার অব্যাহত থাকছে। পরিবার সীমিত করার উদ্যোগও ততটা ফলপ্রসূ হচ্ছে না।

এই বাস্তব তথ্য ও সত্যের মুখোমুখি আমরা। পশ্চিম-বাংলায় গত দুই দশকে ১৯৫১ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে দুই কোটির বেশি মানুষ বেড়েছে। আজকের পশ্চিমবাংলায় জন-স্ফীতি ও জনস্বাস্থ্যের বিবিধ সমস্যা ও সংকটে তাই আমরা পীড়িত। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে আমাদের প্রচণ্ড অভাব, দারিদ্র্য ও বেকারী। তাই সংকটের প্রতিকারের জন্য রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকর্মকে একীভূত করে রাজ্যবাসীর জীবন ও জীবিকার উন্নতিতে নিযুক্ত হচ্ছে, সম্পদ ও সমৃদ্ধি সৃষ্টির বিরাট আয়োজন হয়েছে। ফেলে আসা ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা, সাফল্য ও ব্যর্থতার ভিত্তিতে নতুন করে রাজ্যের অধিবাসীদের স্বাস্থ্য ও শিশু কল্যাণ, পরিবার পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে। সর্বোপরি উৎপাদনমুখী গ্রাম্য শিল্প গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে স্বাবলম্বী নাগরিক গড়ে তোলার কাজও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। আধুনিক চিকিৎসাকেও গ্রামমুখী করে তোলার কাজে হাত পড়েছে। তবুও আমাদের চিকিৎসকদের বা স্বাস্থ্যকর্মীদের

মনোভাবে সেই ওলট-পালট চেহারাটা দেখছি না। গাঁয়ের মানুষের মনেও বিশ্বাস ও সাহস গড়ে উঠছে না।

জনস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার সামগ্রিক সাফল্যের চাবিকাঠি এখনও গ্রামবাসীর হাতে। তাদের সঙ্গে নিয়েই তাদের উন্নতির কাজ চালাতে হবে। এখানে সরকারী প্রয়াসের সঙ্গে গ্রামের মানুষের শুভ প্রয়াস যুক্ত না হলে কোনও আশাপ্রদ সাফল্য আসবে না। তাই রাজ্যে গ্রামকে ভিত্তি করে জনস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্প্রসারিত হওয়া অত্যাবশ্যক। তাহলে রাজ্যের স্বাস্থ্যচিত্র সুন্দর হয়ে উঠবে, জনস্ফীতির সংকট মোচনের প্রয়াসও সফল হবে। কিন্তু আমরা সঠিক পথে চলছি কী? তাই প্রয়োজন উপযুক্ত সমীক্ষা, সাফল্য ও অসাফল্যের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন।

প্রথমে, জনস্বাস্থ্যের কথাটিই ধরি। বাংলাদেশে ম্যালেরিয়ায় প্রাণ নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। কাজে উৎসাহ বা শক্তি মানুষের ছিলো না। মশার মৃত্যুর হার ছিল প্রচুর। আমরা জানি, ম্যালেরিয়া কি রকম গোপনে ধীরে ধীরে মানুষকে জীবনমৃত করে রাখে। তাই শহর ও গাঁয়ের ম্যালেরিয়া পীড়িত মানুষকে উদ্ধার করার জন্য দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই প্রচেষ্টা চলেছে। কার্যত পশ্চিমবাংলার এই ভয়ংকর ব্যাধি থেকে মানুষ আজ মুক্তি পেয়েছে। জাতীয় ম্যালেরিয়া প্রকল্প এই রোগটিকে আয়ত্তে এনেছে। ১৯৪৮ সালে ম্যালেরিয়ায় প্রতি দশ হাজার লোকে ৩৬জনের মৃত্যু হত, ১৯৬৯ সালে সেই হার কমে গিয়ে হল দশ লক্ষে মাত্র একজন। ম্যালেরিয়ার প্রভাব প্রকট নষ্ট করার করার জন্য মশার বংশ ধরার কাজ এখনও চলছে। গ্রামে গ্রামে যকৃৎ-পিলেতে পেটভর্তি মানুষ আমরা দেখতে চাই না, ম্যালেরিয়ার থেকে দেশবাসীর মুক্তিকে স্থায়ীরূপ দেওয়ার চেষ্টা এখনও অব্যাহত।

তেমনি আমরা অন্যান্য কঠিন, সংক্রামক রোধের প্রতিকারে সরকারী ও বেসরকারী সাফল্যের চিত্র তুলে ধরতে পারি। কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা প্রভৃতি ছোঁয়াচে রোগ প্রতিরোধে ব্যাপক আয়োজন হয়েছে। প্রতিরোধমূলক কর্মসূচীর রূপায়ণের ফলে এইসব রোগের প্রকোপও কমছে। ১৯৪৭ সালে, দেশ স্বাধীন হওয়ার বছরে বসন্ত রোগে এই রাজ্যে মৃত্যুর হার ছিলো এক লক্ষ পিছু ৫৭জন, ১৯৭০ সালে এই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে প্রতি দশ লক্ষে মাত্র ৩জন। তেমনি কলেরা, বসন্তের টিকা দান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কর্মসূচীর ফলে কলেরায় মৃত্যুর হার বেশ কমে গেছে।

যক্ষ্মার প্রতিরোধ অভিযান সফল হয়েছে। এখন চিকিৎসার গুণে, হাসপাতাল গড়ে ওঠায় রাজ্যে যক্ষ্মার মৃত্যুর হার কমে গেছে। এই রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসার জন্য রাজ্যে ৫৩টি চেস্ট-ক্লিনিক সহ রোগীর বাড়ী-বাড়ীতে চিকিৎসা ও ওষুধ সরবরাহের ইউনিট গঠিত হয়েছে। এছাড়া ১৬টি দল বিসিজি টীকা দিচ্ছেন। বড় বড় কয়েকটি হাসপাতালে শুধু এই রোগীরই চিকিৎসা হয়ে থাকে যেমন যাদবপুর, কাঁচড়াপাড়া ইত্যাদি। যক্ষ্মা রোগমুক্তদের পুনর্বাসন ও রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য ডিগরীতে একটি অরোগ্যোত্তর কেন্দ্র রয়েছে। যক্ষ্মা মুক্ত রোগীকে সমাজে, জীবিকার ক্ষেত্রে সার্থক নাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে আরও উদ্যোগ চাই, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার উদ্যমে আরও সমন্বয় দরকার।

কুষ্ঠ রোগের প্রতিরোধে সরকারী আয়োজন হয়েছে। কিন্তু এই জীবনীশক্তি নাশকারী রোগের প্রতিরোধের ব্যবস্থা ও চিকিৎসার সুযোগ আরও সম্প্রসারিত হওয়া আবশ্যক। রাজ্যে অবশ্য ৭টি প্রাথমিক, ১৪টি তত্ত্বাবধানকারী এবং ১০৫টি সহায়ক কুষ্ঠ প্রতিরোধ সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এর আগে ২টি নতুন কুষ্ঠ প্রতিরোধ সংস্থা হয়েছে। বাঁকুড়া জেলার গৌরীপুরে কুষ্ঠ কলোনীতে ৫৩০জন রোগীকে পৃথকীকরণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কুষ্ঠ রোগীকে রোগমুক্ত করা, তাকে সমাজে, কর্মজীবনে আবার পুনপ্রতিষ্ঠার ব্যাপক উদ্যোগ প্রয়োজন। এই চিরদুঃখী মনুষের দুঃখ মোচনে আরও কিছু কী

আমরা করতে পারি না? নিশ্চয় পারি। এজন্যে চাই যৌথ উদ্যোগ, মানসিকতার পরিবর্তন।

আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সাধারণের সহজলভ্য করার প্রয়াস গত পঁচিশ বছর বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি, শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি, চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি, আহার্য বা ওষুধপত্রের তুলনামূলক উন্নত ব্যবস্থার মাপকাঠিতে শুধু নয়, মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতার তীব্রতা চিকিৎসা গ্রহণও এই সুযোগকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার তৎপরতা ও আগ্রহই জনস্বাস্থ্য প্রকল্পের সাফল্যের চিত্র তুলে ধরেছে। স্বাধীনতা অর্জনের দিনে আমাদের রাজ্যে হাসপাতাল গুলোতে মোট শয্যার সংখ্যা ছিলো ১৭৫০০টি (সরকারী হাসপাতালে ১৩ হাজার)। বর্তমানে রাজ্যের হাসপাতালগুলোতে মোট শয্যার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪০ হাজারের বেশী। অর্থাৎ ২৫ বছরে ২৩ হাজার শয্যা বেড়েছে। জনস্ফীতি বা চিকিৎসা প্রার্থীর তুলনায় হাসপাতালের আউটডোরে বা ইনডোরে চিকিৎসার সুযোগ আরও বাড়ান দরকার এটা সরকার বা বেসরকারী জনমত উপলব্ধি করছেন। কিন্তু এই সম্প্রসারণ তো চাহিদা অনুযায়ী হয় না, বা হোতে পারে না। অবশ্য বর্তমানে এই রাজ্যে দশ হাজার মানুষ পিছু ৯টি শয্যা রয়েছে।

নীচের তথ্য-তালিকার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার আগে আমাদের জানা দরকার যে, যক্ষ্মা রোগীদের জন্য হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ৯৩১ থেকে বেড়ে ৫ হাজার হয়েছে, কুষ্ঠ রোগীর শয্যা সংখ্যা ৮৫৮ থেকে বেড়ে ২৪৪৭ হয়েছে, মানসিক চিকিৎসার জন্য শয্যা সংখ্যা ৮৭০ থেকে ১৫০০ হয়েছে। এছাড়া, ছোঁয়াচে ও সংক্রামক ব্যাধির জন্য বেলেঘাটায় বড় হাসপাতাল হয়েছে; কল্যাণী ও ধুবুলিয়ায় নতুন বড় হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে, কলকাতা ও বাঁকুড়ায় ক্যান্সার ও ঐ ধরনের রোগের চিকিৎসা চলছে। বেসরকারী হাসপাতালগুলোকেও উন্নত করা হয়েছে, জেলা, মহকুমা হাসপাতাল, ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে নতুন নতুন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এক কথায় পশ্চিম বাংলায় স্বাস্থ্যহীনতা, রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসার জন্য কার্যক্রমের রূপায়ণের ধারা দ্রুত ফলপ্রসূ হচ্ছে। কর্মচারী রাজ্যবীমা হাসপাতালে বা চিকিৎসা প্রকল্পের অধীনে প্রায় ৩৫ লাখ মানুষ বিনামূল্যে আধুনিক চিকিৎসা ও ওষুধের সুযোগ পাচ্ছেন। তবুও অনেক কিছু এখন বাকী।

গত ২৫ বছরে চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার এই রাজ্যে বহু সম্প্রসারণ ঘটেছে। গবেষণা ও উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আধুনিকতম ব্যবস্থা হয়েছে।

বর্তমানে এই রাজ্যে মোট ২৫ হাজারের বেশী আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যায় ডিগ্রীধারী চিকিৎসক আছেন। তার মধ্যে সরকারী, আধা-সরকারী ও ই-এস-আই হাসপাতালে নিযুক্ত রয়েছেন প্রায় ৫ হাজার চিকিৎসক। আর বাকীরা প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করছেন। আজকে মূল সমস্যা হোল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পুরোপুরি সামাজীকরণ; গরীব, দরিদ্র নিরক্ষর উপেক্ষিত মানুষের জন্য গ্রামে চিকিৎসা ও চিকিৎসকের স্বল্পতা দূর করা। ওষুধপথ্যের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ সরকারী দায়িত্ব আনা। তাহলে মধ্যবর্তী লোকের দাঁওমারা স্বভাব দূর হবে, ঠিকাদারী দুর্নীতি লোপ পাবে এবং সুচিকিৎসা সর্বত্র সমান ভাবে পাওয়া সহজসাধ্য হবে। কিন্তু রাজ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থায় এক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবাদী, সুযোগ সন্ধানীর কারসাজি এখনও অব্যাহত। আশা করব, সরকার এই 'পাপচক্র' হাত থেকে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে রক্ষা করবেন, সকলের কল্যাণে এই ব্যবস্থা পরিচালিত হবে। তেমনি চিকিৎসা ও চিকিৎসকের সুযোগ-সুবিধার পক্ষে যেসব বাধা আছে তা দূর করার জন্য বলিষ্ঠ নীতি প্রযুক্ত হবে।

একনজরে জনস্বাস্থ্য-তথ্য

	১৯৫১	১৯৬১	১৯৬৯
জন্মের হার (প্রতি হাজারে)	২১·৯	১৮·৬	১৬·৫
মৃত্যুর হার ,,	১৩·০	৬·৬	৬·৫

শিশু মৃত্যুর হার ,,	১০৯·৫	৬৪·৪	৪২·০
প্রসূতির মৃত্যুর হার ,,	৫·৯	৩·০	১·৭
বিবিধ রোগে মৃত্যুর হার			
(প্রতি হাজারে) (১) কলেরা	০·২	০·০৮	০·০৫(৬৭)
(২) বসন্ত	১·১	০·০১	০·০৩ ,,
(৩) ম্যালেরিয়া	১·৫	০·০৪	
(৪) পেটের রোগ	০·৪	০·৩	·০৫ (৬৭)
(৫) যক্ষ্মা	০·৩	০·১	০·৩৪ ,,
(৬) অন্যান্য	৯·৫	৬·১	৫·৮(৬৬)

স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য :

	১৯৫১	১৯৬১	১৯৬৯
হাসপাতাল	৩০৮	২৭৩	২৯৪
ডিসপেন্সারী	৭২৯	৫৮৮	৫১৭
স্বাস্থ্যকেন্দ্র	১০০	৫১৩	৭৮৩
ক্লিনিক	১৬০	৭০৫	৬৩৮
মোট প্রতিষ্ঠান	১২৯৭	২০৭৯	২২৩২
হাসপাতালে শয্যার সংখ্যা—	১৭১০৭	২৯০৬৭	৩৭৬২৯

স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসক :

	১৯৫১	১৯৬১	১৯৬৮
রেজিষ্টার্ড এলোপ্যাথ	১৮৮১৮	২১৩৬৫	২৪৩৭৪
(ক) এম বি বি এস	৫৪৪৩	৮২৯১	১১৬২১
(খ) লাইসেনসিয়েট	১৩১৫০	১২৮৬২	১২৫১৫
(গ) বিদেশী ডিগ্রী ও অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত	২২৫	২১২	২৩৮
(ঘ) রেজিষ্টার্ড নার্স	৩১৫৪	৫২২১	২৮৭০
(ঙ) রেজিষ্টার্ড ধাত্রী	২৯৫১	৬০১৬	৬৮১৬
(চ) রেজিষ্টার্ড হেলথ ভিজিটর	১০১	২১৩	১৭১

এই তথ্যে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে প্রগতির সাক্ষাৎ প্রমাণ রয়েছে। সরকারী তথ্যের বাইরেও রয়েছে বেসরকারী উদ্যোগ ও সেবার কার্যসূচী। আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষা, চিকিৎসার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কেন আজকে উপেক্ষিত গ্রামের দিকে নজর সরকার দিয়েছেন তার কারণ গ্রামেই শতকরা ৭৪জন লোক বাস করছেন। তাঁদের এখনও শহরে, কলকাতায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সুযোগ নিতে আসতে হয়। ফলে শহরের হাসপাতাল, কলকাতার হাসপাতালগুলোতে ভীড় বাড়ছে, এই ক্রমবর্ধমান ভীড় হ্রাস এবং সুচিকিৎসা গ্রামের মানুষের দরজায় পোঁছে দেওয়ার লক্ষ্য পূর্ণ হোলেই সত্যিকার সমাজবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

স্বাস্থ্যই সম্পদ। স্বাস্থ্য ভাল মানে, সব ভাল এই কথাটির সারবত্তা আজ আমাদের বুঝতে হবে, সেই পথে কাজ করতে হবে। কিন্তু পদে পদে বাধা, বিবিধ অসুবিধা। তাই এই কঠিন পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক অসুবিধা সত্ত্বেও আমরা এগিয়ে চলেছি, জনস্বাস্থ্যের অগ্রগতি দ্রুতগতিতে চলছে এই হচ্ছে ভরসা ও আশার কথা। কিন্তু জনস্ফীতি প্রতিরোধ করতে না পারলে আমাদের এই প্রচেষ্টা বানচাল হতে পারে। তাই পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব এতো!

॥ ছোট পরিবার সুখী পরিবার ॥

এই কয়টি কথার মধ্য দিয়ে আজকের মানুষের স্বাভাবিক চিন্তা ও প্রয়োজনীয়তা ফুটে উঠেছে। এতোকাল পরিবার নিয়ন্ত্রণ বা কৃত্রিম পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা পরিবার সীমিত রাখার ব্যবস্থা বিত্তবান, শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। কিন্তু যুগের পরিবর্তে আজকে প্রত্যেক মানুষই সীমিত পরিবারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছেন। দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, গরীব ও বিত্তবান সকল মানুষই বুঝেছেন জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি সমাজ কল্যাণ ও সুখী সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনের পথে একটা বিরাট বাধা। এখানেই পরিবার পরিকল্পনার প্রাথমিক সাফল্য। এই পরিকল্পনা কার্য করার দিন থেকে একটানা প্রচারের মধ্য দিয়ে পশ্চিম বাংলার সব স্তরের মানুষ বুঝতে শিখেছেন যে, সুখ চানতো পরিবারকে সীমিত রাখতে হবে; কিন্তু কৃত্রিমভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে গ্রামবাংলায়, কলকাতার বস্তী অঞ্চলে বহু বাধা আছে। সেই বাধা অতিক্রমণেই সাফল্যের চাবিকাঠি নিহিত। কেবলমাত্র জন্মের হার বৃদ্ধিতেই লোকবৃদ্ধি ঘটে না। একথাটা বিজ্ঞানসম্মত। মৃত্যুর হার যদি বেশী হয় তবে জন্ম বেশী হলেও লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি বেশী

নাও হতে পারে। আবার জন্মের হার না বৃদ্ধি পেলেও জনস্বাস্থ্যের উন্নতির ফলে লোক বেশীদিন বাঁচে এবং মোট লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। জীবনের মান উন্নত হলে ঐ মান বজায় রাখার জন্যও সন্তানের সংখ্যা সীমিত করার প্রয়াস হয়ে থাকে। শিক্ষা, কর্মব্যস্ততা ও জীবনের উচ্চমান শহরে জন্মনিয়ন্ত্রিত করে থাকে। জন্মের হার পল্লীতেই অপেক্ষাকৃত অধিক। এছাড়া বাইরে থেকে এই রাজ্যে লোকের আগমনের ফলেও এই রাজ্যে লোকবৃদ্ধি ঘটেছে, এখনও ঘটছে।

সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মরণে রাখতে হবে যে দারিদ্রের সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রশ্ন জড়িত। পৌর অঞ্চলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে সন্তান বেশী জন্মে। বাপের জীবিকা অর্জনের কুশলতা, প্রস্তুতি যত কম, তার সন্তান তত বেশী। যে নারীর বিদ্যালয়ের শিক্ষা যত কম, তার সন্তন ততবেশী। শিক্ষা জন্ম-নিয়ন্ত্রণে বিশেষভাবে সাফল্য করে। জীবনের মান উন্নত হলেও জন্মের হার হ্রাস পায়।

আমাদের আরও কয়েকটি তথ্য ও সিদ্ধান্ত এই জনস্ফীতি সম্পর্কে মনে রাখা দরকার। এই রাজ্যে যে পদ্ধতিতে বা যাঁদের প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে জন্ম ও মৃত্যুর হিসাব, বিশেষ করে বৃহত্তর গ্রামাঞ্চলের হিসাব তৈরি হয় তা অসম্পূর্ণ। কিন্তু এই অসংশোধিত তথ্যের ভতর দিয়েও আমরা দেখতে পাই, পশ্চিম বঙ্গে জন্মের হার অতি বেশী, জনসমষ্টির প্রতি হাজারের চল্লিশ-জনের মতো শিশু জন্মে। মৃত্যুর হার কমছে।

বাল্য বিবাহ, অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও জীবনযাত্রার নিম্নমান জন্মের হার বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। জনগণনার তথ্যে পাওয়া গিয়েছে যে গ্রামাঞ্চলে নারীদের ৬২ শতাংশের ১৩ বছর পূর্ণ হবার আগেই বিবাহ হয়েছিলো। আর শহর এলাকায় বিবাহিত মেয়েদের গড় বয়স দিল ১৭। আধুনিক কালেও মেয়েদের বিয়ের গড় বয়স কম রয়েছে। অবশ্য শিক্ষিত জনগণের মধ্যে বিয়ের বয়স বেড়ে গেছে। যুবকরা স্বাবলম্বী হওয়ার পূর্বে বিয়ে করতে চায় না। আবার আজকালকার যুবকরা শিক্ষিতা কন্যা লাভের জন্যও আগ্রহী। এই অবস্থায় মেয়েদের বিয়ের বয়স বেড়ে যেতে বাধ্য। কারণ, মেয়েরাও আজকাল স্কুল-কলেজে বেশী হারে পড়ছে, কেউ কউ অর্থোপার্জনেও ব্যস্ত থাকছে। ধীরে হলেও শহর এলাকায় বিয়ের বয়স বৃদ্ধির দ্বারা জন্ম হ্রাসের হার কমছে। কিন্তু সেই পরিবেশ কী গ্রামাঞ্চলে রয়েছে? শিক্ষার প্রসার ও কুসংস্কার দূর করার মধ্য দিয়ে গ্রামাঞ্চলে বিয়ের বয়স বৃদ্ধি অন্তত বাল্য বিবাহ রোধ করার প্রচেষ্টাকে সফল করে তুলতে হবে।

১৮৭২ সন থেকে ১৯৭১ এই একশ বছরে এগারবার জনগণনা হয়েছে। গণনার ফলের দিকে লক্ষ্য করলে ১৯২১ সালের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা চলে। এই দশকে লোক বৃদ্ধি না হয়ে ১৯১১ সন থেকে প্রায় চার লক্ষ হ্রাস পেয়েছিল। ১৮৭২ সন থেকে ১৯২১ সন পর্যন্ত হ্রাস বৃদ্ধির হার অনিশ্চিত। ১৯৩১ সন থেকে ১৯৭১ সন পর্যন্ত লোক শুধু বেড়েই চলছে না, বৃদ্ধির হার ক্রমশ বাড়ছে। অবশ্য ১৯৬১ সালের তুলনায় ১৯৭১ সনে বৃদ্ধির হার কম।

রাজ্যের জনসংখ্যার চিত্র এরূপঃ ১৯৫১ সালে ২,৪৮,-১০,৩০৮। ১৯৬১—৩,৪৯,২৬,২৭৯। ১৯৭১ সালে তা হয়েছে ৪,৪৪,৪০,০৯৫। ১৯৩১-৪১ দশকে বৃদ্ধি পেয়েছিলো ২২·৯৩ শতাংশ, ১৯৪১-৫১ এই দশকে বেড়েছিলো ১৩·২২ শতাংশ। ১৯৫১-১৯৬১ এই দশকে বৃদ্ধির হার ছিলো ৩২·৮০ শতাংশ। আর ১৯৬১-৭১ দশকে বাড়তির হার ২৭·২৪ শতাংশ। প্রতি বর্গমাইল এলাকায় বসতির হার ৩৯৮ থেকে ৫০৭জন হয়েছে। ভারতে যেখানে গড় জন্ম সংখ্যার হার হোল ১৯৬১-৭১ দশকে ২৪·৫৭; সেখানে পশ্চিম-বাংলায় হোল ২৭·২৪। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে, দেশ বিভাগের ফলে পূর্ববাংলা থেকে যে বিপুল মানুষ এই রাজ্যে এসেছে তাদের আগমনে এই রাজ্যে ১৯৫১-৬১ সালে জনসংখ্যার হার অত্যধিক বেড়েছিলো। কিন্তু এই হার গত দশকে কিছু কমলেও এখনও তা বেশ বেশী।

এক নজরে আমাদের অবস্থা

	ভারতবর্ষ	পশ্চিমবঙ্গ
জন্মহার	প্রতি হাজারে ৪১ জন	প্রতি হাজারে ৪০ জন
মৃত্যুহার	প্রতি হাজারে ১৬ জন	প্রতি হাজারে ১১ জন
প্রতি বছরে অতিরিক্ত জনসংখ্যা	১৩০ লক্ষ	১০ লক্ষ

বার্ষিক অতিরিক্ত মৌলিক প্রয়োজন :

খাদ্য	১,২৫,৪৫,৩০০ কুইণ্টাল	১২,০০,০ ০ কুইণ্টাল
বস্ত্র	১৮,৮৭,৭৪,০০০ মিটার	১,৫০,০০,০০০ মিটার
বাসস্থান	২৫,০২,০০০	২,৫০,০০০
কর্মসংস্থান	৪০,০০, ০০	৩,৪৮,০০০

ক্ষুধার বিরুদ্ধে, বেকারির বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামকে সফল করতে হলে জন্মশাসন এরাজ্যে অতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। লোকবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে রাজ্যে সম্পদ সৃষ্টি হতে পারে না, হচ্ছেও না, কর্মও সৃষ্টি হচ্ছে না। বাসস্থান, শিক্ষার ব্যবস্থা করাও সম্ভব নয়।

তাই দারিদ্র্য ও অতিজনতার সংকটের মোকাবেলার জন্য চাই ছোট পরিবার। ছোট পরিবার মানে ২।৩টি সন্তান। এর বেশি যাতে না হয় তার জন্য পরিবার পরিকল্পনা অনুযায়ী কতগুলো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সীমিত পরিবারই সুখী পরিবার এবং সেখানেই পরিবারের কল্যাণ সম্ভব। কারণ, ক্ষুদ্র পরিবারে মায়েদের স্বাস্থ্য থাকে অটুট, শিশুর স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য দেওয়ার সময় থাকে যথেষ্ট, আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য সন্তানকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দেওয়া সম্ভব। তাছাড়া, পরিবারে অশান্তি কম থাকে এবং স্বামী-স্ত্রী পরস্পর সঙ্গসুখ লাভের সুযোগ পায় বেশী, স্বল্প কথায়, এই পরিকল্পনা পরিবারের সামগ্রিক সুখ ও উন্নতিতে সাহায্য করে, তেমনি মা ও সন্তানের স্বাস্থ্য বজায় রাখে। এর সঙ্গে মাতৃ ও শিশু মঙ্গল কর্মসূচীও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

এই রাজ্যে ডাক্তারদের মতে ৯০ লক্ষ যোগ্য দম্পতি পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার আওতায় পড়ে। এদের মধ্যে প্রায় ৪৪ লক্ষ দম্পতি দুই বা ততোধিক সন্তানের পিতামাতা, ২৮ লক্ষ দম্পতি ১।২টি সন্তানের পিতামাতা। কিন্তু এই ৯০ লক্ষ যোগ্য দম্পতিকে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে উৎসাহিত করা বেশ কঠিন কাজ। তাই ১৯৭৫ সালের মধ্যে জন্মের হার ২৫-এ কমিয়ে আনবার কাজ চলছে। এর জন্যে অস্ত্রোপচার, নির্বিজীকরণ জন্য স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রচার, পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার কথা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আশানুরূপ কাজ হচ্ছে কী? লুপ ব্যবস্থা, নির্বীজীকরণের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া, দম্পতিদের মানসিকতার বিচার আজ করতে হবে। অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে দেশবাসীকে মুক্তি দিতে না পারলে এই প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ সম্ভব নয়। তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ছোট পরিবার, সুখী পরিবার এই শ্লোগান রাজ্যবাসীর মনে নতুন শুভ মানসিকতা এনেছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের আদর্শের বিরুদ্ধতাও আছে। মূলত চারটি কোন থেকে এই বিরোধিতা আসছে—প্রথাগত, ধর্মীয়, সমাজবাদী ও জাতীয়তাবাদী মনোভাব থেকে। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে কৃত্রিম উপায়ে জন্ম নিরোধ একটি নৈতিক অপরাধ। অবশ্য এখন জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ধর্ম সম্প্রদায়ের মনোভাব অনেকখানি সহজ ও অনুকূল হয়েছে। সমাজবাদীর মনোভাব থেকে মনে হয় ওঁরা ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটিকেই পুরোপুরি অস্বীকার করেন। তাঁরা উৎপাদন পদ্ধতির চৌহদ্দির মধ্যেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা বিচার করেন। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যাঁরা জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা চিন্তা করেন তাঁরা এখনও মনে করেন, জনসম্পদ জাতির পক্ষে আশীর্বাদ। কিন্তু অর্থনৈতিক সংকট ও সমস্যার চাপে এখন প্রায় সকলেই জনসংখ্যা সীমিত রাখার মতে মত দিচ্ছেন। আজকের যুগে সন্তান দিয়েছেন যিনি, তাকে খাওয়াবেন তিনি— এই কথা ভেবে চুপচাপ বসে থাকতে পারা যায় না। বাস্তব

সত্যকে স্বীকার করতে হচ্ছে পদে পদে। সন্তান ভগবানের দান বা অদৃষ্টের লিপি বলে বসে থাকলেও আর অতি জনতার মুখে অন্ন দেওয়া চলছে না। তাই এই মানসিক বিবর্তন ও পরিবর্তন সীমিত পরিবার পরিকল্পনার পক্ষে খুব অনুকূল আস্থা এনেছে। দেশের প্রতিটি মানুষ আজ বুঝতে পারছে যে দারিদ্র্য ও ধন বৈষম্য দূর করার জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক। এই সংগে আরও মনে রাখা দরকার যে সচেতন মাতৃত্ব ব্যতীত এই পরিবার প্রকল্প কার্যকর হওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক আদর্শেই এই সচেতন মাতৃত্ব এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

আজকে নতুন যুগের প্রয়োজনে 'সীমিত সন্তান, সুখী পরিবার'—এই লক্ষ্য পূরণ অত্যাবশ্যক। গ্রামে গ্রামে এই সুখের বার্তা পেঁৗছে দেওয়ার জন্য যেমন গান, তরজা, যাত্রা, কথকতার প্রয়োজনীয়তা আছে, তেমনি প্রত্যেক গ্রামে প্রাথমিক ও বয়স শিক্ষার প্রসার একান্ত দরকার। এবার এক নজরে রাজ্যের পরিবার পরিকল্পনার তথ্য দেখে নিতে পারি।

এক নজরে পশ্চিমবঙ্গে পরিবার পরিকল্পনার অগ্রগতি

পদ্ধতি	১৯৭১-৭২ (এপ্রিল-অক্টোবর)	মোট (শুরু থেকে)
অস্ত্রোপচার :		
পুরুষ	৩৬৭৪৬	৬২২৫২৩
স্ত্রী	৬৬৬০	৮৩৬৩৮
মোট	৪৩৪০৬	৭০৬১৬১ (১৯৫৬ সাল থেকে)
লুপ :	৪৫০৩	৩০৮৮৯৩ (১৯৬৫ সাল থেকে)
প্রথাগত পদ্ধতি (পীস হিসাবে) :		
নিরোধ	২২৩৭৩৫৮	১২৮৩২০০৯
জেলী ও ক্রীম	২৭০৮৭	১৭৯৭৪৫
ডায়াফ্রাম	৭৩	১৮১০
ফোম ট্যাবলেট	৫৬৮.৪	৫৪১.৯৪
		*(১৯৬৮-৬৯ সাল থেকে)

* ১৯৬৮-৬৯ সালের আগেকার পরিসংখ্যা পাওয়া যায়নি।

১টি অস্ত্রোপচার = ৩টি লুপ কেস = ১২ জন প্রথাগত পদ্ধতি ব্যবহারকারী—এই সূত্র অনুযায়ী সমস্ত পদ্ধতিকে অস্ত্রপচারে নিয়ে এসে জেলাগুলিকে বিচার করা হয়।

এই তথ্যে অগ্রগতির যে ছবিটিই দেখি না কেন, একথা আজও স্বীকার করতে হবে যে এই প্রকল্পের সফল রূপায়ণ এখনও অনেক দূরে। জনসংখ্যার হার না কমলে, দেশের মানুষের দারিদ্র্য ঘুচবে না। তাই এই প্রকল্পকে একটি স্বাস্থ্য পরিকল্পনা হিসাবে বিবেচনা না করে, জাতির অর্থনৈতিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত প্রকাণ্ড কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। পশ্চিমবাংলায় ক্ষুধা ও বেকারিই যখন মূল সমস্যা, সেখানে পরিবার সীমিতকরণ অত্যাবশ্যক।
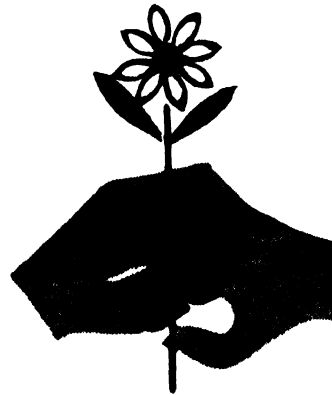
কৃষিভিত্তিক পল্লীপ্রধান বাংলার সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব প্রধানত লোককৃতি (Folklore) তথা লোক সংস্কৃতির ঐতিহ্য সংলগ্ন। গ্রাম বাংলার আর্দ্র সবুজতা থেকে বিজ্ঞান-স্পৃষ্ট আজকের আমরা বার বার সাংস্কৃতিক ভূগোলকে নাগরিক বিদগ্ধ বলয়ে স্থানান্তরিত করতে চাইলেও আত্মানুসন্ধানের অমোঘ নিয়মে প্রতিহত প্রত্যাশায় আমাদের বার বার ফিরে আসতে হয় দৃশ্যমান প্রত্যক্ষতায় লগ্ন লোকসংস্কৃতির অচ্ছেদ্য অনুষঙ্গে। সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকায়ত অধিমানসের পরিচয়ে পুষ্ট লোকসংস্কৃতির বিস্তৃত বলয়ে জাতীয় জীবনের

যথাযথ মৌলিক পরিচয় বিধৃত থাকে এবং আত্মানুসন্ধান ও আত্মসম্প্রসারণের প্রয়াসে তৎপর জাতিকে বার বার ফিরে তাকাতে হয় মূলত ঐতিহ্যসমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতির বাস্তবতায়। এই জন্যই বিশেষজ্ঞগণ জাতীয় জাগরণ ও লোকসংস্কৃতি প্রয়াসের সাযুজ্য লক্ষ্য করে থাকেন। রিচার্ড, এম, ডরমনের ভাষায়ঃ—

"The concern with folklore and the rise of a nationalistic spirit frequently coincide!"
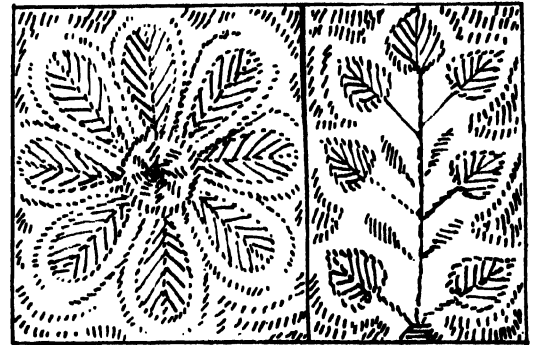
জাতীয় জাগরণের প্রচেষ্টায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যে

জাতীয় ঐতিহ্যের গৌরবময় পটভূমিকায় আত্মসম্প্রসারণে প্রয়াসী হয়ে বিশেষ ভাবে লোকসংস্কৃতি অনুশীলনে যত্নবান হয় তার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত—জার্মানী, রাশিয়া, চীন, স্পেন, জাপান, প্রভৃতি দেশ। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহ্য গৌরব ও দেশাত্মবোধের প্রেরণা এবং দেশের আসন্ন নির্মাণের আত্ম চেতনার জাতীয় অগ্রগতির পথানুসন্ধানের আয়োজন হিসাবে লোকসংস্কৃতির অনুশীলন সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাই জাতীয় ইতিহাসের অতিক্রান্ত পথের পুনর্মূল্যায়নে লোকসংস্কৃতির গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনা অপরিহার্য জাতীয় কর্তব্য।

আমাদের জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর পূর্তি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যার পাদপীঠে জাতীয় জীবনের সামগ্রিক কর্মপ্রয়াসের বৃত্তে লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত অন্বেষা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক জাতীয় কর্তব্য। ইতিহাসগত বিচারে স্বাধীনতাউত্তর লোকসংস্কৃতি পর্যালোচনায় অনিবার্যরূপে এসে পড়ে বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসের ধারাবাহিকতার কথা। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে লোকসংস্কৃতি চর্চা রাতারাতি হঠাৎ কোন নূতন পর্যায়ে সমুন্নত হয়নি। সামাজিক-ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিবর্তনের পটভূমিকায় লোকসংস্কৃতির রূপগত ও গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় এবং লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের সচেতন প্রয়াস ক্রমপ্রসারী হয়েছে কালের আবর্তে। লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসের রূপরেখা অঙ্কনে কর্তৃভিত্তিক সূত্র অনুসরণে অগ্রসর হলে তাকে সাল-তারিখের দশক-শতাব্দীর পর্ববিভাগে বিভক্ত করা কঠিন, কেননা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নবতর চেতনার সঞ্চার ঠিক সাল-তারিখের সীমারেখা অনুসরণ করে সুনির্দিষ্ট হয় না। বিষয়মুখীন বস্তুভিত্তিক বিবর্তনের স্তরানুসারে বাংলায় লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসকে মোটামুটি চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার এই চারটি স্তরকে নিম্নলিখিত রূপে কালসীমা ও পর্বনামে চিহ্নিত করা যায়ঃ—

স্তর	কালসীমা	পর্ব নাম
১	সূচনা কাল থেকে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত	ব্যক্তিগত প্রয়াসের পর্ব
২	১৮৩২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত	প্রাথমিক সংহতির পর্ব
৩	১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত	জাতীয় উদ্যোগের পর্ব
৪	১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ থেকে স্বাধীনতাপরবর্তীকাল	শিক্ষাগত শৃঙ্খলা ও বৈজ্ঞানিকোত্তর পর্ব

আমাদের পরিকল্পিত পর্যবিভাগ ও বিভিন্ন পর্বে ব্যবহৃত নামগুলির মধ্যে সমসাময়িক জীবন চর্যাগত ও লোকসংস্কৃতি চর্চাগত প্রত্যাশিত ইতিহাস চেতনা সক্রিয় থেকেছে। এই পর্ব বিভাগ ও নামগুলির মাধ্যমে যুগপৎ বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনার উত্থান-পতনের ইতিহাস উন্মোচিত হয় এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রয়াসের পটভূমিকায় লোকসংস্কৃতি চর্চার সাধারণ লক্ষণের স্পষ্ট রূপরেখা ধরা পড়ে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রধানত ইউরোপীয় ভ্রমণকারী, মিশনারী, সামরিক অধিকর্তা, সরকারী কর্মচারী, প্রাচ্য তত্ত্ববিদ, ভারততত্ত্ববিদ, নৃতত্ত্ববিদ, ভাষাতত্ত্ববিদ, প্রভৃতির উদ্যোগে আমাদের দেশে লোকসংস্কৃতি চর্চার সূত্রপাত হয়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, আবদুল করিম-সাহিত্য বিশারদ, ডঃ শহীদুল্লাহ্ ও অন্যান্য দেশীয় মনীষীগণের প্রচেষ্টায় লোকসংস্কৃতি চর্চায় অগ্রগতি ঘটে। বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়। বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত চারটি প্রধানঃ—
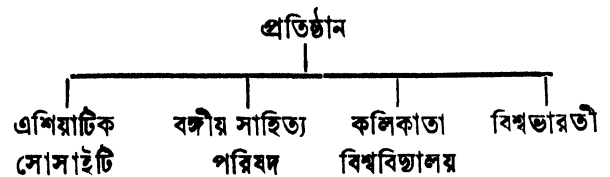
দেশী-বিদেশী মনীষীগণের বিক্ষিপ্ত লোকসংস্কৃতি প্রয়াস প্রথমে এশিয়াটিক সোসাইটির মাধ্যমে সংহতি লাভ করে এবং পরবর্তী অধ্যায়ে মূলত স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে স্বাজাত্য বোধ ও জাতীয় ঐতিহ্যচর্চার অন্বেষণে লোকসংস্কৃতি অনুশীলন প্রধানত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীকে অবলম্বন করে বহু ব্যাপকতা লাভ করে। বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার সাধারণ ইতিহাসের পটভূমিকায় বিশেষ ভাবে স্বাধীনতা পরবর্তী কালের লোকসংস্কৃতি প্রয়াসের সমীক্ষা ও মূল্যায়নে নিমগ্ন হয়ে নির্দ্বিধায় বলা যায় বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রাক্ স্বাধীনতা কালে জাতীয় ঐতিহ্যনিষ্ঠার অন্বেষণে লোকসংস্কৃতি চর্চা ছিল যত জরুরী, স্বাধীনতা উত্তর কালেও সেই অমোঘ প্রয়োজন বিন্দুমাত্র শিথিল হয়নি। ঐতিহ্য-গৌরব ও দেশাত্মবোধের প্রেরণার অতিরিক্ত জাতীয় অগ্রগতির ভ্রান্তিহীন পদক্ষেপে অতীত বিশ্লেষণ ও লোকসংস্কৃতি অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। আধুনিক লোক-সংস্কৃতি বিজ্ঞানী যুগপৎ ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীর দায়িত্ব পালন করেন। লোকসংস্কৃতির বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলন প্রকৃতপক্ষে জাতির অতীত ইতিহাস রচনা, ঐতিহ্য গর্ব সঞ্চার, প্রশাসনিক কর্মে সহায়তা, উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণে সহায়তা, জনমানসের প্রবণতা উপলব্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গণমানসের জীবনযাত্রার প্রবাহ ও লোক-মানসের বৈশিষ্ট্য অবলোকনে লোকসংস্কৃতি চর্চার মূল্য অনস্বীকার্য। জাতীয় উন্নয়নের বহুমুখী কর্ম প্রচেষ্টায় লোক-সংস্কৃতির ব্যবহারিক প্রয়োগগত মূল্যও অপরিমেয়।

বলাবাহুল্য অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশে স্বাধী-নতা উত্তর কালে লোকসংস্কৃতি অনুশীলনে যথাযথ গুরুত্ব আরোপিত হয়নি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে সমগ্র দেশ ও জাতি রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মচঞ্চলতায় যে ভাবে দ্রুত রূপান্তরিত হয়ে চলেছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে লোকসংস্কৃতি প্রয়াস সতত সুসংগঠিত হয়েছে বলা যায় না। অবশ্য স্বাধীনতা পরবর্তী অধ্যায়ে লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত প্রত্যাশিত প্রয়াস সুপরিকল্পিতরূপে পরিব্যাপ্ত না হলেও একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছে এমন কথা বলা যায় না। বরং বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চা স্বাধীনতাপূর্ব প্রয়াসে ক্ষান্ত না হয়ে, বিগত পঁচিশ বছরে নবীনের উদ্যমে নূতন দিকচক্রের সন্ধানী হয়েছে কখনো একক গবেষণায়, কখনো সমবেত কর্ম-প্রয়াসের সম্মিলিত দায়িত্ব সম্পাদনে—এমন দাবী করা যায়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ থেকে বর্তমানের কাল সীমার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্নমুখী লোকসংস্কৃতি কর্মপ্রয়াসকে প্রধানত পাঁচটি শাখায় বিভক্ত করা যায় এবং বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার "পঞ্চমুখী প্রয়াস"কে নিম্নলিখিত রূপে নির্দেশ করা যায়ঃ—

১· ব্যক্তিগত গবেষণা অনুশীলন প্রয়াস
২· বিভিন্ন সাংগঠনিক প্রয়াস
৩· পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশনা প্রয়াস
৪· শিক্ষাগত বা বিদ্যায়তনিক প্রয়াস
৫· সরকারী প্রয়াস

বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গবেষণা-অনু-শীলনের ধারা পূর্বাপর প্রবাহিত হয়ে এসেছে। বিভিন্ন প্রবীন ও নবীন গবেষকের নিরলস ব্যক্তিগত গবেষণা প্রচেষ্টা বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার অন্যতম সম্পদ। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে স্বীয় মননশীলতায় যাঁরা বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার পথকে প্রশস্ত করেছেন অথবা লোকসংস্কৃতির বহু বিলুপ্ত প্রায় উপকরণ সংগ্রহ-সঙ্কলনের দ্বারা বাংলার সংস্কৃতিকে স্পষ্টভাবে বুঝে নেবার সুযোগ বৃদ্ধি করেছেন তাঁদের মধ্যে—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, ডঃ সুশীলকুমার দে, ডঃ কালি-দাস নাগ, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, নির্মলকুমার বসু, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ সুকুমার সেন, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ ঘোষ, ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডঃ ভবতোষ দত্ত, সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার, ডঃ মহাদেব প্রসাদ সাহা, প্রাণকৃষ্ণ পাল, চারুচন্দ্র সান্যাল, গোপাল হালদার, ডঃ কামিনীকুমার রায়, ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ডঃ সুধীররঞ্জন দাশ, কালিদাস দত্ত,

অজিত মুখোপাধ্যায়, সুধাংশু রায়, ডঃ শচীন রায়, অশোক মিত্র, বিনয় ঘোষ, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, শান্তিদেব ঘোষ, মণি বর্দ্ধন, চিত্তরঞ্জন দেব, কমল মজুমদার, আশীষ বসু, রামকৃষ্ণ লাহিড়ী, সুকুমার রায়, মনোরঞ্জন মাইতি, ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, প্রদ্যোৎ ঘোষ, ডঃ দুলাল চৌধুরী, ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, নির্মলেন্দু চৌধুরী, গৌরী ভট্টাচার্য, সুশীল ভট্টাচার্য, পুলকেন্দু সিংহ, অজিত মিত্র, তারাপদ সাঁতরা, মানিকলাল সিংহ, মোহিত রায়, শঙ্কর সেনগুপ্ত, পশুপতি মাহাতো, দেবব্রত চক্রবর্তী, ডঃ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, ডঃ অমলেন্দু মিত্র, ডঃ সুধীরকুমার করণ, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মানিক সরকার, খালেদ চৌধুরী, বিনয় ভট্টাচার্য, দীনেন্দ্র চৌধুরী, ডঃ প্রিয়ব্রত চৌধুরী, ডঃ ভবচরণ মিত্র, কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন মিত্র (বজু মিত্র), প্রবোধবন্ধু অধিকারী (সূত্রধর), স্মরজিৎ চক্রবর্তী, ভোলানাথ ভট্টাচার্য, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশীষ মুখোপাধ্যায়, ডঃ প্রবোধ ভৌমিক, ডঃ গোরাচাঁদ কুণ্ডু, রবীন্দ্র মজুমদার, সঞ্জীবকুমার বসু, ডঃ প্রফুল্ল পাল, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, অরুণ রায়, প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। এই সঙ্গে কয়েকজন বিদেশীর নাম করা যায় বাংলা লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত প্রয়াসে যাঁদের ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যেমন—ডঃ দুশান জাভিতেল, ডাঃ হাইনৎসে মোদে, ডঃ ডিমক, সিলভানী, ভেরানভিকভা, ডেভিড ম্যাককাচিয়ন, র‍্যালফ ট্রোগের, প্রমুখ। অতি সাম্প্রতিক কালে বেশ কিছু তরুণ গবেষকের সাগ্রহ প্রচেষ্টা বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের ব্যক্তিগত প্রয়াসের বৃত্ত ক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে বলা যায়।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে সাংগঠনিক প্রয়াস বেশ প্রাধান্য লাভ করেছে। পূর্ববর্তী কালের গুরু সদয় দত্ত প্রতিষ্ঠিত সারাভারত লোকনৃত্য ও সংগীত সংস্থা ও গোপীনাথ সেনের এশিয়াটিক লোকসাহিত্য সভার কথা বাদ দিলে দেখা যায় স্বাধীনতা পরবর্তী অধ্যায়ে সাংগঠনিক প্রচেষ্টা অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছে। লোকসংস্কৃতি সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে—বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি পরিষৎ, গম্ভীরা পরিষৎ, রিসার্চ ইনটিট্যুট অব ফোককালচার, লোকভারতী, ফোক মিউজিক এন্ড ফোকলোর রিসার্চ ইনস্টিট্যুট, ইন্ডিয়ান ফোকলোর সোসাইটি, এ্যাকাডেমী অব ফোকলোর, প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলার লোকসংস্কৃতি প্রয়াসে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ ও ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘের অবদানও অবশ্য স্বীকার্য। এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে বাংলার ব্রতচারী সমিতি ও বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের নাম উল্লেখ করা যায়। তাছাড়া লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত সাংগঠনিক প্রয়াসে গ্রামোফোন কোম্পানীগুলির অবদানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে নানারকম পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক-পুস্তিকা আত্মপ্রকাশ করেছে। লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত গ্রন্থাদি প্রকাশে স্বাধীনতা উত্তর কালে সরকারী-বেসরকারী প্রকাশনার উদ্যোগ খুব ব্যাপক না হলেও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত সংগ্রহ ও আলোচনাদি প্রকাশে এই সময়ে—বিশ্বভারতী পত্রিকা, রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা, পরিচয়, চতুষ্কোণ, দেশ, আনন্দবাজার, অমৃত, যুগান্তর, স্বাধীনতা, কালান্তর, জনসেবক, লোকসংস্কৃতি, বসুমতী, লেখা ও রেখা, এক্ষণ, সারস্বত, অন্যমন, ফোকলোর, লোকশ্রুতি, লোকযান, পশ্চিমবঙ্গ, সমকালীন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, কৌশিকী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার সক্রিয় ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলাবাহুল্য এই সমুদয় সাংগঠনিক প্রয়াস ও পত্র-পত্রিকার প্রকাশনা সবক্ষেত্রেই যে সুষ্ঠু ও যথাযথ হয়েছে তা নয়, তবে সামগ্রিক ভাবে এই সমস্ত প্রয়াস লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত আগ্রহকে সাধারণ্যে সম্প্রসারিত করেছে বলা যায়।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় ও বিদ্যায়তনিক প্রয়াসে লোকসংস্কৃতির স্বীকৃতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত, ও ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের প্রাথমিক উদ্যোগ এবং ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের প্রচেষ্টায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বাংলা পাঠ্যক্রমে "লোকসাহিত্য" বিশেষ পত্র হিসাবে গৃহীত হয় (১৯৬২)। পরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে "লোকসংস্কৃতি"কে স্নাত-

কোত্তর স্তরে বিশেষ পত্র হিসাবে বাংলা পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত করা হয়েছে। সম্প্রতি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, পাঠ্যক্রমে "লোকসাহিত্য" বিষয়ে বাধ্যতামূলক একটি অর্ধপত্র ও বিশেষ পত্র হিসাবে "লোকসংস্কৃতি" পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং বাংলা অনার্স পাঠ্যক্রমে "লোকসাহিত্য" একটি ঐচ্ছিক গ্রুপ-পেপার পড়ার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতেও লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতি পঠন-পাঠন ও গবেষণাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে দিল্লী, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতেও বাংলা পাঠ্যক্রমের সঙ্গে বাংলার লোকসাহিত্য পঠন-পাঠনের প্রচলন আছে। সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতি বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশসমূহের ন্যায় ব্যাপক ও গভীরভাবে সুপরিকল্পিতরূপে উচ্চতর গবেষণা কর্মাদি পরিচালনার প্রচেষ্টা চলছে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রানুসন্ধানের (field work) মাধমে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহুবিধ লুপ্ত প্রায় লোকসংস্কৃতির উপকরণাদি সংগৃহীত হচ্ছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ও উচ্চতর গবেষণার বিষয় হিসাবে লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তি লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের শিক্ষাগত শৃঙ্খলা ও বিজ্ঞানমনতার পথ নিঃসন্দেহে প্রশস্ত করেছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী অধ্যায়ে স্বাধীন দেশের জাতীয় সরকার নানাভাবে লোকসংস্কৃতি চর্চা ও উন্নয়নে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রেরণা দান করেছেন। যথাযথ সুপরিকল্পিত উদ্যোগের অপ্রতুলতা সত্বেও বিগত পঁচিশ বছরে বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চায় ও প্রসারে সরকারী প্রয়াসের কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের লোকসংস্কৃতি প্রসার—প্রচার বা উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিভাগীয় প্রচেষ্টার মধ্যে—আকাশবাণী, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, ফিল্ড পাবলিসিটি বিভাগ, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, খাদি গ্রমোদ্যগ, অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডি ক্র্যাফটস্ বোর্ড, ডাইরেক্টরেট অব ইনড্রাসটিজ, ডাইরেক্টর অব আর্কিওলজি, এ্যানন্দ্রপলজিকাল সার্ভে, ট্যুরিষ্ট ডিপার্টমেণ্ট, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট, ফিল্ম ডিভিশন, জনগণনা বিভাগ, অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম বোর্ড, ডিজাইন সেণ্টার, লোকরঞ্জন কেন্দ্র, সংগীত নাটক আকাদেমী, সাহিত্য আকাদেমী, ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, প্রভৃতির অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সরকরী প্রচেষ্টা মুখ্যত স্থানীয় লোকশিল্পীদের সহায়তাদান, প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সরবরাহ, উপযুক্ত প্রচারাদির ব্যবস্থা ও বিক্রয় ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন সমীক্ষা বা জরিপকার্য পরিচালনা, পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ, প্রদর্শনী-আলোচনা চক্রাদির অনুষ্ঠান, প্রভৃতির মধ্যে প্রসারিত। সম্প্রতি কোন কোন জেলা শাসককে জেলাগত আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও আলোচনা-চক্রাদির ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হতে দেখা যায়। মোটের উপর বহুবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিভিন্নভাবে লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত আগ্রহ বিস্তারে ও লোকসংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনে যে সরকারী প্রচেষ্টা উন্মোচিত হয়েছে তা সবিশেষ অভিনন্দনযোগ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য দেশে সাফল্যের সঙ্গে বাংলার লোকশিল্প কলা প্রদর্শিত হয়েছে, বাংলার লোকসংগীত পরিবেশিত হয়েছে এবং পুরুলিয়ার 'ছো' নাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। লোকনৃত্য 'ছো'-এর পাশ্চাত্য দেশ পরিক্রমায় ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের নেতৃত্ব উল্লেখযোগ্য।

বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার বহু ব্যাপক কর্মোদ্যমের মধ্যে সাম্প্রতিক কালে অনুষ্ঠিত কয়েকটি আলোচনা-চক্রের উল্লেখ করা যায় এবং বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার গতি প্রকৃতি অনুষ্ঠানের সহায়ক বিবেচনায় কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা চক্রের বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যায়।

(১) "পল্লী অঞ্চলের দ্রুত নাগরিক প্রভাবে লোকসাহিত্যের ভবিষ্যৎ"

অল ইণ্ডিয়া রেডিও-কলকাতা, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৫,

(আকাশবাণী কলিকাতা চিত্রপরিচিতি/বেতার জগৎঃ জানুয়ারী ১-১৫, ১৯৬৬)।

(২) "রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি"
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ১৬ ও ২৬শে মার্চ ১৯৭০

(অমৃত ৯ম বর্ষ ৪র্থ খন্ড, ৪৯শ সংখ্যা, ৩রা বৈশাখ ১৩৭৭ পৃঃ ৮৩৭ ;

দৈনিক বসুমতী ১লা এপ্রিল ১৯৭০ পৃঃ ২)।

(৩) "ম্যাকাচ্ছন স্মৃতি বক্তৃতা মালা"—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (যুগান্তর, ১১, ৯, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ)।

(৪) "বাংলার পটপ্রদর্শনী ও আলোচনাচক্র"—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (পশ্চিমবঙ্গ ৪র্থ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা, ১৭ জুলাই ১৯৭০, পৃঃ ৭৭৩)।

(৫) "ছৌ-নৃত্য—আলোচনাচক্র"
ভুবনেশ্বর ২-৩ মে ১৯৬৯, দিল্লী ৩ জুন ১৯৬৯, ময়ূরভঞ্জ-বারিপদা ১৩ এপ্রিল ১৯৭১, মাঠা-পুরুলিয়া ১৫ এপ্রিল ১৯৭১ (আনন্দবাজার পত্রিকা ৫ আষাঢ় ১৩৭৬ পৃঃ ৮/ The Statesman—Delhi, June 4, 1969, Page 3, দৈনিক বসুমতী ৬ আষাঢ় ১৩৭৬ পৃঃ ৮/পশ্চিমবঙ্গ ১ মে ১৯৭০ ৪৯২-৪৯৫/যুগান্তর ১০ মে ১৯৭১ পৃঃ ৮/ পশ্চিমবঙ্গ ৫ম বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ৩০ এপ্রিল ১৯৭১ পৃঃ ৩১৬-৩১৮)

ইন্দোনেশিয়ায় আন্তর্জাতিক রামায়ণ উৎসবে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের ভারতীয় ছৌ-নৃত্যে রামায়ণ বিষয়ক আলোচনাটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।
(The Ramayana in India Chhau Dance—Dr. Asutosh Bhattacharyya, Amrita Bazar Patrika 16.9.1971 যুগান্তর ১৮, ৯, ১৯৭১।

(৬) "বাংলার লোকসংস্কৃতি"
কলকাতা তথ্যকেন্দ্র ১৬-২০ ডিসেম্বর ১৯৭০ (দেশ ১৭ পৌষ ১৩৭৭ পৃঃ ৮৮১/পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চমবর্ষ ১৭ ও ১৮ সংখ্যা/আনন্দবাজার পত্রিকা ২২শে ডিসেম্বর ১৯৭০ পৃঃ সাত)

(৭) "বাংলার লোকশিল্প"
কলকাতা তথ্যকেন্দ্র জুন ১৯৭২
(কলকাতার কড়চা, আনন্দবাজার পত্রিকা জুন ১২, ১৯৭২ পৃঃ ৪/পশ্চিমবঙ্গ ৯ জুন ১৯৭২, পৃঃ ৬০৭-৮)

এই সমুদয় আলোচনা-চক্রগুলির মধ্যে ব্যাপ্তি ও গভীরতায় সবিশেষ তাৎপর্য এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পন্ন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ আয়োজিত শেষোক্ত আলোচনাচক্র দুটির কার্যক্রমের বিশদ বিবরণ উদ্ধার করা যেতে পারে।

॥ বাংলার লোকসংস্কৃতি আলোচনাচক্র ডিসেম্বর ১৬-২০, ১৯৭০, কলকাতা তথ্যকেন্দ্র ॥

১৬ই ডিসেম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান—সভাপতি ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন (উপাচার্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) উদ্বোধক ডঃ রমা চৌধুরী (উপাচার্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)।

১৭ই ডিসেম্বর প্রথম অধিবেশন—সভাপতি ডঃ সুরজিৎ সিংহ; বাংলার লোকসাহিত্য—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসংস্কৃতি বিকাশের পশ্চাৎপট—ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়, বাংলার লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি—ডঃ অমলকুমার দাস।

১৮ই ডিসেম্বর দ্বিতীয় অধিবেশন--সভাপতি শ্রীঅন্নদাশঙ্কর

রায়; বাংলা লোক সাহিত্যের ভাষা—ডঃ সুকুমার সেন, বাংলার লৌকিক ভাষা—ডঃ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, বাংলার লোকসাহিত্য ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য—শ্রীগোপাল হালদার, বাংলার লৌকিক দেবদেবী—শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।

১৯শে ডিসেম্বর তৃতীয় অধিবেশন (সকাল)—সভাপতি ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়; পশ্চিম সীমান্তবঙ্গের লোক-সংস্কৃতি—ডঃ সুধীরকুমার করণ, উত্তরবঙ্গের লোক-সংস্কৃতি—শ্রীসুশীলকুমার ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসংস্কৃতি ও প্রচার মাধ্যম—শ্রীশংকর সেনগুপ্ত।

১৯শে ডিসেম্বর চতুর্থ অধিবেশন (বিকাল)—সভাপতি স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ; বাংলার লোকনাট্য—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, বাংলার লোকনৃত্য—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, বাংলার লোক-সঙ্গীত—শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র।

২০শে ডিসেম্বর পঞ্চম অধিবেশন (সকাল)—সভাপতি অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ; বাংলার লোকশিল্প—ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলার মৃৎ শিল্পের সমাজতাত্ত্বিক মূল্যায়ণ—শ্রীবিনয় ঘোষ, বাংলার মন্দির—শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যাল।

২০শে ডিসেম্বর ষষ্ঠ অধিবেশন (বিকাল)—সভাপতি ডঃ মীনেন্দ্রনাথ বসু; বাংলার লোক উৎসব—ডঃ প্রবোধকুমার ভৌমিক, বাংলার লোকধর্ম—ডঃ সুধীরঞ্জন দাস, বাংলার লোকবিশ্বাস ও সংস্কার—ডঃ সমীর কুমার ঘোষ।

॥ বাংলার লোকশিল্প প্রদর্শনী ও আলোচনাচক্র ৩-৪ জুন, ১৯৭২ কলকাতা তথ্যকেন্দ্র ॥

৩ জুন উদ্বোধন অনুষ্ঠান—সভাপতি ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার; স্বাগতভাষণ—শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়, গুরুসদয় মিউ-জিয়মের পক্ষে ভাষণ—শ্রীমতী আরতি দত্ত, প্রধান অতিথির ভাষণ—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৪ জুন প্রথম অধিবেশন (সকাল)—সভাপতি অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ; বাংলার কাঁথা—ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, দারু-তক্ষণ শিল্প—শ্রীসোমনাথ ভট্টাচার্য, ঢোকরা শিল্প—শ্রীবিনয় ঘোষ, পুতুল-খেলনা—মুখোশ—শ্রীআশীষ বসু।

৪ জুন দ্বিতীয় অধিবেশন (বিকাল)—সভাপতি শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়; পটশিল্প—শ্রীসুধাংশু রায়, সরা-পাটা-চালচিত্র-দশা-বতার তাস—ডঃ অশোক দাস, গৃহশিল্প সামগ্রী—শ্রীতারাপদ সাঁতরা, মন্দিরের পোড়ামাটির কাজ—ডেভিড ম্যাক্-কাচ্চন/শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকশিল্প ও লোক সংস্কৃতি বিজ্ঞান—ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়।

উপরোক্ত আলোচনাচক্রদ্বয়ের বিশদ বিবরণ অনুসরণে বোঝা যায় বাংলা লোককৃতি চর্চা সাম্প্রতিককালে আধুনিক লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের অনুগামী হতে চলেছে এবং লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে ব্যাপক তৎপরতা ও আলোড়ন দেখা দিয়েছে। এই তৎপরতার প্রভাব পরবর্তী ছোট-বড় অনেক লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষ করা যায়। অতি সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চল-ভিত্তিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠানের উদ্যোগও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই সময়ের অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সম্ভবত সারা ভারত বিজ্ঞান কংগ্রেসের হীরক জয়ন্তী অধিবেশনে (চণ্ডীগড় জানুয়ারী ১৯৭৩) সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম একটি লোক-সংস্কৃতি সংজ্ঞা গ্রহণ—

"FOLKIORE IS THE TOTAL CREATION OF THE LIFE-PRACTICE AND THE IDEATIONAL PURSUIT OF MAINLY COLLECTIVE SPONTANEOUS AND ANONYNOUS EFFORT OF AN INTEGRATED SOCIETY; it is fundamentally distinguished in its features, more or less, from the cultural effort of the so-called unsophisticated primitive society and the sophisticated one, basing mainly on tradition and independent

of formal training it is mainfested in oral and gesture language, art and craft, costume and culinary, tune and melody, sports and drama, charm and cure, custom and ceremony, belief and superstition, religion and rite, fair and festival, etc.; though, in cases, it develops in creative process or disappears in forgetfulness, yet, on the whole, implanting its roots in the past and illumining the reality of dynamic time in the evolutionary process it extends its continuity in future in the interaction of social relation."

(Towards a Definition of Folklore—Tushar Chattopadhyay Abstracts, Section of Anthropology & Archaeology, Part III of the Proceedings of 60th Session of the Indian Science Congress, p. 591)

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় শিক্ষাগত শৃঙ্খলামন্যতা এবং বিদ্যায়তনিক পাঠ্য বিষয় হিসাবে লোক-সংস্কৃতির আত্মপ্রতিষ্ঠা। অবশ্য এই প্রসঙ্গে বলাই বাহুল্য লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতি পাঠ্য হওয়ায় যেসব নোটবই ও অর্থ-পুস্তক জাতীয় গ্রন্থ বাজারে প্রকাশ হচ্ছে স্বভাবতই সেগুলি লোকসংস্কৃতির যথাযথ শিক্ষাগত শৃঙ্খলামন্যতার বহির্ভূত, তা যতই অর্থপ্রাপ্তি বা সুলভ বৃত্তিপ্রাপ্তিতে বিঘোষিত হোক না কেন। যথাযথরূপে বিদ্যায়তনিক প্রচেষ্টার অঙ্গীভূত না হলে যে বিষয় হিসাবে কোন শাস্ত্রের শিক্ষাগত তৎপরতা স্বাধিষ্ঠিত হয় না তা অবশ্য স্বীকার্য। এই সূত্রে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের লোকসংস্কৃতি চর্চার তুলনমূলক ইতিহাস পর্যালোচনায় ইংলণ্ডের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানী ডঃ ডরসন যে মন্তব্য করেছেন তা উদ্ধার করা যায়—

"In England little vestiqe remains to-day of the great burst of folklore enthusiasm that was kindled seventy-five years ago, and the reason seems to be that folklore never gained entry into the Universities."

এই দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন না কোন ভাবে যে লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতির বিদ্যায়তনিক বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে তা সবিশেষ প্রনিধান যোগ্য। এই সূত্রে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা-চক্রের (৩-৫ অক্টোবর ১৯৭২) সমাপ্তি অধিবেশনে পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে লোকসংস্কৃতিকে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্তি করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। আলোচনাচক্রে উপস্থিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রতিনিধি ও প্রধানদের স্বাক্ষর সম্বৃদ্ধ প্রস্তাবটি নিঃসন্দেহে বাংলার লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের শিক্ষাগত প্রয়াসের ঐতিহাসিক দলিল রূপে বিবেচিত হয়—

॥ প্রস্তাব ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত বর্তমান আলোচনাচক্র শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতি পঠন-পাঠনের বর্তমান ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাব করছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে 'ফোকলোর' তথা লোকসংস্কৃতিকে স্নাতকোত্তর স্তরে একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠ্য বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হোক এবং লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের স্বতন্ত্র বিভাগ গঠন করা হোক।

(স্বাঃ) তুষার চট্টোপাধ্যায়
প্রস্তাবক ৫।১০।৭২

সমর্থক (স্বাক্ষর)

জীবেন্দ্র সিংহরায়	(বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)
দেবীপদ ভট্টাচার্য	(যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
নীলরতন সেন	(কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)
বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য	(দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়)
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
শুকদেব সিংহ	(বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)
সুধাংশু ভূষণ দে	(গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়)
পুলিন দাশ	(উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
সত্যেন্দ্রনাথ রায়	(বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন)
শিবেনকুমার চট্টোপাধ্যায়	(পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়)
গোলাম সাকলায়েন	(রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ)
নন্দদুলাল রায়	(বিহার বিশ্ববিদ্যালয়)
অজিতকুমার ঘোষ	(রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
হরিপদ চক্রবর্তী	(উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)

সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(স্বাক্ষর) শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য ৫।১০।৭২

উপরোক্ত প্রস্তাব কালের প্রবাহে বাংলা লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের পরবর্তী অধ্যায়ে যে প্রভাবই বিস্তার করুক না কেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ও প্রধান বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকবৃন্দের লোকসংস্কৃতি পঠন-পাঠন বিষয়ে অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ যে সমকালের এক ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা তা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

সাম্প্রতিক কলে লোকসংস্কৃতি অনুশীলনে কম-বেশী অগ্রগতি দেখা গেলেও, স্বাধীনতা পরবর্তী লোকসংস্কৃতি চর্চা বিগত পঁচিশ বৎসরে একমুখী বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠায় বিকশিত হয়েছে এমন দাবী করা যায় না। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে লোকসংস্কৃতি প্রয়াস সাধারণভাবে বেশ ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় মোটামুটি বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা সমৃদ্ধ রূপে বিকাশ লাভ করলেও এই সময়ে লোকসংস্কৃতি চর্চায় অনেক ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে যথাযথ নিষ্ঠাহীন ও শিক্ষাগত শৃঙ্খলাহীন স্বার্থান্বেষী এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি ও সুবিধাবাদের সূচনা, যার ফলে অগভীর আলোচনা ও বিকৃতি ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। স্বাধীনতা উত্তর আলোচ্য পর্বে পূর্বাচার্যদের অনেকে লোকসংস্কৃতি অনুশীলনে যেমন সাধ্যমত নিরলস, তেমন অনেকে পরলোকগত বা প্রৌঢ় পরিণতির স্বকীয় তীর্থে অন্তর্হিত। শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় বিভিন্ন জ্ঞাতিবিদ্যার অনুষঙ্গে বা স্বতন্ত্র বিষয় গৌরবে লোকসংস্কৃতি অনুশীলন এই সময় নবীন-প্রবীনের উদ্যোগে ব্যাপ্ত হয়েছে। এই পর্বের সংগ্রহ-সমীক্ষা-আলোচনা-গবেষণা ইত্যাদি কর্মে বিদ্যায়তনিক প্রচেষ্টার পাশে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বিদ্যায়তন নিরপেক্ষ বিশিষ্ট জনের ব্যক্তিগত মূল্যবান প্রয়াসের কথা। এই সময়ে বিদ্যায়তন-নিরপেক্ষ প্রয়াস যে অনেক ক্ষেত্রে তথাকথিত শিক্ষাগত প্রয়াসকে অতিক্রম করে গেছে তা নির্দ্ধিধায় বলা যায়। অবশ্য অদ্যাপি আবেগ-সর্বস্ব সৌখিন প্রয়াস ও স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়িক তৎপরতা যে অনেক ক্ষেত্রে বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চাকে বহুলাংশে আচ্ছন্ন করে আছে তা বলাই বাহুল। মোটের উপর এই সময়-বলয়ের বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার গতি প্রকৃতিকে মোটামুটি পাঁচটি ধারায় বিভক্ত করা যায়ঃ—

১· ভাবানুরাগ নির্ভরতা
২· সৌখীন প্রয়াস
৩· ব্যবসায়িক তৎপরতা
৪· শিক্ষানুসারী প্রচেষ্টা
৫· আধুনিক বৈজ্ঞানিকমন্যতা

লোকসংস্কৃতি প্রচেষ্টা বিভিন্ন রূপে বিগত পঁচিশ বৎসরে ক্রম ব্যাপকতা লাভ করলেও সতত যে তা প্রার্থিত পূর্ণতা সন্ধানী হয়েছে এমন দাবী করা যায় না। বিপরীতক্রমে এক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতিবিদকে (Folklorist) যে যুগপৎ ঐতিহাসিক ও সমাজ-বিজ্ঞানীর দায়িত্ব পালন করতে হয় সে বিষয়ে অনেককে উদাসীন থাকতে দেখা যায়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় খণ্ড বাংলা লোকসংস্কৃতির ক্রমপ্রকাশমান আয়োজনে কোন ভূমিকা পালন করেছে,

সাতচল্লিশের উজ্জ্বলতর ঘটনা স্বাধীনতা প্রাপ্তি প্রয়াসে কোন আগ্রহ অভ্যর্থনা প্রসূত করেছে, পঁচিশ বৎসরের সময় সীমা থেকে আভিধানিক অর্থে ছাড়া অন্য কোন গভীরতর তাৎপর্যে তা উদ্ধার করা কঠিন, কেননা লোকসংস্কৃতির অভিব্যক্তির ধারা-বাহিকতা ও অনুশীলনের নিরলস প্রচেষ্টা উত্থান-পতনের বিস্তৃত বলয়ে সতত সংলগ্ন। তথাপি বিবর্তনের ধারা ও শিল্পকর্মের উদ্দেশ্যানুষঙ্গে বলা যায় পূর্ববর্তী দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে নবোদ্ভিন্ন সম্ভাবনা স্বাধীনতা উত্তর এই সময় সীমায় লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত উৎসাহ, প্রয়াস ও সিদ্ধিতে সম্প্রসারিত।

স্বাধীনতা যে রাজনৈতিক মুক্তি প্রদান করে একটা জাতিকে স্বীয় জীবনধারা স্বকীয় পরিকল্পনা অনুসারে নির্ণয় করবার সুযোগ দেয় এমন নয়, সর্বদিক থেকেই তাকে আত্ম-সচেতন করে তোলে। পৃথিবীর অপরাপর মুক্ত জাতির সঙ্গে সে বিশ্বে আপনার সম্মানজনক স্থান অধিকার করতে চায়। এই স্বাভাবিক নিয়মেই স্বাধীনতার উত্তরকালে সংস্কৃতির নব নব অভ্যুদয় ঘটেছে এবং নতুন করে মূল্যায়ণের বোধ জাগ্রত হয়েছে। সঙ্গীত এই সংস্কৃতির একটি প্রধান অংশ। স্বাধীনতা লাভের ঠিক অব্যবহিত পরেই কলকাতায় যে সঙ্গীত-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে থাকে তার উদ্দেশ্য গতানুগতিক নিয়মে সঙ্গীত পরিবেশন ছিল না, সঙ্গীতের যথার্থ মূল্যবোধ যাতে দেশে জাগ্রত হতে পারে সেইটিই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। উদীয়মান শিল্পীরা যেমন বিশেষভাবে তুলে ধরলেন তাঁদের শিক্ষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ তেমনি তার প্রচারের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন পত্রপত্রিকা এবং অপরাপর মাধ্যমগুলি। শিল্পীরা তাঁদের গুণপনার জন্য অভাবনীয় অভিনন্দন লাভ করলেন; সমগ্র দেশে জেগে উঠল একটি অপূর্ব উদ্দীপনা। সঙ্গীতকে এমন সম্মানজনকভাবে জাতীয় জীবনের-আবশ্যিক অঙ্গরূপে স্বীকৃতি এর পূর্বে আর প্রদান করা হয়নি। এই দায়িত্ব প্রধানতঃ গ্রহণ করেছিল কলকাতা। এখানকার প্রচারের ফলেই শিল্পীদের দেশ বিদেশে খ্যাতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল। আজ যে পাশ্চাত্য দেশে ভারতের সঙ্গীত বহুলভাবে সমাদৃত তার সূত্রপাত এই অনুষ্ঠানগুলি থেকেই সম্ভব হয়েছিল। শুধু এটুকুই নয়, সঙ্গীত সমালোচনাকে একটি বিশিষ্ট সাহিত্যের মর্যাদা প্রদান করা হয় এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার যে একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে তাকেও স্বীকার করা হয়।

এই পঁচিশ বৎসরে নানা সাঙ্গীতিক আলোচনায় একটি সঙ্গীত সাহিত্য গড়ে উঠেছে বললে অত্যুক্তি হয় না।

সঙ্গীতকে স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে এবং সরকার নানাভাবে এদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। সঙ্গীত আজ ব্যাপকভাবে অধীত। উত্তর স্বাধীনতার যুগে স্থাপিত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গীতে এম-এ ডিগ্রী দেবার ব্যবস্থা করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বভারতী সঙ্গীত বিষয়ে বি-এ ডিগ্রী প্রদান করছেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে গবেষণার কাজও চলেছে। প্রকৃতপক্ষে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সঙ্গীত সম্বন্ধীয় অনুসন্ধিৎসা প্রবল।

স্বাধীনতার পরবর্তী যুগের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বোধ হয় সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় সমগ্র দেশের সঙ্গীত সমীক্ষণ। কলকাতায় বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন যখন প্রথম অনুষ্ঠিত হয় তখন পশ্চিমবঙ্গের বহু অঞ্চল থেকেই লোকসঙ্গীতের সংস্থাগুলিকে আনা সম্ভব হয়েছিল। পূর্ববঙ্গ থেকেও অনেকে এসেছিলেন। কোনও সংস্থার অন্তর্ভুক্ত নন এমন বহু গ্রামীণ শিল্পীও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া প্রাচীন বাংলা গান, কথকতা, রামায়ণ গান, কবি গান প্রভৃতি বিলীয়মান বস্তুগুলিও পরিবেশিত হয়েছিল। এর একটি অভূতপূর্ব প্রভাব পড়েছিল কলকাতায় তথা সারা বাংলায়। এর ফলে বহু শিল্পী যাঁরা আজ বিশেষভাবে খ্যাতিমান তাঁরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই স্বীকৃতি অর্জন করতে পেরেছিলেন। এই জাতীয় অনুষ্ঠান ক্ষুদ্রাকারে পূর্বে শান্তিনিকেতনে মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু কলকাতার জনজীবনে তার বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। এর সবচেয়ে বড় লাভ হয়েছে সঙ্গীতের মূল্যায়ণ, বাঙালী জাতির প্রতিটি জনপদে সঙ্গীত কতখানি স্থান অধিকার করে আছে, কতখানি প্রেরণা প্রদান করছে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধানের উৎসাহও এই অনুষ্ঠান থেকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়েছিল। বর্তমানে এদিকে বিশেষ কাজ চলেছে এবং প্রধানতঃ এই কাজ অগ্রসর হচ্ছে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বহু ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করেছেন এবং তাঁদের সঙ্গীত সংগ্রহ উপযুক্ত তথ্যসহযোগে লিপিবদ্ধ করেছেন। দেশের সঙ্গীতকে এইভাবে জানা একটি সত্যিকারের অভিজ্ঞতা। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে জাতির যে বিশেষ বিশেষ দিক থেকে আত্মসমীক্ষণের প্রবৃত্তি জাগ্রত হয় এটি তারই একটি পরিচয়।

সঙ্গীতের দিক থেকে ব্যাপক অভিযান যেমন একটি দিক তেমনি আর একটি দিক হচ্ছে সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষীকরণ। আমাদের যে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত সম্পদ তাকে বৈশিষ্ট্য সহ রক্ষা করার একটি প্রচেষ্টাও এই যুগেরই একটি চিন্তা। বর্তমানে রবীন্দ্রনাথ থেকে নজরুল পর্যন্ত যে গীত ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে তাকে সযত্নে রক্ষা করবার দায়িত্ব অনেকে গ্রহণ করেছেন। প্রচুর স্বরলিপির বই প্রকাশিত হচ্ছে যা এর আগে আর কখনও হয়নি। একাডেমিকভাবে পর্যালোচনার জন্য সঙ্গীতের শ্রেণীবিভাগ করা হচ্ছে এবং বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান সেগুলি নিয়ে আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। সঙ্গীতের শাস্ত্রীয় আলোচনাও অবহেলিত নেই। বহু পণ্ডিত ব্যক্তি এই শাস্ত্রচর্চায় মনোনিবেশ করেছেন এবং ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস ও অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ, প্রবন্ধাদিও এই পঁচিশ বৎসরের মধ্যে কম আত্মপ্রকাশ করেনি।

এই পঁচিশ বছরের সাঙ্গীতিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করে আজ এই কথাটি নিঃসংশয়ে বলা যায় যে সঙ্গীত আমাদের জাতীয় জীবনের একটি মুখ্য অঙ্গ বলে পরিগণিত। একটি সুস্থ, বিদগ্ধ এবং রুচিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সঙ্গীতকে একটি প্রধান অবলম্বন হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে এবং একটি মুখ্য বিদ্যা হিসাবেও স্বীকৃতি প্রদান করা হচ্ছে। এর পূর্ববর্তী যুগে সঙ্গীতের এতবড় সম্মানজনক স্থান আর কখনও নির্ণয় করা হয়নি।

বাংলা চলচ্চিত্রের সমস্যা নিয়ে বহু জায়গায় বহুবার আলোচনা করতে হয়েছে কর্তব্যের তাগিদে। তবু সেই পুরানো কথাগুলি বলতে আমি কিঞ্চিৎ দ্বিধান্বিত। কারণ ঐ সংকলন প্রকাশের উদ্দেশ্য স্বাধীনতা-উত্তর পঁচিশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি চিহ্নিত করা। দুর্ভাগ্য আমার, যে শিল্পের সেবক আমি, বাংলার সেই চলচ্চিত্র শিল্প আজ ধ্বংসের মুখে, অগ্রগতি তো দূর স্থান। গত দুই দশকে বাংলা ছবির সংখ্যা আতঙ্কজনকভাবে কমেছে, এককালের চৌদ্দটি স্টুডিওর মধ্যে ধুঁকছে মাত্র ছটি। যেখানে পূর্বে ষাটটি ছবি বছরে মুক্তি পেতো এখন মাত্র পঁচিশটি। বর্তমান দুরবস্থা অব্যাহত থাকলে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবে।

স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উৎসবে যখন পিছন ফিরে তাকাই ঊনিশশ' সাতচল্লিশের দিকে বেদনা-বিধুর সে দিন-গুলির স্মৃতি আজও মনকে আলোড়িত করে। বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল বাংলা সিনেমা শিল্প। র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদে হারিয়ে গিয়েছিল তার দুই-তৃতীয়াংশ দর্শক পূর্ব পাকিস্তানের নিষিদ্ধ এলাকায়। একফালি বাংলার বাজারের উপর নির্ভর করে কোলকাতার কর্মীরা বুক বেঁধে-ছিলেন নূতন উদ্যমে, মৃতপ্রায় শিল্পকে সঞ্জীবিত করতে অকুণ্ঠ নিষ্ঠায় নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন।

পশ্চিমবাংলায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেল, বাড়লো বাংলা ছবির দর্শকও। অবস্থার সাময়িক উন্নতিতে যখন কলাকুশলী-কর্মী-শিল্পীর দল আশান্বিত, তখনই মাথা তুলল এমন একটি স্বার্থান্ধ গোষ্ঠী যাদের অর্থলোলুপতার বলি হোল বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প। ছবি তৈরি হচ্ছে, কিন্তু মুক্তির পথ সুগম নয়। প্রদর্শকদের হিন্দী ছবির প্রতি আনুগত্য ও বাংলা ছবির প্রতি ঔদাসীন্য এমনই এক সর্বনাশা পরিস্থিতির সৃষ্টি করল। দিনে দিনে তা আরও প্রকট হোল, সর্বগ্রাসী রূপ নিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের আলোচনা এবং বিভিন্ন

অসিত চৌধুরী

সমস্যার রূপনিরূপণ। বহুদিনের প্রয়াসে, বহুজনের অনলস সাধনায়, যথেষ্ট আয়াসলব্ধ অর্থের বিনিয়োগে একটি ছবি প্রস্তুত করা হোল, লক্ষ্য, যতশীঘ্র সম্ভব উৎসুক দর্শক সমাজের সম্মুখে ছবিটিকে উপস্থাপিত করা। এটি প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য, পরোক্ষ এবং মৌল উদ্দেশ্য, ছবিটির বিক্রয়লব্ধ অর্থকে পরবর্তী ছবির কাজে বিনিয়োগ এবং সেই ধারাকে সক্রিয় করে চলচ্চিত্র শিল্পকে সজীব ও সতেজ রাখা। চলমান শিল্পের গতিতে স্টুডিওগুলি হবে প্রাণবন্ত, সংশ্লিষ্ট সকলেই পাবেন স্বচ্ছন্দ জীবনের আস্বাদ। পরিতাপের বিষয় এই প্রাথমিক প্রয়োজনটিই কার্যকর করা যাচ্ছে না নানা স্বার্থের সংঘাতে।

সারা পশ্চিমবঙ্গে চিত্রগৃহ আছে প্রায় তিনশ পঞ্চাশটি, পৌর কোলকাতায় অনধিক নব্বইটি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে কোলকাতায় মাত্র চৌদ্দ পনেরটি হাউস ছাড়া আরও কোথাও নিয়মিত বাংলা ছবি দেখান সম্ভব নয়। বস্তুতঃ হাউস মালিকেরা দেখাতে চান না। কোলকাতার বাইরের অবস্থা আরও ভয়াবহ। মাত্র একশ কুড়িটি প্রেক্ষাগৃহে আংশিকভাবে বাংলা ছবির জায়গা মেলে। হিন্দী ছবির বিপুল অর্থের প্রলোভনে প্রদর্শক গোষ্ঠী বাংলা ছবিকে ঠাঁই দিতে চান না, আর চাইলেও এমন সর্বনাশা শর্ত আরোপ করেন যে সে দাবী মিটাতে স্বল্পবিত্ত প্রযোজকের নাভিশ্বাস ওঠে। ছবির আয়ের সিংহভাগ পরিপাক করেন প্রদর্শক, উদ্বৃত্ত অংশটুকু ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে ফিরিয়ে দেয় লগ্নী টাকা, অন্যথায় হতভাগ্য প্রযোজক প্রচুর আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে নিঃশব্দে সরে আসেন সিনেমা জগৎ থেকে।

এই দুষ্ট-চক্র থেকে বাঁচার একমাত্র পথ প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা বৃদ্ধি কোলকাতায়, শহরতলীতে, মফঃস্বলে। সরকার নিয়োজিত বিভিন্ন কমিটির সুপারিশে এ প্রস্তাবের সমর্থন মিলবে। কুটিল, জটিল কাণাগলি থেকে যে মুহূর্তে আমাদের শিল্প বেরিয়ে আসতে পারবে, পাবে ছবি মুক্তির সহজ, সরল পথ, তখনই সৃষ্টি হবে এমন একটি অনুকূল বাতাবরণ যার আহ্বানে আসবেন উৎসাহী প্রযোজকের দল, স্টুডিওগুলি কর্মমুখর হয়ে উঠবে। বছরে যদি অন্ততঃ পঞ্চাশটি ছবির মুক্তির ব্যবস্থা করা যায় আমাদের মৃতপ্রায় শিল্প আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।

প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত হবে কিভাবে? ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় না সরকারী সাহচর্যে? ব্যক্তিগত উদ্যোগ অবশ্যই কাম্য, তবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক সক্রিয়তায় উৎসাহিত হয়েই প্রস্তাব করছি, তাঁরাই গঠন করুন একটি স্বয়ং শাসিত, সংবিধান-স্বীকৃত (statutory) "থিয়েটার কর্পোরেশন"। এই সংস্থার উদ্যোগে আপাততঃ অবিলম্বে নির্মিত হোক কোলকাতায় "থ্রি-ইন-ওয়ান" পদ্ধতিতে অন্ততঃ তিনটি চিত্রগৃহ এবং আরও ৩০টি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কেন্দ্রে। এর ফলে বাংলা ছবি মুক্তির সংখ্যা শুধু বাড়বে না, বর্তমান হাউস মালিকদের এক-চেটিয়া আধিপত্যের অবসান হবে, "প্রোটেকশানের" জাঁতাকলে জর্জরিত হবেন না প্রযোজক-পরিবেশকরা। আর, বলা বাহুল্য, নূতন নূতন ছবি তৈরীর উদ্দীপনা জেগে উঠবে উৎসাহী মহলে। "থিয়েটার কর্পোরেশন"কে আরও একটি দিকে লক্ষ্য দিতে হবে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে বাংলা ছবি প্রদর্শনের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। ছবি-পিছু আয় হয় ৮।১০ হাজার টাকা মাত্র। অন রাজ্যের যে সব সহরে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা তিরিশ-চল্লিশ হাজার, সেখানে "কর্পোরেশন" তৈরী করবেন নিজস্ব একটি চিত্রগৃহ (বিভিন্ন বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক উৎসবের জন্য যা ব্যবহার করা চলবে) কেবলমাত্র, পশ্চিম বাংলায় নির্মিত ছবি দেখানর জন্য। বহির্বঙ্গে চিত্রপ্রদর্শনের পথ এইভাবে প্রশস্ত হলে, প্রতি ছবি এনে দেবে বর্তমানের আট দশ হাজারের দশগুণ টাকা।

ছবি বণ্টন ব্যবস্থার জন্যও একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। "ফিল্ম মার্কেটিং বোর্ড" নামে সেটিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। শিল্পে নিযুক্ত প্রযোজক—পরিবেশকদের দ্বারা সংগঠিত এই সংস্থার মাধ্যমে নিজ রাজ্য ছাড়াও ভারতের অন্যান্য রাজ্যে এবং বিদেশে বিশেষতঃ ইংলণ্ড, আমেরিকা, পশ্চিম জার্মানী এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে যেখানে বাংলা ভাষা-

ভাষীর সংখ্যা উৎসাহজনক, বাংলা ছবি প্রদর্শনের নিয়মিত ব্যবস্থা প্রচলন করা যেতে পারে।

ছবি তৈরীর উদ্দেশ্যে আর্থিক সহযোগিতা এবং স্টুডিও ল্যাবরেটারী আধুনিকীকরণের জন্য অর্থ বিনিয়োগ এ দুটি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজন আরও একটি অনুরূপ সংস্থার। সে ভূমিকা গ্রহণ করবেন "ফিল্ম ফিনান্সিং এণ্ড স্টুডিও ডেভেলপমেণ্ট বোর্ড।" রুচি ও শালীনতার প্রশ্ন বাদ দিলেও, একথা অনস্বীকার্য যে হিন্দী ছবির রঙিন চটক আজ বাঙালী দর্শকের কাছে একটি মোহময় আকর্ষণ। কোলকাতায় অন্ততঃ একটি ল্যাবরেটরী নির্মিত হোক যেখানে থাকবে রঙিন ছবি করার আধুনিক যন্ত্রপাতি। কিছু বাংলা ছবি রঙিন তো হবেই এবং এখানকার প্রযোজকরা হিন্দী ও অন্যান্য জাতীয় ভাষায় রঙিন ছবি নির্মাণে উৎসাহিত হবেন।

উপরোক্ত তিনটি সংস্থার কার্যক্রম একটি মূল উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে পরিচালিত হওয়া উচিত এ উক্তি বাহুল্য মাত্র। রাজ্য সরকার পরিকল্পিত "ফিল্ম ডেভেলপমেণ্ট বোর্ড"-এর মাধ্যমেই সার্থক সমন্বয় সাধন হতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের কর্মকুশলতাই বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে নবজীবন দান করবে।

হিন্দী ছবির দাপটে পশ্চিম বাংলার চিত্রগৃহে বাংলা ছবি অপাংক্তেয় এ আক্ষেপ শিল্পের সর্বস্তরে উচ্চারিত। এ সত্যও স্বীকৃত যে হিন্দী ছবির শতকরা আশীজন পৃষ্ঠপোষক বাঙালী দর্শক। আপন রাজ্যে আপন ভাষার ছবির প্রতি কেন এই অনীহা? প্রশ্নটিকে অন্যভাবেও পেশ করা যেতে পারে। হিন্দী ছবির কোন বিশেষ আকর্ষণে বাঙালী দর্শকসমাজ আজ মোহ-গ্রস্ত? প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা বলবেন, অধিকাংশ হিন্দী ছবিতে মেলে প্রচুর প্রমোদ-উপকরণ, একটি মায়াময় জগতের আস্বাদ—প্রাত্য-হিক অবসাদক্লিষ্ট মানুষের কাছে যা তার পলায়নপর মনো-বৃত্তির সহায়ক। এই সঙ্গে অশ্লীলতা, যৌনতার কথাও বাদ যায় না। চলচ্চিত্র-অভিজ্ঞরূপে যাঁরা সুবিদিত, যাঁদের অভিমত সুধী সমাজে আলোচিত, এমন কয়েকজনের সাম্প্রতিক মন্তব্য আমাদের কিন্তু বিচলিত করেছে। বাংলা ছবি নাকি দর্শক মনকে তুষ্ট করতে পারছে না, তাঁদের ক্ষুধার তৃপ্তি মিলছে না নিজ ভাষার ছবিতে। অপূর্ণ বাসনা নিয়ে তাই তাঁরা ছুটছেন হিন্দী ছবির দিকে আর সম্ভবতঃ পরিতৃপ্তির স্বাদ নিয়ে ঘরে ফিরছেন। বিশেষজ্ঞদের বিচারে এই অনুযোগ সুস্পষ্ট, বাংলা ছবির প্রযোজকরা সহজ সমাধানের পথটি উপেক্ষা করছেন কেন? বিদগ্ধজনদের অনুযোগে আমি বিস্মিত, হতবাক। বাংলা ছায়াছবির ইতিহাস তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, পরিশীলিত রুচিবোধ, সর্বোপরি তার সমাজ-সচেতন মন এ সবই তো তাঁদের অভিজ্ঞতায় গ্রথিত। মনোরঞ্জন ছবি বাংলা শিল্পও তো উপহার দিয়েছে গত দুদশকে এবং সেগুলি দর্শক অভিনন্দন-ধন্য। আজও তা সম্ভব যদি বছরে অন্ততঃ পঞ্চাশটি ছবি তৈরী করা যায়। তবেই তো নানা রুচির ছবি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব। দুস্তর বাধা অতিক্রম করে, আশা-নিরাশায় আচ্ছন্ন হয়ে যখন মাত্র পঁচিশ-ছাব্বিশটি ছবি মুক্তি পাচ্ছে, তখন "চান্স" নেবার অবকাশ কোথায়? শত চেষ্টাতেও অবশ্য বাংলা ছবি হিন্দীর "মান" স্পর্শ করতে পারবে না কয়েকটি বিষয়ে, বাধা, বাঙালী মনের চিরন্তন বৃত্তিগুলি।

হতাশার কথা বেদনাদায়ক হলেও বলতে হোল বিস্তারিত ভাবে। কারণ, সত্যকে অস্বীকার করে তো সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তবে কি বিগত পঁচিশ বছরে আমরা শুধু অন্ধ-কারেই ঘুরে মরেছি? আলোর ক্ষণিক চমক কি উদ্ভাসিত করেনি বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পকে? সেই কথাই বলি, আনন্দের কথা, গর্বের কথা। রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রবর্তনের দিন থেকে আজ পর্যন্ত উনিশটি ভারতীয় চিত্র শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি লাভ করেছে, এর মধ্যে বাংলা ছবির সংখ্যা এগারটি। শিশুচিত্র বিভাগেও বাংলার ছবিই প্রথম জয় করে শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। আন্ত-র্জাতিক ক্ষেত্রেও পশ্চিম বাংলার ছবি নানাবিষয়ে মান্যতা জয় করে এনেছে সারা পৃথিবীর চলচ্চিত্র উৎসব থেকে। শ্রেষ্ঠ

বিগত ২৫ বছরের চলচ্চিত্রের অগ্রগতির নিদর্শনস্বরূপ কিছু ছবি এখানে দেওয়া হল। বাংলা চলচ্চিত্রে এক যুগ সন্ধিক্ষণ এনেছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রযোজিত 'পথের পাঁচালী' ১৯৫৫ তে মুক্তি লাভ করার পর। (ওপরে বামে) তারই দুটি দৃশ্যে বড় ও ছোট দুর্গা ও ইন্দির ঠাকুরুণের চরিত্রে উমা দাশগুপ্ত, রুনকী ও চুণীবালা দেবী। (বামে দক্ষিণে) পথের পাঁচালী থেকে যাত্রা শুরু করে সত্যজিৎ রায় (বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত অশনি সংকেত পরিচালনরত) ভারত তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। (বামে) পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রে গত ২৫ বছরের জনপ্রিয়তম তারকাদ্বয় ভরত পুরস্কার প্রাপ্ত উত্তমকুমার ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারধন্যা সুচিত্রা সেন 'নবরাগ' চিত্রে। এঁদের যুগল অভিনয়েরও রজতজয়ন্তী হয়ে গিয়েছে। (নিচে বামে) বিগত ২৫ বছরে সবচেয়ে বেশি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছে বাংলার ছবি ও অভিনেতৃবৃন্দ এবং কলাকুশলীবৃন্দ। পূর্ণেন্দু পত্রীর সার্থক ছবি রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'তে নায়িকার ভূমিকায় উর্বশী পুরস্কারপ্রাপ্তা মাধবী চক্রবর্তী (মুখোপাধ্যায়)। (নিচে, দক্ষিণে) গত ২৫ বছরে খ্যাতিমান ও জনপ্রিয় চিত্র পরিচালক হিসাবে তপন সিংহ স্বীয় কৃতিত্বে উজ্জ্বল হয়ে আছেন বাংলা তথা ভারতবর্ষে। এখানে বাংলা 'সাগিনা মাহাতো'র বহির্দৃশ্য গ্রহণ কালে তিনি হিন্দী ছবির বিখ্যাত অভিনেতা দিলীপ কুমারকে নির্দেশ দিচ্ছেন।

সম্প্রতি বাংলা ছবির আর্থিক সংকট ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছেন। এ সম্বন্ধে উচ্চ ক্ষমতাযুক্ত চলচ্চিত্র উন্নয়ন পর্ষৎ গঠিত হয়েছে।

নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রেও গত ২৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গ যে ভারতকে বহু নূতন পথ দেখিয়েছে, তারই কিছু পরিচয় এখানে দেওয়া হল। বহু শক্তিশালী নাট্য সম্প্রদায় স্বাধীন ভারতের বাংলা নাটকের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

(দক্ষিণে উপরে) বহুরূপী নাট্যসংস্থা অভিনীত রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'রক্ত করবী'র একটি দৃশ্যে নির্দেশক অভিনেতা শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্রকে দেখা যাচ্ছে রাজা ও নন্দিনীর চরিত্রে। (উপরে বামে) অভিনয়ের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার অবদান যথেষ্ট। এখানে গিরীশচন্দ্র ঘোষের প্রহসন 'য্যায়সাকা ত্যায়সা'র একটি দৃশ্যে কমলা মুখোপাধ্যায় ও প্রাণকৃষ্ণ ঘোষকে দেখা যাচ্ছে। (নিচে বামে) নান্দীকার নাট্য সংস্থা বিদেশী নাট্যকারের নাটক পরিবেশনে যশস্বী হয়েছেন। ব্রেখ্‌টের নাটক অবলম্বনে রচিত 'তিন পয়সার পালা'র একটি দৃশ্যে নির্দেশক অভিনেতা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য অভিনেতাদের দেখা যাচ্ছে। (দক্ষিণে মাঝে) শিশুদের অভিনয়ের ক্ষেত্রে 'চিলড্রেন্‌স্' লিট্‌ল্ থিয়েটার'এর অবদান উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৫তে অভিনীত বিখ্যাত 'অবন পটুয়া' ব্যালের একটি দৃশ্যে (বাম থেকে দ্বিতীয়) এখনকার প্রখ্যাতা অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুরকে দেখা যাচ্ছে। (নিচে, দক্ষিণে) পঞ্চাশের দশকে 'উত্তর সারথী' নাট্য সংস্থা প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তাঁদের 'নতুন ইহুদী' নাটকে। তারই একটি দৃশ্যে (বাম হতে দক্ষিণে) সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বাণী গাঙ্গুলী ও নেপাল নাগকে দেখা যাচ্ছে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বিগত ২৫ বছরে অন্যান্য বিষয়ের সংগে সংগীতের জগতেও বিশেষ বৈচিত্র্যময় ও উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। শাস্ত্রীয় সংগীত, উপ-শাস্ত্রীয় সংগীত ও অন্যান্য লঘুসংগীত ও লোকগীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বহুমুখী প্রসার ঘটেছে। যেসব শিল্পীরা এইসব বিভিন্ন বিভাগে খ্যাতি লাভ করেছেন, স্থানাভাববশতঃ তাঁদের মাত্র কয়েকজনের পরিচয় এখানে দেওয়া হল। (দক্ষিণে, মধ্যে) শাস্ত্রীয় সংগীতের জগতে গত ২৫ বছরে স্বর্গতঃ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সার্থক শিষ্য রবিশংকর যন্ত্র-সংগীতে ভারত ছাড়াও বিদেশেও স্বীয় প্রতিভার অসাধারণ পরিচয় দিয়েছেন। (দক্ষিণে) সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় শুধু শাস্ত্রীয় ও রাগাশ্রয়ী গানেই নয়, আধুনিক বাংলা গানেও প্রভূত যশোলাভ করেছেন।
(নিচে) রবীন্দ্র-সংগীতের ক্ষেত্রেও আঙ্গিক ও গায়কীর প্রসার ঘটেছে। রবীন্দ্র-সংগীত শৈলীর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার হয়েছে সাধারণ সংগীত প্রিয় মানুষদের মাঝে।

(বাম হতে দক্ষিণে) সুবিনয় রায় যশস্বী গায়ক হিসাবে রবীন্দ্র সংগীতের প্রচলিত শৈলীর ঘনিষ্ঠ অনুসরণকারী। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুচিত্রা মিত্র মহিলা শিল্পীদের মধ্যে রবীন্দ্র গীতিতে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। শুধু ভারতেই নয়, ভারতের বাইরেও এঁদের যশ সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছে।

নজরুল গীতির প্রসার সাম্প্রতিক কালের একটি বিশেষ অবদান। সংগীত রসিক ও সাধারণ মানুষদের মধ্যে কয়েক বছরের মাঝে কাজী নজরুলের গান বিশেষ ভাবে আদৃত হচ্ছে। (বামে) কাজী নজরুলের ছাত্রী সুপ্রভা সরকার গত ২৫ বছরে নজরুল গীতিতে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিতা আছেন। (দক্ষিণে) ডঃ অঞ্জলী মুখোপাধ্যায় স্বীয় সংগীত প্রতিভায় নজরুলের সেই ইন্দুবালা-আঙ্গুরবালার যুগের নিজস্ব ঘরানাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন ও (মধ্যে) মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর কণ্ঠসম্পদের দ্বারা সাধারণের কাছে নজরুল গীতিকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

লঘুসংগীতের মধ্যে বাংলা আধুনিক গানেও সুর, গীত রচনা ও গায়কীর বৈচিত্র্যময় প্রসার ঘটেছে। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ছাড়াও (দক্ষিণে) হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অনবদ্য প্রতিভায় প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। (নিচে মধ্যে) নির্মলা মিশ্র আধুনিক বাংলা গান ও লোক-গীতিতে খ্যাতি লাভ করেছেন।
লোকগীতির প্রসারে নির্মলেন্দু চৌধুরী ভারতের বাইরেও সফল হয়েছেন গায়ক হিসাবে ও (দক্ষিণে) রথীন ঘোষ কীর্তনের মাঝে এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছেন।

যাত্রা অভিনয়ের জগতে বলতে গেলে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে স্বাধীনতার পর থেকে। যাত্রার সেই পুরাতন ধারার বদলে নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রচেষ্টা চলেছে সফল ভাবে। তার কিছু পরিচয় এখানে তুলে ধরা হল। (উপরে দক্ষিণে) যাত্রা জগতের গুরুপ্রতিম দিকপাল ফণী বিদ্যাবিনোদ (বড় ফণী)। জীবনের শেষ অভিনয় বাঁশের কেল্লার মহলার সময়। (বামে উপরে) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'সপ্তপদী'র যাত্রা পালায় কৃষ্ণেন্দুর ভূমিকায় যাত্রা জগতের জনপ্রিয় নট স্বপনকুমার। (বামে মাঝের সারি) বিখ্যাত যাত্রাভিনয় 'সোনাই দীঘি'র এক বিশেষ অভিনয় রজনীতে (বাম থেকে) দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ভাবনা গাজীর বিখ্যাত চরিত্রে, প্রতাপ রুদ্রের ভূমিকায় নরেশ মিত্র ও ভোলা পাল। আধুনিক সমাজ, জনজীবন ও তার সমস্যা নিয়ে যাত্রা অভিনয় এখন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু অধ্যায়কে আজ যাত্রা পালার বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করা হচ্ছে। (দক্ষিণে) ভারতী অপেরার বিখ্যাত পালা 'সূর্য সেন'এ টেগরা বলের মৃত্যু দৃশ্যে মাস্টারদার ভূমিকায় জনপ্রিয় সুজিত পাঠক। (নিচে বামে) বিদেশী সাহিত্যও আজ যাত্রাভিনয়ের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। তরুণ অপেরার ওথেলো পালার একটি দৃশ্যে ওথেলোর ভূমিকায় বিশিষ্ট ও জনপ্রিয় নট শান্তি গোপাল ও ডেসডিমোনার ভূমিকায় মিতা তালুকদার। (নিচে দক্ষিণে) বৌ ঠাকুরাণীর হাট পালাতে বর্তমান যাত্রা জগতের প্রখ্যাত অভিনেত্রী জ্যোৎস্না দত্ত ও যাত্রা জগতের আর এক দিকপাল পঞ্চু সেন।

পরিচালক, শ্রেষ্ঠ শিল্পী, শ্রেষ্ঠ সুরকার—প্রায় প্রতিটি বিভাগেই বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের উপহার আজ বিশ্বনন্দিত। একটি মানুষ আপন প্রতিভার দ্যুতিতে বাংলা ছবির জগতে এক নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন। সত্যজিৎ রায় বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পে একটি নামমাত্র নয়, একটি যুগ। স্বাধীনতা উত্তর বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পে সত্যজিৎ একটি আবির্ভাব, শিল্পের এক পরম প্রাপ্তি।

বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে মর্যাদা দান করেছেন কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পী। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সম্মানে ভূষিত হয়ে উনিশ শ তেষট্টির মস্কো আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেসটিভ্যালে সুচিত্রা সেনের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান লাভ একটি চিহ্নিত ঘটনা। অভিনয়ের উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ জাতীয় স্বীকৃতি লাভ করেছেন—উনিশশ সাতষট্টিতে উত্তমকুমার 'ভরত' পুরস্কার জয় করে। উনিশ শ সত্তরে "উর্বশী" হয়েছেন মাধবী চক্রবর্তী। 'ভরত' ফিরিয়ে এনেছেন উৎপল দত্ত।

আর্টের বিচারে বাংলার ছবির অবদান সংশয়াতীত। অথচ সেই ছবির 'আর্ট' যখন বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করছে, 'ইনডাসট্রি' তখন অবহেলিত, আপন অস্তিত্ব রক্ষায় উদ্বিগ্ন। আর নীরব নিবেদিত-প্রাণ চিত্রনির্মাতাদের অধিকাংশ প্রতিদিন বেকারী এবং দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত। এ এক অদ্ভুত অসঙ্গতি যার প্রতিকার ভাবালুতার দ্বারা সম্ভব নয়। নির্মম সত্যটি স্বীকার করতেই হবে, সিনেমা ইনডাসট্রি না বাঁচলে সিনেমা 'আর্ট'-এর প্রচার ও প্রসার অসম্ভব। একটি সাম্প্রতিক দুঃসংবাদের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হবে মনে করি। ভারত সরকার প্রেরিত পর্যবেক্ষক দলের কাছে শিল্প-সংশিষ্ট কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি মন্তব্য করেছেন, কোলকাতার কলাকুশলীরা যথেষ্ট দক্ষ নন, তাঁদের নিষ্ঠাও নয় নির্ভরযোগ্য। মন্তব্যকারীর নাম যদিও বলা হয়নি, অনুমান করি তিনি একজন সক্রিয় চিত্রনির্মাতা। তাঁকে প্রশ্ন করবো, কোলকাতার প্রাচীন জীর্ণ যন্ত্রপাতি নিয়ে যে কর্মীরা বিশ্ববরেণ্য ছবির সৃষ্টিতে সহায়তা করেন—একবার নয়, বারবার এ অবিচার, অনাচার সত্যই কি তাঁদের প্রাপ্য?

সফল ও সার্থক চলচ্চিত্র সৃষ্টির সমস্ত উপাদানই আমাদের রাজ্যে বর্তমান। প্রয়োজন শুধু স্টুডিও, ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ, সঠিক সংহতির, সুষ্ঠু শিল্প পরিচালনা, আর শিকড়-গাড়া স্বার্থের সমূল উৎপাটনের। জমাট অন্ধকারের মধ্যে আলোর ক্ষীণ রেখাগুলির আনন্দ আশার ইঙ্গিত নিয়ে আসছে। পঁচিশ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া ওপার বাংলার ভাইদের সঙ্গে মিলিত হবার অভাবনীয় শুভক্ষণটি উপস্থিত। এখানের পাঁচকোটি দর্শকের সঙ্গে আশা করবো আবার যুক্ত হবে সাড়ে সাত কোটি, বার কোটি দর্শকের অকুণ্ঠ আশীর্বাদে দুই বাংলার চলচ্চিত্র শিল্প শব্দিত ও স্পন্দিত হয়ে উঠবে।

এই সম্প্রীতির পরিবেশে, ভরসার বাণী শুনিয়েছেন রাজ্য সরকার। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচাতে তাঁদের সকল প্রচেষ্টাই সাদরে সম্ভাষিত হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উৎসাহ-ব্যঞ্জক কয়েকটি বক্তব্য আমাদের উদ্দীপ্ত করেছিল। আমরাও প্রস্তাব করেছিলাম—সরকার "সিনেমা সেস" প্রবর্তন করুন। মুখ্যমন্ত্রীর একটি ভাষণে তার সমর্থনও যেন মিলেছিল। তাই অধীর উৎকণ্ঠায় তাকিয়েছিলাম বাজেটের দিকে। হায়, যে প্রমোদকর তারা চাপালেন দর্শকের উপর, তার অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র পঁচিশ লক্ষ টাকা ঋণ দেবেন আমাদের শিল্পকে। তবু আশা রাখবো, সরকারের ঘোষিত পরিকল্পনাগুলি সার্থকভাবে অবিলম্বে রূপায়িত হোক। সমবেত প্রয়াস, ঐকান্তিক নিষ্ঠা বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে আবার গরিমাময় ও মহিমময় করে তুলবে এই বলিষ্ঠ বিশ্বাসের শপথ বাণীই সকল কণ্ঠে উচ্চারিত হোক স্বাধীনতার রজতজয়ন্তীর পুণ্য লগ্নে। হিন্দী ছবির প্রতিদ্বন্দ্বিতা তো আছেই, অন্য একটি প্রবল প্রতিযোগীর পদ-ধ্বনি অদূরেই শোনা যাচ্ছে। টেলিভিশনে ঘরে বয়ে আনা আরাম ও রম্যতা প্রথম দিকে সিনেমাকে আতঙ্কগ্রস্থ করেছিল সবদেশেই ; কালের বিচারে কিন্তু চলচ্চিত্রই জয়ী। বাংলা

ছবিও তার আপন ঐশ্বর্যে ম্লান করে দেবে বোম্বাই, মাদ্রাজের ছবিকে, টেলিভিশন আপন পরিধির মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে যে কোলকাতা ছিল সাড়া জাগানো বাংলা ও হিন্দী ছবির জন্মস্থান, এই শুভক্ষণে ভাবতেও রোমাঞ্চ লাগে, গৌরবোজ্জ্বল সেইদিন ফিরে আসবে, আমাদের শিল্প আবার সুস্থভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারবে।

আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট। তারপর পঁচিশটি বছর কেটে গিয়ে আমরা এসে পড়েছি ১৯৭২-এ। এই বছরটিই আবার বাঙালী সাধারণ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষপূর্তি উৎসব পালন করছে। একশো বছর আগে জোড়াসাঁকোর সান্যালভবনে বাঙালীর প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় "ন্যাশানাল থিয়েটার"-এর দ্বার উদ্ঘাটিত হয়েছিল ৭ ডিসেম্বর দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" নাটক নিয়ে।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ছিল শুক্রবার। শুক্রবার কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়গুলি সচরাচর বন্ধই থাকে। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির গৌরবময় দিনটিকে স্বাগত জানাবার জন্যে ঐ সময়ে কলকাতার পাঁচটি রঙ্গমঞ্চই (স্টার, মিনার্ভা, শ্রীরঙ্গম, রঙমহল ও কালিকা) বিশেষ অনুষ্ঠানসহ অভিনয়ের ব্যবস্থা করে। প্রতিটি থিয়েটারেই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। শ্রীরঙ্গম-এ বেলা ৩টার সময়ে যে-বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল, তার প্রারম্ভে জাতীয় সঙ্গীতের পরে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী "রঙ্গমঞ্চ ও স্বাধীনতা" সম্পর্কে একটি ভাষণদান প্রসঙ্গে বলেন, "আমাদের রঙ্গমঞ্চ বরাবরই দেশাত্ম-

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

বোধক নাটকের অভিনয় করে পরাধীনতার গ্লানি থেকে দেশকে উদ্ধার করতে চেয়েছে। আজ আমরা যে-স্বাধীনতা লাভ করলাম, তাতে আমাদের সাধারণ রঙ্গমঞ্চের দান কম নয়।... এবার আমরা আশা করব, আমাদের জাতীয় সরকার আমাদের দুঃখদুর্দশা দূর করে আমাদের রঙ্গালয়গুলিকে প্রকৃত জাতীয় রঙ্গমঞ্চে পরিণত করতে এগিয়ে আসবেন।"

আজকের পাঠকরা নিশ্চয়ই শুনে অবাক হবেন যে, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ঠিক পরদিনই অর্থাৎ ১৬ আগস্ট সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন মারফত প্রচারিত হয় যে, "ন্যাশানাল থিয়েটার লিমিটেড"

নামে একটি সাধারণ যৌথ প্রতিষ্ঠান (পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী) গড়ে উঠতে চলেছে। ভূতপূর্ব আর্ট থিয়েটার্স লিমিটেড-এর (যাঁরা সাধারণ রঙ্গালয়কে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন ১৯২৩ সালে স্টারে "কর্ণার্জুন" অভিনয়ের মাধ্যমে তিনকড়ি চক্রবর্তী, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নতুন রক্ত আমদানি করে) সুযোগ্য সেক্রেটারী প্রবোধচন্দ্র গুহ হয়েছিলেন এই যৌথ প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টার এবং ডিরেক্টার বোর্ডে ছিলেনঃ সুধীরচন্দ্র চৌধুরী (তৎকালীন মেয়র), স্যার হরিশঙ্কর পাল, জে-সি মুখার্জি, রাজেন্দ্র সিং সিংহী, রাজা রাও ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়, গদাধর মল্লিক, অহীন্দ্র চৌধুরী, মিঃ এন-সি গুপ্ত প্রমুখ বারো জন। কিন্তু সম্ভবত আর্থিক কারণেই এই ন্যাশানাল থিয়েটার লিমিটেড গড়ার কাজ বেশী দূর অগ্রসর হতে পায়নি।

আমরা পরাধীনতাপাশ থেকে মুক্ত হয়েছি, এই অনুভূতি যে তখন প্রবল হয়ে উঠেছিল, সেই সময়ে বিভিন্ন রঙ্গালয়ে অভিনীত নাটকগুলির নাম ও বিষয়বস্তু থেকেই সে-প্রমাণ মেলে। ১৫ আগস্ট কালিকা থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল 'মুক্তিপূজা'। ১৬ আগস্ট স্টার থিয়েটার খুলেছিলেন মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত নতুন নাটক "স্বর্গ হতে বড়", যার মূল বক্তব্য ছিল জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। ঐ দিনই মিনার্ভা খুলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামের নাট্যরূপ। কালিকা থিয়েটার ১১ অক্টোবর থেকে শুরু করেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত নতুন নাটক "স্বাধীনতার সাধনা।"

গিরিশচন্দ্র ঘোষের দেশাত্মবোধক তিনখানি নাটক "সিরাজদ্দৌলা", "মীরকাশিম" ও "ছত্রপতি শিবাজী" ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিলেন ১৯১১ সালে। ১৯৪৭-এর নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই আদেশ প্রত্যাহার করেন। এবং ১৮ ডিসেম্বর শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায় শ্রীরঙ্গমে প্রথম অভিনীত হয় গিরিশচন্দ্রের "সিরাজদ্দৌলা"। নাট্যামোদীগণের আশা ছিল, তাঁরা ভাদুড়ী মহাশয়কে করিম চাচার ভূমিকায় দেখতে পাবেন। কিন্তু তিনি প্রথমে এতে শিক্ষক ও পরিচালকের দায়িত্ব নিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন। তাই প্রথম অভিনয়-রজনীর ভূমিকা লিপিতে দেখা যায়, তাঁর দুই ভাই—মুরারিমোহন ও ভবানীকিশোর যথাক্রমে সিরাজ ও করিম চাচার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পরে অবশ্য দু' এক রাত্রির জন্যে শিশির কুমার করিম চাচার ভূমিকায় দর্শকদের অভিবাদন করেছিলেন।

কিন্তু শিশিরকুমার তখন বার্ধক্যগ্রস্ত, হীনবল—কোনো ক্রমে শিবরাত্রের সলতের মতো টিমটিম করে জ্বলছেন। অন্য থিয়েটারগুলির অবস্থা আরও খারাপ। মহেন্দ্র গুপ্ত স্টার থিয়েটার থেকে চলে যাবার পরে থিয়েটারটিতো কিছুদিন বন্ধ হয়েই রইল। রঙমহল ও মিনার্ভা নিয়ে বহু রকমের মামলা চলছিল। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থিয়েটার চালাতে অভিনেতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে প্রাণপাত করতে হয়েছিল। নাট্যকার-পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্তের মতে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের তথা কলকাতা শহরের সাধারণ রঙ্গালয়গুলিকে অত্যন্ত দুর্দিনের মধ্যে কাটাতে হয়েছে।

সাধারণ মঞ্চের এই দুর্দিন সম্বন্ধে বাঙলার চলচ্চিত্র জগতের অবিসংবাদী নায়ক উত্তমকুমার লিখেছেন, "যাঁরা প্রগতিশীল বলে খ্যাত ছিলেন, তাঁদেরও অনুকম্পাসুলভ মনোভাব ছিল এইসব পেশাদারী মঞ্চের প্রতি। রয়েল স্যুট, মেক-আপ আর আলো, এসব ছেলেখেলা দিয়ে কি লোকের মন ভোলানো যায়? চাই বলিষ্ঠ নাটক, চাই শ্রেণী-চরিত্রের প্রকৃত প্রতিফলন, জনতার জীবন। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপিত করতে পারে, এমনিতর 'রিয়েলিস্টিক' গণজীবনের অভিব্যক্তির প্রকাশ।' আর তখনকার স্টেজমালিক ও নাট্যানুরাগী কিছু দর্শকের মনেও এই ধারণা প্রকট হয়েছিল, 'সিনেমার প্রতিযোগিতায় স্টেজ দাঁড়াতে পারবে না। মাত্র সাড়ে চার আনা পয়সা দিয়ে অত চটুল আমোদের ভূরিভোজ ফেলে লোকে কম করেও এক টাকা দিয়ে কোন্ দুঃখে কাঁথা-টাঙানো পশ্চাৎপটের ওপর অভিনীত নাকি-কান্নার নাটকাভিনয় দেখতে আসবে!...আবেগসর্বস্ব

ভালোবাসা নিয়ে নিরুপায় আত্মীয়ের মত স্টেজের ঘনিয়ে আসা মৃত্যুকে দেখে মন খারাপ করা ছাড়া তখন আমাদের করণীয় কিছু ছিল না।"

পুরো ছটি মাস বন্ধ রইল স্টার থিয়েটার। মুমূর্ষু রঙ্গালয়কে বাঁচাবার শেষ চেষ্টায় স্টারের স্বত্বাধিকারী সলিল মিত্র আহ্বান জানালেন ত্রিশ দশকের সাফল্যমণ্ডিত পরিচালকদ্বয় যামিনী মিত্র ও শিশির মল্লিককে। তাঁরা ঘূর্ণ্যমান মঞ্চের প্রবর্তক সতু সেনকেও দলে টানলেন এবং দেবনারায়ণ গুপ্তকে ডাকলেন নিরুপমা দেবী রচিত "শ্যামলী" উপন্যাসের নাট্যরূপ দেবার জন্যে। দর্শক-সাধারণকে আকৃষ্ট করবার বাসনায় তাঁরা নাটকটির নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে নিয়ে এলেন জনপ্রিয় চলচ্চিত্রাভিনেতা উত্তমকুমার এবং অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে।

১৯৫৩ সালের মহাসপ্তমীর দিন স্টার আবার দ্বারোদ্ঘাটন করে "শ্যামলী"কে নিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যে ভাটি চলছিল, এই "শ্যামলী" থেকেই তার গতি পরিবর্তিত হয়। এই প্রথম, সপ্তাহে তিনদিন একই নাটক অভিনীত হতে শুরু করে। 'শ্যামলী'র জনপ্রিয়তা ক্রমে এমনই বর্ধিত হতে থাকে যে, কর্তৃপক্ষের মনে হয় বিস্ময়ের সঞ্চার এবং এটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে একটি অভূতপূর্ব ব্যাপার বলে গণ্য হয়। 'শ্যামলী'র অভিনয় শতরাত্রি অগ্রসর হবার পরে নব পরিচালনাধীনে রঙমহলে খোলা হয় নীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত "উল্কা" উপন্যাসের নাট্যরূপ। প্রথম নাটকটি একাদিক্রমে চলেছিল প্রায় পাঁচ শো রাত্রি এবং দ্বিতীয়টি তিনশো রাত্রিরও বেশী। দেখা গেল, যুগের পরিবর্তন হয়েছে, লোকের রুচি বদলেছে—তারা পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বিভিন্ন রসের সমন্বয়ে গঠিত নাটকের সামগ্রিক সু-অভিনয় দেখতে চায়। এবং সেই কারণেই বিগত-যৌবন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁর জোড়াতালি-দেওয়া শ্রীরঙ্গমকে পূর্বোক্ত দুই থিয়েটারের প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে অনেক চেষ্টা ক'রেও টিঁকিয়ে রাখতে পারলেন না। তাঁর পরিত্যক্ত রঙ্গমঞ্চে জন্মগ্রহণ করল "বিশ্বরূপা" ১৯৫৬ সালের ৭ জুন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "আরোগ্য নিকেতন" নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে। এ'দের তৃতীয় নাটক বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত "সেতু" উপর্যুপরি ১০৮২ রাত্রি অভিনয় হয়ে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। বহু হাত বদলের পরে মিনার্ভা থিয়েটারটি দখল করলেন প্রগতিশীল বামপন্থী নট-নাট্যকার-পরিচালক উৎপল দত্ত তাঁর লিটল থিয়েটার গ্রুপ-এর জন্যে। এখানে "অঙ্গার", "ফেরারী ফৌজ", "কল্লোল" প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ে তিনি নূতন বিষয়বস্তু, নূতন আঙ্গিক এবং নূতন অভিনয়ধারার নিদর্শন উপস্থাপিত করেন। গ্রুপ অ্যাক্টিং এবং টীম-ওয়ার্ক—এ দুটি কথা তাঁর প্রযোজিত নাটক সম্পর্কেই প্রথম উচ্চারিত হয়।

দক্ষিণ কলিকাতার একমাত্র রঙ্গালয় কালিকা থিয়েটার কিন্তু দর্শকরুচির সঙ্গে সমানভাবে চলতে সমর্থ হল না। শ্রীকালিদাস প্রযোজিত এবং তারকনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "যুগদেবতা" নাটকটি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে বহু রাত্রি অভিনীত হলেও পরবর্তী নাটকগুলি দর্শক আকর্ষণে অসমর্থ হওয়ায় থিয়েটারটি শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায় এবং কালিকা থিয়েটার নাম নিয়েই চিত্রগৃহে রূপান্তরিত হয়।

উত্তর কলিকাতার সাধারণ রঙ্গালয়গুলি যখন নাট্যরসিক দর্শকদের দাক্ষিণ্যে ব্যবসায়িক সাফল্যকে করতলগত করেছে, তখন বাঙলার রঙ্গমঞ্চের পরিধি কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়কে অতিক্রম করে বহুদূর বিস্তৃত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র বাঙালী জাতির নাট্যপ্রচেষ্টা কলিকাতা মহানগরীর কটি সাধারণ রঙ্গালয়েরই অনুবর্তী ছিল। শহরের পাড়ায় পাড়ায় বা গ্রামাঞ্চলে যেখানেই কোনো নাট্যাভিনয়ের আয়োজন হত, সেখানেই দেখা যেত, সাধারণ রঙ্গালয় অভিনীত কোনও জনপ্রিয় নাটকেরই মহলা চলছে এবং তাও অধিকাংশ সময়েই সাধারণ মঞ্চের নটনটীদের প্রদর্শিত পথে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যেত রবীন্দ্রনাথ প্রযোজিত অভিনয়ে এবং কিছুটা বহুবাজারের "আনন্দ পরিষদ"-এর নাট্যানুষ্ঠানে। কিন্তু বামপন্থী

রাজনৈতিক ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ শাখা প্রযোজিত "জবাননন্দী", "উলুখাগড়া", "ল্যাবোরেটারী" প্রভৃতি নাটিকা এবং পূর্ণাঙ্গ নাটক "নবান্ন" সৃষ্টিধর্মী নাট্যভাবুকদের সামনে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে দিল। মৌলিক নাটক লেখার দিকে রীতিমত একটা ঝোঁক এসে গেল এবং বিশেষ করে লেখা হতে লাগল একাঙ্কিকা। গণনাট্য সঙ্ঘের অন্যতম স্তম্ভ, প্রখ্যাত নট ও নাট্যপরিচালক শম্ভু মিত্র কয়েকজন অনুগামীকে নিয়ে গড়লেন "বহুরূপী" সম্প্রদায় ১৯৪৮ সালে। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতের প্রথম জাতীয় নাট্যোৎসবে বহুরূপী অভিনীত "রক্তকরবী" শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভ করে। বহুরূপীর মতোই পরে পরে জন্মগ্রহণ করে "আনন্দম", "রূপকার", "আনন্দলোক", "চলাচল", "লোকায়ন", "নান্দীকার", "শৌভনিক" এবং আরও অনেক অনেক নাট্য-সম্প্রদায়। এ তো কলকাতার কথা। কিন্তু সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে যে কতো নাটুকে দল জন্ম নিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। নাট্য সংগ্রাম সমিতির হিসাব থেকে জানা যায় যে, বর্তমানে আমাদের এই রাজ্যে অপেশাদারী নাট্যসংস্থার সংখ্যা হচ্ছে ১৮,৫৭০ এবং এই বিশাল সংখ্যক নাট্য দলের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীর সংখ্যা ২,৭৮,৫৫০ জনেরও বেশী। ২,000 হাজারেরও বেশী মহিলা শিল্পী শুধু অভিনয়কেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করে তাঁদের সংসার প্রতিপালন করেন। হিসাবে আরও বলা হয়েছে যে, এই নাট্যশিল্পকে অবলম্বন করে আট লক্ষেরও বেশী মানুষের অন্নসংস্থান হয়ে থাকে।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষরা যদিও নাট্যকলাকেই দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করার প্রয়াসী, তবু থিয়েটার চালাবার ব্যবসায়িক ভিত্তিটাকে তাঁরা কখনই উপেক্ষা করতে পারেন না। বহু শিল্পী, কলাকুশলী, নেপথ্যকর্মীর নিয়মিত অন্নসংস্থান করবার গুরু দায়িত্ব ছাড়াও তাঁদের সাধারণ দর্শকের রুচির প্রতি যতদূর সম্ভব লক্ষ্য রাখতে হয় এবং এই সাধারণ দর্শকের মধ্যে থাকেন বিদগ্ধ সমাজের গুণীজন থেকে শুরু করে নিরক্ষর শ্রমজীবী পর্যন্ত। কাজেই তাঁদের চড়াতে হয় মোটা রসের ভিয়ান; সূক্ষ্ম বুদ্ধিগ্রাহ্য বস্তুকে দূরে রেখে মোটের উপর আবেগপ্রধান ও হাল্কা হাসির ফুলঝুরি-কাটানো নাটক নিয়েই তাঁদের করতে হয় নাড়াচাড়া। এই সীমার মধ্যে থেকেই কিন্তু তাঁরা দর্শকদের আনন্দ দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের মনকে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করছেন এবং মাঝে মাঝে শিল্পসৃষ্টিও যে করছেন না, তা' নয়। এ যুগে বিজ্ঞান মঞ্চের আঙ্গিকের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে; তাপস সেনের আলোছায়ার সঙ্গে উপযোগী শব্দ প্রক্ষেপ মিশে "সেতু" এবং "অঙ্গার"-এর ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যগুলিকে করেছে চমকপ্রদভাবে নাটকীয়।

কিন্তু সাধারণ মঞ্চের বাইরে আজ যাঁরা নাটগোষ্ঠী তৈরী করে রবীন্দ্র ভারতীর রেজেস্ট্রীভুক্ত অপেশাদার দল হিসেবে দর্শকদের কাছে টিকিট বিক্রয় করে অভিনয় করছেন, তাঁদের নাটক ও তার প্রয়োগ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ রয়েছে প্রচুর। এবং তা তাঁরা করছেনও। বহু বিদেশী নাটকের অনুবাদ করে বা ছায়া অনুসরণে যেমন নাটক লেখা হচ্ছে, তেমনই ভারতেরই অন্য ভাষায় লিখিত নাটকেরও বঙ্গানুবাদ করে অভিনয় করা চলছে। বর্তমান সামাজিক বহুবিধ সমস্যা অবলম্বনেও "প্রতিচ্ছবি"র মতো সার্থক পূর্ণাঙ্গ নাটক লেখা হচ্ছে। আর একাঙ্কিকার তো কথাই নেই। "ইতিহাস কাঁদে", "দিন বদলের পালা", "রেডিও", "মহেঞ্জোদাড়ো" প্রভৃতি বহু সার্থক একাঙ্কিকা আমাদের দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বৎসর কত যে একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, তার সীমা পরিসীমা নেই। এ-ব্যাপারে চিত্তরঞ্জন, রূপনারায়ণপুর, কুলটি, মাইথন প্রভৃতি স্থান একটা ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে বলা যায়। এ-ব্যাপারে বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের প্রভূত দানের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ হয়। ১৯৫৮ থেকে শুরু করে ১৯৬৯ পর্যন্ত একটানা বারো বছর ধরে এ'রা যে একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ নাটপ্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করেন এবং সাফল্য অর্জনকারীদের নিয়মিত পুরস্কৃত করবার ব্যবস্থা করেন, তারই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গে কত যে নাট্যসংস্থা জন্মলাভ করেছে, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গের পরলোকগত কীর্তিমান মুখ্যমন্ত্রী বিধান-

চন্দ্র রায় রবীন্দ্র স্মৃতিবিজড়িত একটি জাতীয় নাট্যশালা গড়তে চেয়েছিলেন এবং এ সম্পর্কে তিনি একটি খসড়াও তৈরী করে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যু তাঁর কল্পনাকে বাস্তব রূপ পেতে দেয়নি। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীসভার স্বরাষ্ট্র, তথ্য ও জনসংযোগ বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন যে, জাতীয় রঙ্গালয় গড়ে উঠবে এবং এ সংবাদে নাট্যামোদী মাত্রই আনন্দপ্রকাশ না করে পারেন না।

চলচ্চিত্র

যাঁদের বয়েস আজ অন্তত চল্লিশের ঊর্ধ্বে, তাঁদের স্মরণ থাকতে পারে যে, ভারতের শাসনভার ইংরাজের কাছ থেকে ভারতীয়দের কাছে হস্তান্তরিত হয় ইংরাজী মতে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট, শুক্রবার, রাত্রি ১টার সময় (বাঙলা হিসেবে এটা কিন্তু বৃহস্পতিবার, রাত্রি ১টা)। বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতে থাকে যে, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যখন নয়াদিল্লীর পার্লামেণ্টে অনুষ্ঠিত হবে, ঠিক সেই সময়টিতে উত্তরা চিত্রগৃহে অগ্রদূত পরিচালিত "স্বপ্ন ও সাধনা" ছবির উদ্বোধনের প্রাক্কালে কলকাতার তদানীন্তন মেয়র সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন এবং ঐ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকবেন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ। কিন্তু এই বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রত্যাশিত পুলিসের অনুমতি না পাওয়ায় এটি বন্ধ রাখতে হয়।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিনটিতে কলিকাতাবাসীর সে-উন্মাদনা-উল্লাস আজও যেন আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। জনস্রোত ঠিক যেন জলস্রোতের মতোই লাট-প্রাসাদে প্রবেশ করছিল রাজাগোপালাচারীর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল রূপে শপথ গ্রহণের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবার জন্যে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির আনন্দময় সপ্তাহে কলকাতার বিভিন্ন চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হয় মূল কাহিনী-চিত্রের সঙ্গে অরোরা ফিল্ম প্রযোজিত ও পরিবেশিত "জয়তু নেতাজী" তথ্যচিত্রটি। এই সময়ে কালী ফিল্মস্‌ও দুটি সংবাদ চিত্র প্রস্তুত করেঃ (১) ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ এবং (২) নেতাজীর ভাষণ সমৃদ্ধ "মুক্তির অভিযান।" রূপছায়া লিমিটেড নামেও একটি প্রতিষ্ঠান (১) ১৫ আগস্টের উৎসব-চিত্র এবং (২) নেতাজী ও আই-এন-এ নামে দুটি সংবাদ ও তথ্যচিত্র নির্মাণ করে। নেতাজী পরিচালিত আজাদ হিন্দ ফৌজের একটি ছোট দল স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষ্যে কলিকাতায় এসে উপস্থিত হন এবং বিভিন্ন স্থানে "সোলজার্স ড্রিম" নামে একটি গীতিনাট্য অভিনয় করতে থাকেন। এই গীতিনাট্য অবলম্বনে একটি হিন্দী ছবি নির্মিত হয় ডি, ডি, স্বামী ও সুশীল মজুমদারের যুগ্ম-প্রযোজনায় এবং সুশীল মজুমদারের পরিচালনায়। ছবিটি ১৯৪৮ সালের ২৩ জানুয়ারী, নেতাজী জন্মদিবসে মুক্তিলাভ করে।

স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে এই সময়ে অনেকগুলি দেশাত্মবোধক জীবনী-চিত্র এবং কাহিনী-চিত্র প্রযোজিত হতে দেখা যায়। তাদের মধ্যে কয়েকটি হচ্ছেঃ বাঘা যতীন, বুড়ী বালামের তীরে, জাগরণ, আমার দেশ, মা-আর-মাটী, মানুষের ভগবান। কিন্তু ছবিগুলিকে প্রকৃতই দেশাত্মবোধক অথচ শিল্পসম্মতভাবে নির্মাণ করবার জন্যে যে-শিল্পচেতনা থাকা দরকার, ছবিগুলির পরিচালক ও প্রযোজকদের মধ্যে তার ছিল যথেষ্ট অভাব। এই কথাই ধ্বনিত হতে দেখা যায় ১৯৪৭-এর ১ নভেম্বর তারিখে "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় প্রকাশিত "এই দেশেরই ছবি" প্রবন্ধের নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তিতেঃ "মানুষের মনে রাজনীতি ও সমাজনীতির আজকাল বেশ প্রভাব রয়েছে। সুযোগ বুঝে কাহিনীকার এই নীতিগুলোর এলোমেলো টুকরো অতি হালকা ও সস্তা করে কাহিনীর মধ্যে মধ্যে জুড়ে দেন এবং এটা নিছক বিজনেসের খাতিরেই করতে হয়। প্রায় সব জায়গাতেই মূলকাহিনীর সঙ্গে এই জোর করে জোড়া লাগাবার কোনো সামঞ্জস্য থাকে না; ফলে শিবের পরিবর্তে বাঁদরই গড়ে ওঠে"।

১৯৪৮ সালে চিত্র-সাংবাদিক চন্দ্রশেখর (মনুজেন্দ্র ভঞ্জ) অভিযোগ করেনঃ "উৎকর্ষতার বিচারে বাঙলা ছবি আজ অধোগামী, এটা সার্বজনীন অভিযোগ।...ফিল্ম স্টুডিওগুলিতে নতুন গজিয়ে-ওঠা বহু প্রযোজকের আকস্মিক সমাবেশে এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, যেটা ছবির কোয়ালিটি রক্ষার পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়।" একদা স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে যে-সব তরুণ বাঙালী হিংসার পথে দেশোদ্ধার করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের কার্যকলাপ নিয়ে হেমেন গুপ্ত পরিচালিত "ভুলি নাই" ছবির মুক্তি ১৯৪৮ সালের একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই ছবি দেখে মানুষ যেন নতুন করে নিজের দেশকে ভালোবাসতে শিখল।

শরৎচন্দ্র রচিত কাহিনীগুলির চিত্ররূপের অসামান্য জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও স্টুডিওর চার দেওয়ালের ভিতর কৃত্রিম সেটের সাহায্যে তোলা দুর্বল কষ্টকল্পিত কাহিনী-আশ্রিত ছবিগুলি দেখে দেখে চিত্রপ্রিয় দর্শক সাধারণ যখন প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল, তখন পূর্ব-পাকিস্তান থেকে সদ্য আগত উদ্বাস্তুদের অবহেলিত জীবনযাত্রাকে উপজীব্য করে "ছিন্নমূল" নামে বাস্তবধর্মী ছবি দর্শকবৃন্দকে উপহার দেন ক্যামেরাম্যান-পরিচালক নিমাই ঘোষ ১৯৫১ সালে। কিন্তু সুসংবদ্ধ গতিশীলতার অভাবে ছবিখানি দর্শক সমাদর লাভে অসমর্থ হয়। অথচ বিয়াল্লিশের "ভারত-ছাড়ো"-আন্দোলনরত মেদিনীপুরকে পটভূমিকা করে তৈরী "৪২"-ছবিটি ১৯৫১-তে মুক্তি লাভ করা মাত্র দর্শকসমাজে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই ১৯৫১ সালেরই গোড়ার দিকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সোভিয়েত পরিচালক ভ্যাডিমির পুডভকিন কলকাতায় পদার্পণ করে আমাদের বাঙলা চলচ্চিত্র জগৎকে 'সমাজবাদী বাস্তবতা' সম্পর্কে সচেতন করে যান। এবং ১৯৫২ সালের প্রথমেই ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষ্যে কলিকাতাবাসী চিত্ররসিকরা জীবনে প্রথম ফ্রান্স, ইতালী, জাপান, জার্মান প্রভৃতি দেশের শিল্পসম্মত ছবিগুলি দেখবার সুযোগ লাভ করে। এই উৎসবে প্রদর্শিত ইতালীর ডি, সিকার "বাইসাইকেল থীফ" ও জাপানের "ইউকিওয়ারিগু" ছবি দুখানি বাঙলার চলচ্চিত্র-জগতের পরিচালক ও কলাকুশলীদের মধ্যে বিশেষভাবে আলোচনার বস্তু হয়ে ওঠে। এর কিছুদিন আগে পরে সুখ্যাত ফরাসী চিত্র পরিচালক জাঁ, রেণোয়া সদলবলে কলকাতায় এসে উপস্থিত হন "দি রিভার" ছবি তোলবার মতো বহির্দৃশ্যের খোঁজে এবং ছবিটির শ্যুটিংয়ের জন্যে। তাঁর ছবির বেশীর ভাগ অংশই ছিল বহির্দৃশ্য-প্রধান। যে-ক'জন তরুণ বাঙালী কোনো-না-কোনো কারণে জাঁ রেণোয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেনঃ সত্যজিৎ রায়, হরিসাধন দাশগুপ্ত ও সুব্রত মিত্র।

১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে মুক্তিপ্রাপ্ত "বকুল" ছবিটি যখন দর্শক আকর্ষণে ব্যর্থ হল, তখন আমাদের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র-প্রতিষ্ঠান নিউ থিয়েটার্সের দরজা চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনায় বাঙলার চলচ্চিত্র-জগৎ যেন ক্ষণেকের তরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। সকলেরই মনে হয়, একটা যুগ-পরিবর্তনের যেন আশু প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু কোন্ দিক থেকে যে পরিবর্তনটা আসবে, সেটা যেন কেউই ঠাহর করতে পারছিল না। ঠিক এমনই সময়ে স্টুডিও মহলে শোনা গেল, প্রচার-প্রতিষ্ঠান ডি, জে, কীমারের প্রাক্তন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট সত্যজিৎ রায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর কাহিনী 'পথের পাঁচালী' অবলম্বনে যে-ছবিখানার শ্যুটিং সামান্য মাত্র অগ্রসর হবার পরে অর্থের অভাবে বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আনুকূল্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই ছবিটির প্রযোজনার ভার গ্রহণ করেছেন। ফলে ছবির কাজ গড়িয়ার নিকটবর্তী বোড়াল গ্রামে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' গ্রাম-বাঙলার পটভূমিকায় নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি বালকের জীবন-বেদ। সমগ্র প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে জড়িয়ে একটি শিশু প্রাণের ধীরে ধীরে বিকাশ লাভের কথা এমন দরদ দিয়ে বিভূতিভূষণের আগে কেউ বলেনি। বইটিকে সচিত্র করবার সময়েই সত্যজিৎ কাহিনীটির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং যখন তিনি কমার্শিয়াল আর্টিস্টের কাজে ইস্তফা দিয়ে চিত্র-পরিচালনায় ব্রতী হন, তখন স্বভাবতই এই কাহিনীটির চিত্ররূপ দিতে আগ্রহী হন।

১৯৫৫ সালের ২৬ আগস্ট শ্রী, ছায়া, বীণা ও বসুশ্রীতে "পথের পাঁচালী" মুক্তিলাভ করে। এই প্রথম ভারতের কোনো রাজ্যে রাজ্য সরকারের প্রযোজনায় একটি কাহিনী-চিত্র নির্মিত হল। ছবিটি মুক্তি লাভের সংগে সংগে চিত্র-সাংবাদিককরা একে স্বাগত জানান। গ্রাম-প্রকৃতির সংগে মনুষ্যজীবনকে এমনভাবে একাত্ম করে আর কখনও কেউ ছবি তোলেননি। ছবিটিতে গ্রাম্য পরিবেশ মাত্র পটভূমিকা নয়, কাহিনীর জীবন্ত শিল্পী। "সর্বশ্রেষ্ঠ মানবিক দলিল" (বেষ্ট হিউম্যান ডকুমেণ্টারী)—এই বিশেষ মর্যাদায় ছবিখানি বিদেশে প্রথম সম্মানিত হল। এবং তারপরে পেল কত অগণিত পুরস্কার। পশ্চিমবংগের সুসন্তান সত্যজিৎ রায় ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পকে জগৎ সভায় ঠাঁই করে দিলেন তাঁর "অপু-ত্রয়ী" (অপু ট্রিলজি)-র মাধ্যমে এবং সংগে সংগে নিজেও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রস্রষ্টা রূপে সম্মানিত আসন লাভ করলেন। বৈপ্লবিক মন নিয়ে এলেন ঋত্বিক ঘটক, অসিত সেন, মৃণাল সেন প্রভৃতি পরিচালকরা। বিশুদ্ধ ব্যবসায়িক মন নিয়ে তৈরী বহু ছবির ভীড়ের মধ্যে তৈরী হতে লাগল অপরাজিত, জলসা ঘর, পরশ পাথর, অপুর সংসার, দেবী, তিন কন্যা, চারুলতা, কাঞ্চনজঙ্ঘা (সত্যজিৎ রায়), অযান্ত্রিক, বাড়ী থেকে পালিয়ে, মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার, সুবর্ণরেখা (ঋত্বিক ঘটক), নীল আকাশের নীচে, বাইশে শ্রাবণ (মৃণাল সেন), চলাচল, দীপ জেলে যাই, জীবন তৃষ্ণা, (অসিত সেন) প্রভৃতি শিল্পোত্তীর্ণ ছবি। ব্যবসায়িক জগৎ থেকে তপন সিংহও এসে এই দলে যোগ দিলেন এবং পরপর অঙ্কুশ, উপহার, টর্নসল, কাবুলিওয়ালা, লৌহ-কপাট, ক্ষণিকের অতিথি, হাটে বাজারে, অতিথি প্রভৃতি ছবি।

কিন্তু চলচ্চিত্র শিল্প একটি ব্যবসাও বটে। এবং এই ব্যবসায়ের দিক দিয়ে পশ্চিমবংগের চলচ্চিত্র শিল্প পাকিস্তান সৃষ্টির সংগে সংগেই ক্রমাগত সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। সমগ্র বংগদেশের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবংগ। কাজেই বংগ বিভাগের ফলে যে পশ্চিমবংগে নির্মিত বাঙলা ছবির বাজার অনেকখানি কমে গেছে, এ-কথা বলাই বাহুল্য। তার ওপর বোম্বাই ও মাদ্রাজে নির্মিত রঙিন ছবিগুলির জলুস ও যৌন আবেদনের কাছে বাঙলা ছবির পরাজয় স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। নতুন চলচ্চিত্র গৃহ নির্মাণের পথেও সরকারী বাধা বিস্তর। এই সুযোগে পরিবেশক ও প্রদর্শকেরা অন্য রাজ্য হতে আগত ছবিগুলির ক্ষেত্রে যে সুবিধাজনক শর্তানুযায়ী অধিকতর অর্থ লাভ করতে পারছেন, বাঙলা ছবির প্রযোজকেরা সে রকম সুবিধাজনক শর্তে সম্মত হবার কথা চিন্তাও করতে পারেন না। কাজেই সংকটের সম্মুখীন হয়ে চলচ্চিত্র-প্রযোজকেরা বারংবার রাজ্য সরকারের স্বারস্থ হয়েছে প্রতিবিধান প্রার্থনা করে। চলচ্চিত্র শিল্পের সমস্যা নির্ধারণের জন্যে আমাদের রাজ্য সরকার ১৯৬২ থেকে শুরু করে ১৯৬৯ পর্যন্ত অন্তত তিনটি চলচ্চিত্র সমিতি নিযুক্ত করেন প্রথম, কে, সি, সেন অনুসন্ধান সমিতি (১৯৬২); দ্বিতীয়, আর, গুপ্ত অ্যাড-হক অনুসন্ধান সমিতি (১৯৬৬) এবং তৃতীয় ও শেষ, বি, এন, সরকারকে চেয়ারম্যান করে রাজ্য চলচ্চিত্র উপদেষ্টা পরিষদ (১৯৬৯)। তিনটি সমিতিই যথাসময়ে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করলেও সেই রিপোর্টগুলির অন্তর্গত সুপারিশ সমূহকে কার্যকরী করার কোনও চেষ্টা কোনোও দিনই করা হয়নি।

পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবংগের ২১৮টি চিত্রগৃহের মধ্যে মাত্র ১৪টিতে শুধু বাঙলা ছবি দেখাবার ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে মোট চিত্রগৃহের সংখ্যা বর্ধিত হয়ে ৩৮০টি হলেও শুধু বাঙলা ছবি দেখাবার চিত্রগৃহ একটিও বর্ধিত হয়নি অর্থাৎ সেই ১৪টিই আছে।

১৯৪৭-এ পশ্চিমবংগে প্রমোদ করের হার ছিলঃ ১৲ টাকা পর্যন্ত ২৫% ;

১৲ থেকে ৩৲ টাকা পর্যন্ত ৪০% এবং ৩৲ টাকার উর্ধে ৭৫%

১৯৭২-এ ২৫ জুলাই থেকে প্রমোদ-করের হার হয়েছেঃ ৫০ পয়সা পর্যন্ত ৩০%

৫০ পয়সা থেকে ১·২০ পয়সা পর্যন্ত ৬০%;

১·২০ থেকে ২.২৫ পর্যন্ত ৯০% এবং ২.২৫ পয়সার উর্ধে ১২০%

আশার কথা, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ-শঙ্কর রায় এই রাজ্যের চলচ্চিত্র শিল্পকে সহায়তা করবার কথা সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন। প্রথমে, বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের ৩৫তম বার্ষিক প্রশংসাপত্র বিতরণী-উৎসবে প্রধান অতিথির ভাষণে এবং পরে ১৯তম রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিতরণী-উৎসবে ঐ প্রধান অতিথির ভাষণদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নকল্পে রাজ্য সরকার ১৯৭২-এর জুলাই মাসের মধ্যেই একটি ফিল্ম ডেভেলপমেণ্ট বোর্ড (চলচ্চিত্র উন্নয়ন পরিষদ) স্থাপন করবেন এবং উন্নয়ন কার্যের জন্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ২৫ লক্ষ টাকা সংরক্ষিত রাখছেন।"

পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্পের নানাবিধ সমস্যার সমাধান কল্পে রাজ্য সরকার যে-সাহায্য হস্ত প্রসারিত করছেন, তাতে এই রাজ্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহনটির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হবে বলেই মনে হয়। শিল্পটিকে যদি সুস্থ পরিবেশে সুদৃঢ় আর্থিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহলে আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প শুধু যে প্রমোদ পরিবেশনের বাহন হিসেবেই নিজের যোগ্যতাকে প্রমাণিত করবে, তাই নয়; এর বিস্তার প্রচুর শিল্পী, কলাকুশলী ও নেপথ্যকর্মীদের জীবনযাত্রার সমস্যার স্থায়ী সমাধান করার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার এই শিল্পটিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাদরের আসনে অধিষ্ঠিত করবে।

যাত্রা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব যুগে শহরাঞ্চলে যাত্রার পৃষ্ঠপোষকতা করত দু' শ্রেণীর লোক: এক, প্রকাণ্ড অট্টালিকায় বসবাসকারী ধনী ব্যক্তিরা; দুই, বড় বড় বাজার বা বিক্রয় পট্টির আড়তদার ও মহাজনেরা। ধনীদের বহির্বাটির বৃহৎ চত্বরে যাত্রাপালা গানের আসর বসত বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন বা শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে; আর তাঁদের ঠাকুরবাড়ীর ঠাকুরদালানের সামনের উঠানে যাত্রাভিনয় হত দোল, ঝুলন, রাস বা দুর্গোৎসবাদি পালপার্বণের সময়ে। অন্যদিকে আড়তদার বা মহাজনেরা অপরাপর খুচরা দোকানী, চাষী ও ফড়েদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে পট্টির কোনো সারাধণ জায়গা ঘিরে বা বাজারের মাঝেই যাত্রার আসর বসাত শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী বা পৌষ পার্বণের সময়ে বেশ কয়েক রাত ধরে।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অবশ্যম্ভাবী মুদ্রাস্ফীতির দরুণ টাকার ক্রয়ক্ষমতা উত্তরোত্তর হ্রাস পেতে থাকে এবং সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। জমিদার শ্রেণীর হাত থেকে টাকা চলে যায় বড় বড় শিল্পপতির হাতে। অবশ্য পরে জমিদারী প্রথাই বিলুপ্ত হয়। বাঙালী আড়তদার ও মহাজনের বদলে দেখা দেয় অবাঙালী ব্যবসায়ীর দল। ফলে যাত্রার পৃষ্ঠপোষকরা হয়ে যায় অদৃশ্য। এছাড়া যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রুচিরও পরিবর্তন ঘটেছিল। সবাক চলচ্চিত্রের আমদানী হওয়ায় যেখানে আমোদ-প্রমোদের নিতান্তই প্রয়োজন, সেখানে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হত। এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাইভেট থিয়েটার পার্টির অভিনয়। দোল, দুর্গোৎসবে বা বারোয়ারীতলায় সস্তার তর্জা, কবিগান বা কথকতা দিয়েই কাজ সারা চলত। ফলে, যাত্রাভিনয়ের আসর শহর থেকে একেবারে উঠে গেল। অবশ্য শহুরে শিক্ষিত শ্রেণীর যাত্রার প্রতি বিরূপতার আরও একটি সঙ্গত কারণ ছিল। যাত্রাভিনয় ছিল বাঙালী জনজীবনের পক্ষে প্রমোদের মাধ্যমে শিক্ষার উপকরণ। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের কাহিনী সংবলিত নাট্যাভিনয় থেকে লোকে শিক্ষা করত জীবনাদর্শ—কর্তব্য, প্রেম, ভক্তি, স্নেহ। কিন্তু বিভিন্ন যাত্রা দলে ক্রমে ক্রমে অশিক্ষিত, রুচিহীন, নিম্ন শ্রেণীর লোকের ভীড় বাড়তে থাকে। এদের না ছিল কোনো অভিনয়ের চরিত্র সম্বন্ধে সম্যক ধারণা, না ছিল কোনো বাক্‌শুদ্ধি বা রসজ্ঞান। কাজেই এদের অশুদ্ধ উচ্চারণ, অসংযত ভাবভঙ্গী, অশ্লীল ভাঁড়ামো যাত্রাভিনয়কে করে তুলেছিল গুণিজনের কাছে হেয় এবং অপাংক্তেয়।

তাই স্বাধীনতা প্রাপ্তির উল্লাসের মুহূর্তে কলিকাতা শহরের চিৎপুর-পাড়ার যাত্রাদলকে কেউই আনন্দের শরিক বলে ভাবতে পারেনি। আর্য অপেরা, গণেশ অপেরা, ভাণ্ডারী অপেরা, সত্যম্বর অপেরা, রঞ্জন অপেরা, নট্ট কোম্পানী, ভূষণ দাসের দল, মথুর সাহার থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টি এবং আরও অনেক অনেক যাত্রাদল ছিল নতুন বাজারের উত্তরাংশ থেকে শোভা বাজার পর্যন্ত চিৎপুর রোডের দু'পাশে ছড়িয়ে। কিন্তু তাদের গাওনা হত অধিকাংশ সময়েই কলকাতার বাইরে কলকারখানায় বা খনি অঞ্চলে। দেশ স্বাধীন হবার পরে যুগের হাওয়ার সঙ্গে সুর মিলিয়ে মথুর সাহা অভিনয় করেছিলেন "রণজিতের জীবনযজ্ঞ", সত্যম্বর অপেরায় হয়েছিল শশাঙ্কশেখর প্রদত্ত "সীতারাম"-এর যাত্রানাট্যরূপ, আর্য অপেরায় অভিনীত হয় জিতেন বসাককৃত "আনন্দমঠ"-এর যাত্রাপালা। প্রভাস অপেরা করলেন নেতাজীর জীবনকাহিনী অবলম্বনে "মায়ের ডাক" এবং তার সঙ্গে "মীর কাশিমের স্বপ্ন"। কিন্তু এ-সব যাত্রাভিনয়ের সঙ্গে বিদগ্ধ সমাজের কোনো যোগ ছিল না। অবহেলিত যাত্রাদলগুলি নিরক্ষর শ্রমিকদের মনোরঞ্জন করেই কোনোক্রমে নিজেদের টিঁকিয়ে রেখেছিল। মালিকানা পালটেছিল বহু দলেরই। হেতমপুরের মহারাজা গড়েছিলেন রঞ্জন অপেরা। দলের অধোগতি দেখে তিনি দল তুলে দিলেন। মথুর সাহার থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টির কর্তৃত্ব নিলেন দলের ম্যানেজার পরিতোষ ধাড়া। অনেক দলেরই মালিকানা গিয়ে অর্সালো প্রতিষ্ঠাতার পুত্র বা জামাতার ওপর। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিলাসী এবং অমানুষ বলে দল হয় উঠে গেল, আর নয়তো দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে ধুঁকতে ধুঁকতে বেঁচে রইল। এইভাবেই যাত্রাজীবন চলেছিল পঞ্চাশ দশকের শেষ পর্যন্ত।

১৯৬০ সালে সহসা দেখা গেল, "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় চিৎপুরের যাত্রা জগৎ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে তার সমস্যা ও সঙ্কটকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। এই আলোচনা যাত্রাপাড়ায় জাগালো চাঞ্চল্য। প্রসন্ন চিত্তে যাত্রাশিল্পীরা মনে করলেন, "আমরা তাহলে একেবারে মরে যাইনি। আমাদের নিয়েও খবরের কাগজে আলোচনা হয়।" ঐ ১৯৬০-এরই অক্টোবরে সত্যম্বর অপেরা কর্তৃক ব্রজেন দের "সোনাই দীঘি" অভিনয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ সচিত্র সমালোচনা প্রকাশিত হয় আনন্দবাজারেরই পৃষ্ঠায়। যাত্রাজগতের পক্ষে এটা একটা অভূতপূর্ব ঘটনা। চিৎপুর পাড়ায় তখন যে-কটি যাত্রা দল ছিল, তারা সবাই এতে উৎসাহিত হয়ে নবোদ্যমে নতুন নতুন পালা নিয়ে নিজেদের তৈরী করতে লাগল। ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের ঠাকুর বাড়ীর প্রশস্ত চত্বরে বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল পক্ষকালব্যাপী যাত্রা উৎসব। এই আসরে যোগ দিলেন চিৎপুরের প্রায় সব কটি বড়ো দল এবং ঐ সঙ্গে দু' একটি শহরতলীর দলও। এই যাত্রা উৎসব দেখতে শহরবাসীরা যে বিপুল উৎসাহ দেখিয়েছিলেন, তা' যাত্রাপালার অতি বড়ো সমর্থকের কাছেও অকল্পনীয় ছিল। শোভাবাজার রাজবাড়ীতে অনুষ্ঠিত এই উৎসব থেকেই যাত্রাজগতের ভাগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। এর পরে ১৯৬২ সালে বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ যাত্রাপাড়ায় অবস্থিত রবীন্দ্র উদ্যানে (বীডন উদ্যানে) আর একটি বিরাট যাত্রা উৎসবের আয়োজন করেন। এই উৎসবে মাইক্রোফোনের সঙ্গে সর্বপ্রথম স্পট লাইট ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়। দেখা গেল, বিদগ্ধজনেরা যাত্রাকে আর অবহেলার দৃষ্টিতে দেখছেন না; কোনো কোনো পালার অভিনয় তাঁদের যথেষ্টই উৎসাহিত করছে। রবীন্দ্র সদনের কর্তৃপক্ষ যেমন কলকাতা ও শহরতলীর নাট্যসংস্থাগুলিকে একত্র করে নাট্যোৎসব করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাস্থ নাট্যকে দলদের জড়ো করে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা করেছিলেন, তেমনই শহর ও শহরতলীর যাত্রা দলদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন একটি পক্ষকালব্যাপী যাত্রা উৎসবে যোগ দেবার জন্যে। শহরের শ্রেষ্ঠ প্রদর্শনী কেন্দ্রে এই যাত্রা উৎসবও অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল এই কারণে যে, শহরের অভিজাত সম্প্রদায়ের এই প্রথম বাঙলার লোক-সংস্কৃতির অন্যতম বাহক যাত্রার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটল।

একদা যাত্রা ছিল সঙ্গীত-প্রধান। যাত্রার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল চারজন জুড়ি ও কমপক্ষে আটজনের দোহার। কিছুক্ষণ সংলাপের পরেই রাজা, রাণী, মন্ত্রী বা ঐ রকম কোনো

পাত্রপাত্রীর উক্তি হিসেবে জুড়ীরা মূল যাত্রাস্থলের চার কোণে দাঁড়িয়ে উঠে ধরতেন গান এবং তাঁদের গানের পংক্তি ধরে কোরাস গাইত দোহারেরা। বহুদিন হল সেই প্রথা পরিত্যক্ত হয়ে তার পরিবর্তে বিবেক, সন্ন্যাসী বা পাগল জাতীয় চরিত্রের অবতারণা করে নাটকীয় কোনো চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব গানের মাধ্যমে শ্রোতৃবৃন্দের সামনে উপস্থাপিত করা হত বা গানের মাধ্যমে তাকে সাবধান করা হত। বর্তমানে যাত্রার নাটক প্রায় মঞ্চের নাটকের সামিল হয়ে পড়ায় তাতে গানের স্থান হয়ে পড়েছে গৌণ। তার ওপর যাত্রাও এখন মঞ্চের মতোই বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হয়েছে কোথাও কোথাও। টেপ-রেকর্ডারের সাহায্যে ঝড়, মেশিনগান প্রভৃতির আওয়াজ, নানা রকম আলোর কারসাজি ইত্যাদি ব্যবহৃত হচ্ছে। এবং এর পথপ্রদর্শক হচ্ছেন তরুণ অপেরা। এ'রা যেদিন শম্ভু বাগ রচিত "হিটলার" পালাটিকে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগের অধ্যাপক অমর ঘোষের পরিচালনায় দর্শক সমক্ষে অভিনয় করলেন, সেদিন থেকেই এই অভিনবত্বের সূত্রপাত হয়। এই তরুণ অপেরাই "লেনিন" পালাটি অভিনয় করে সোভিয়েত দেশের অভিনন্দন লাভ করে এবং নাম-ভূমিকার অভিনেতা শান্তিগোপাল আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হন। পশ্চিমবঙ্গের লোকনাট্য হিসেবে যাত্রা রাষ্ট্রীয় সমর্থনও লাভ করেছে এবং অধুনা পরলোকগত অভিনেতা-নাট্যকার ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ কেন্দ্রীয় সঙ্গীত-নাটক-আকাদেমী দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছিলেন।

বছর দুয়েক আগে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা-জগতের বিগত যুগের অন্যতম দিকপাল সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে ছাত্রদের সামনে যাত্রা সম্বন্ধে বক্তৃতা করবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। এবং মাত্র গেল বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকার যাত্রাজগতে তাঁর অবদানের জন্যে সুরেন্দ্রনাথকে পুরস্কৃত করেন। এই পুরস্কার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে শিল্পীর হাতে প্রদান করা হয়।

আজ অনেকগুলি যাত্রা সংস্থা রাজনৈতিক বিষয় বস্তুকে তাঁদের পাথেয় করেছেন। তরুণ অপেরা "হিটলার", "লেনিন"-এর পরে করেছেন "রাজা রামমোহন", "নেপোলিয়ন", "আমি সুভাষ"। তাঁদের শেষ পালা হচ্ছে আর্য অনার্য সভ্যতার সংঘর্ষ নিয়ে রচিত "মহেঞ্জোদড়ো"। লোকনাট্য সম্প্রদায় অভিনয় করেছেন উৎপল দত্ত রচিত "দিল্লী চলো" ও নীলমণি দে রচিত "জয় বাংলা"। নিউ আর্য অপেরা আসরে নামিয়েছেন উৎপল দত্তেরই দুখানি পালা: রাইফেল ও জালিয়ানওয়ালা বাগ। যাত্রায় আজ অভিনীত হচ্ছে 'রক্তাক্ত আফ্রিকা' ও 'বিপ্লবী ভিয়েতনাম"। চিৎপুরের যাত্রা পাড়া প্রথামত এ বছরেও রথের দিন থেকে নতুন নতুন যাত্রাপালা নিয়ে তৈরী হতে শুরু করে দিয়েছে।

যাত্রা যে আজ তার চিরাচরিত ঝকমকে পোশাক-পরিচ্ছদে-মোড়া পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক পালা ত্যাগ করে সামাজিক (সরলা, বিন্দুর ছেলে প্রভৃতি) বা রাজনৈতিক (বিনয়-বাদল-দীনেশ, বিপ্লবী ক্ষুদিরাম, আমি সুভাষ প্রভৃতি) নাটকের দিকে ঝুঁকে পড়েছে এবং ফ্লাড-লাইটের—প্রখর আলোকের—তলায় দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে অভিনয় করার পদ্ধতি ত্যাগ করে নানা রকম যান্ত্রিক কারসাজিকে সহায় করে ঝোলানো মাইক্রোফোনের মালার পিছনে ঢের নিম্ন পর্দার অভিনয়ের প্রতি মনঃসংযোগ করেছে, এতে রক্ষণশীল সম্প্রদায় সায় দিতে পারছেন না। দেখছি, বিজন মুখোপাধ্যায়, ভোলা পাল প্রভৃতি অনেক প্রথিতযশা যাত্রানট এই অভিনবত্বের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে বলেছেন, বাঙলার নিজস্ব লোকসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বাহন যাত্রার বহুদিনের ঐতিহ্যকে বিকৃত করা ঠিক হচ্ছে না—থিয়েটারের ধারানুকরণে যাত্রা করলে যাত্রার ঘটবে অপমৃত্যু। তাঁরা নজির দেখিয়ে বলেছেন, শত আধুনিকতা সত্ত্বেও জাপান তার "কাবুকী" ধারার অভিনয়কে ত্যাগ করেনি, চীন তার ঐতিহ্যমণ্ডিত স্টাইলাইজড অভিনয়কে ঠিক বজায় রেখে চলেছে।

বাঙালীর নিজস্ব যাত্রা কি রূপ নিয়ে বাঁচবে, এ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করলে ভালো হয়।*

* প্রবন্ধটি রচনায় বহু উপাদান সরবরাহ করবার জন্যে সর্বশ্রী দেবনারায়ণ গুপ্ত, রাসবিহারী সরকার ও শিব ভট্টাচার্য এবং আনন্দবাজার পত্রিকার নিকট কৃতজ্ঞ—লেখক।

১৯৭২-৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্বল্প সঞ্চয়ে মোট ৬১ কোটি টাকা সংগ্রহ করে ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে শুধু প্রথম স্থানই অধিকার করেনি—এক বৎসরে তার স্বল্প সঞ্চয়ের সংগ্রহ লক্ষ্যের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। জাতীয় উন্নয়নে অর্থ বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে এবং দেশবাসীদের মধ্যে মিতব্যয়িতার অভ্যাস সৃষ্টির জন্য স্বাধীন ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকে স্বল্প সঞ্চয় আন্দোলনে জোর দেবার পর স্বল্প সঞ্চয় সংগ্রহে পশ্চিমবঙ্গের রেকর্ড বরাবরই ভাল। তবু ১৯৭২-৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের রেকর্ড অতুলনীয়। আলোচ্য বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বন্যা ও খরার প্রকোপ দেখা দিয়েছিল। ফলে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে স্বল্প সঞ্চয়ে সংগ্রহ হয়েছিল ব্যাহত। এতৎ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের এই কৃতিত্ব তাই সর্বথা বিশেষ অভিনন্দন যোগ্য।

স্বল্প সঞ্চয় কথাটি সাম্প্রতিক হলেও এর পিছনে মিতব্যয়িতা ও নিয়মিত সঞ্চয়ের যে আভাস আছে তা বোধ হয় মানব সভ্যতার মতই প্রাচীন। মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন বরাবরই অনিশ্চয়তাপূর্ণ—অদৃষ্টপূর্ণ বিপদ আপদের আশঙ্কা প্রায় সব সময়েই থাকে। তাছাড়া থাকে বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি নানাবিধ সামাজিক দায়াধিকার মেটানোর জন্য বাড়তি অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন। সীমিত আয়ের দ্বারা বর্তমানের প্রয়োজন মিটিয়ে ভবিষ্যতের সংস্থান করতে হলে সঞ্চয় ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই। তাই মানুষ নিজের ও পরিবারের কল্যাণ কল্পে পূর্বাপরই সঞ্চয় করে এসেছে। তবে বর্তমানের পোস্ট অফিস ও ব্যাঙ্কের সঞ্চয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার পূর্ব

পর্যন্ত এই ব্যক্তিগত সঞ্চয় প্রায় ক্ষেত্রেই ছিল অলাভজনক ও বিপদসঙ্কুল। মানুষ তখন সঞ্চিত অর্থ দিয়ে হয় স্বর্ণালঙ্কার, তৈরি করত, নয়তো সম্পত্তি কিনত—কোন কোন ক্ষেত্রে সুদেও টাকা খাটাত। অনেক ক্ষেত্রে সঞ্চিত অর্থ চোর ডাকাতের ভয়ে ঘড়ায় পুরে মাটিতেও পুঁতে রাখা হত। কিন্তু আজকের দিনে পোস্ট অফিস, ব্যাঙ্ক ও নানাবিধ সঞ্চয় সার্টিফিকেটের দৌলতে সঞ্চয় হয়ে উঠেছে বিবিধ ফলপ্রসূ। সঞ্চয় করতে পারলে সে সঞ্চয় থেকে নিরাপদে ঘরে বসে ব্যক্তি ও পরিবারের কল্যাণের জন্য যেমন নিয়মিত ভাল সুদ পাওয়া যায়, তেমনই এ সঞ্চিত অর্থ

বিনিয়োগ করে জাতিগঠনমূলক কাজেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়। আধুনিক সঞ্চয় ব্যবস্থার এটা একটা বড় বৈশিষ্ট্য। যত দিন যাচ্ছে আধুনিক রাষ্ট্রও ক্রমশ তত জনকল্যাণমূলক হয়ে উঠছে। জনগণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করতে হলে উন্নয়নমূলক ও কল্যাণমূলক কর্মপ্রয়াসে বিপুল অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। জনসাধারণের স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় রাষ্ট্রের এই প্রয়োজন বহুলাংশে মেটাতে পারে।

সাধারণ মানুষের বিনিয়োগ

নামে স্বল্প সঞ্চয় হলেও বস্তুত জাতির জীবনে স্বল্প সঞ্চয়ের গুরুত্ব কিন্তু আদৌ কম নয়। স্বল্প সঞ্চয়ের অর্থ হল যাঁরা স্বল্পবিত্ত—যেমন সাধারণ কেরাণী, শ্রমিক, কৃষক, প্রভৃতি তাঁদের সাধ্যানুসারে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে তোলা, তাঁরা যাতে সামর্থ্য অনুযায়ী মাসে ৫ টাকা বা ১০ টাকা করে জমিয়েও আকর্ষণীয় সুদ পেতে পারেন তার বিশেষ ব্যবস্থা করা। এই-ভাবে তিল কুড়িয়ে তাল তৈরি করার প্রয়াস নিহিত আছে স্বল্প সঞ্চয়ের মধ্যে। ১৯৭৩-৭৪ সালে আমাদের যে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমাপ্ত হবে, সেই পরিকল্পনা কালে সারা ভারতে স্বল্প সঞ্চয় আন্দোলনের যাধ্যমে এক হাজার কোটি টাকা তোলার লক্ষ্য মাত্রা স্থির হয়ে আছে। এ প্রয়াসে এ পর্যন্ত যে অগ্রগতি হয়েছে তার আলোকে একথা প্রায় অসঙ্কোচে বলা যায় যে এ লক্ষ্য মাত্রা তো পূর্ণ হবেই, তদুপরি মোট সংগ্রহের পরিমাণ লক্ষ্য মাত্রাকে ছাড়িয়ে যেতেও পারে। যে আন্দোলন থেকে আভ্যন্তরীণ সম্পদ হিসাবে এই বিরাট পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হতে পারে, তাকে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেবার উপায় আছে কি? ভারতবর্ষের অনুন্নত অর্থনীতির উন্নয়ন কল্পে স্বাধীনতার পরবর্তী কালে স্বল্প সঞ্চয়ের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হলেও বস্তুত বৃটিশ শাসন কালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েই এ আন্দোলনের গোড়া পত্তন হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অর্থনৈতিক চাপে পড়ে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন ভারত সরকার এদেশের জনগণের মধ্যে মিতব্যয়িতার অভ্যাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং রাজকোষের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কয়েকটি স্বল্প সঞ্চয় সিকিউরিটির প্রবর্তন করেছিলেন। তারপর থেকে এ আন্দোলন ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করে আজ একটা ব্যাপক গণ আন্দোলনের রূপ নিতে চলেছে। স্বাধীনতার পরবর্তী কালে স্বল্প সঞ্চয় আন্দোলনের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল এই যে জাতীয় সরকার এই আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের আপামর জনসাধারণকে আমাদের দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অংশীদার করে তুলতে চাইছেন। আজকের স্বল্প সঞ্চয় আন্দোলন কার্যত আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির সমবয়সী।

অনুন্নত দেশের দ্রুত শ্রীবৃদ্ধিসাধন পরিকল্পনা ছাড়া সম্ভব নয়। পরিকল্পিত পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিপুল পরিমাণে অর্থবিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। প্রধানত তিনটি উপায়ে এই অর্থবিনিয়োগ সম্ভবঃ (১) কর থেকে আদায়ীকৃত রাজস্ব (২) বৈদেশিক সাহায্য ও (৩) আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ব্যবস্থা। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের জন্য ভারতকে এই তিনটি ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হয়েছে। তবে কর বৃদ্ধির একটা সীমা আছে বলে এ পথে সব সময় প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান সম্ভব নয়। তেমনই বিদেশী ঋণও জোগাড় করতে হয় চড়া সুদে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা প্রাথমিক পর্যায়ে অনুন্নত দেশের পক্ষে বিদেশী ঋণ ও বিদেশী কারিগরী সাহায্য গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকে না। তবে ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় অর্থনীতিকে স্বয়ম্ভর করে তোলার জন্য বিদেশী ঋণের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হয়। এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই স্বাধীনতার পরবর্তী কালে স্বাবলম্বী অর্থনীতির দিকে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে স্বল্প সঞ্চয় আন্দোলনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য আমাদের দেশের মত অনুন্নত ও নিরক্ষরতা-প্রধান দেশে জনগণকে মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়মুখী করে তোলা রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আমাদের দেশের জনগণের একটা বড় অংশ এখনও দারিদ্র্য-সীমার নীচে বাস করেন। তাঁদের কাছে সঞ্চয়ের কথা বলা নিরর্থক হলেও জনগণের যে অংশ নানা পেশা ও জীবিকায় কর্ম নিযুক্ত তাঁদের মধ্যে

সঞ্চয়ের অভ্যাস সৃষ্টি করা উচিত। তাঁদের এ সঞ্চয় শুধু যে তাঁদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কল্যাণ সাধন করতে পারে তাই নয়, এ সঞ্চয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির সার্থক রূপায়ণ সম্ভব করে তুলে দেশের দারিদ্র্য ও বেকারত্বের অবসান সূচিত করতে পারে। ভারত সরকার প্রবর্তিত স্বল্প সঞ্চয়ের বিভিন্ন পরিকল্পে তাঁরা যে অর্থ বিনিয়োগ করেন সেই অর্থ কোন না কোন প্রকারে দেশে আরও কলকারখানা গড়ে তুলতে, স্কুল কলেজ স্থাপনে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করে তুলতে সহায়তা করে। স্বল্প সঞ্চয়ীরা এইভাবে পরোক্ষে দেশ ও জাতিগঠনে অংশ গ্রহণের মর্যাদা লাভ করতে পারেন।

স্বল্প সঞ্চয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে গত দুই দশকের প্রয়াস যে ব্যর্থ হয়নি তার একটা বড় প্রমাণ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের ক্রমিক বিস্তার লাভ এবং এই আন্দোলনের মাধ্যমে বৎসরের পর বৎসর অধিক থেকে অধিকতর অর্থ সংগ্রহ। এ ব্যাপারে শহরাঞ্চলে শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও গ্রামাঞ্চলে কৃষিজীবীদের কাছ থেকে ক্রমবর্ধমান সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। যে সব ডাকঘরে স্বল্প সঞ্চয়ের সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় গ্রামাঞ্চলে এরূপ ডাকঘর স্থাপনের দাবী ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। প্রতি বৎসরই ডাকঘর কর্তৃপক্ষ ক্রমাগত এই জাতীয় ডাকঘরের সংখ্যা বাড়িয়েও জনসাধারণের দাবী মিটিয়ে উঠতে পারছেন না। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করার পর এইসব ব্যাঙ্কও গ্রামাঞ্চলে শাখা বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করেছে। সঞ্চয় সম্বন্ধে আমাদের জাতীয় সচেতনতা যে বৃদ্ধি পাচ্ছে এগুলি তার সুনির্দিষ্ট লক্ষণ।

স্বল্প সঞ্চয়ের ত্রিবিধ উদ্দেশ্য

স্বল্প সঞ্চয় আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ত্রিবিধঃ (১) জনসমাজের সকল অংশের মধ্যে মিতব্যয়িতার বোধ সঞ্চার করা ; (২) ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির চাপ নিবারণ করে জনগণের কল্যাণ কল্পে সরকারী উদ্যোগে বিনিয়োগের জন্য অর্থ সংস্থান করা এবং (৩) উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়নের জন্য বহু প্রয়োজনীয় সম্পদের সংস্থান করা। সুতরাং স্বল্প সঞ্চয়ের মধ্যে একই সঙ্গে ব্যষ্টি ও সমষ্টির কল্যাণ সমানভাবে নিহিত। স্বল্প সঞ্চয় আন্দোলন মূলত ভারত সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত হলেও রাজ্যসরকারগুলিও এ সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী ও কর্মতৎপর। তার কারণ একটি বিশেষ রাজ্যে স্বল্প সঞ্চয়ে যে অর্থ সংগ্রহ হয় তার একাংশ রাজ্য সরকার রাজ্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি রূপায়ণের জন্য ঋণ হিসাবে ভারত সরকারের কাছ থেকে পেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে নিয়ম হল রাজ্যে স্বল্প সঞ্চয়ের নীট সংগ্রহের দুই তৃতীয়াংশ রাজ্য সরকার ২৫ বৎসরে পরিশোধযোগ্য ঋণ হিসাবে ভারত সরকারের কাছ থেকে পেতে পারেন। প্রথম ৫ বৎসর ঋণ পরিশোধ বাবত কোন টাকা ভারত সরকারকে দিতে হয় না। এই ভাবে প্রাপ্ত ঋণ কলকারখানা গড়ে তোলার কাজে ব্যয় করা হলে সেগুলির উৎপাদন থেকেই ভবিষ্যতে ঋণ শোধ করা সম্ভব। এই জন্য রাজ্য সরকারগুলিও স্বল্প সঞ্চয় আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে বিশেষ উৎসাহী।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে স্বল্প সঞ্চয় সংগ্রহের ক্রমবৃদ্ধি

পরপর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে স্বল্প সঞ্চয়ের সংগ্রহ কিভাবে বেড়েছে তার একটা হিসাব নিকাশ নিলেই জাতীয় স্তরে এ আন্দোলনের প্রসারের একটা পরিমাপ পাওয়া যায়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে সর্বভারতীয় স্বল্প সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ২৪১ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে এই সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৪০৬·৯ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে এই সংগ্রহের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭৪·১৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এই ক্রমবৃদ্ধিতে উৎসাহিত হয়ে ভারত সরকার চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছিলেন ৭৬৯ কোটি টাকায়। ১৯৭৩-৭৪ সালে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হবে। চতুর্থ পরিকল্পনা কালে প্রথম দুই এক বৎসরে বার্ষিক সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা যথেষ্ট পরিমাণে অতিক্রান্ত হওয়ায় পরিকল্পনা কালের মোট লক্ষ্যমাত্রা ৭৬৯ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। মোট সংগ্রহের পরিমাণ শেষ পর্যন্ত ১০০০ কোটি টাকাও ছাড়িয়ে যাবে এরূপ আশা করার

কারণ আছে। উদাহরণস্বরূপ ১৯৭২-৭৩ সালের বার্ষিক সংগ্রহের কথা ধরা যাক। এই বৎসরের জন্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছিল ২৭৫ কোটি টাকা। বাস্তব ক্ষেত্রে এই সংগ্রহের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৫১·৫৮ কোটি টাকা। সুতরাং চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে স্বল্প সঞ্চয়ে মোট সংগ্রহের পরিমাণ ১০০০ কোটি টাকার চেয়ে অনেক বেশি হবে এ আশা করা আদৌ অযৌক্তিক নয়। স্বল্প সঞ্চয় সংগ্রহে পূর্বাপরই এই বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে এবং এটা আমাদের অর্থনীতির সুস্থতাই প্রতিপন্ন করে। গত বিশ বৎসরে আমাদের দেশকে একাধিকবার ভয়াবহ খরার সম্মুখীন হতে হয়েছে, বন্যার প্রকোপও কম ছিল না। এই সময়-সীমার মধ্যে আমরা একবার চীনের সংগে এবং দুইবার পাকিস্তানের সংগে সামরিক সংঘর্ষেও জড়িয়ে পড়েছিলাম। তবু এইসব দুর্বিপাকের দরুণ স্বল্প সঞ্চয়ের সংগ্রহ তো কমেইনি—বরং ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের অর্থনীতি যে বাঞ্ছিত পথে এগিয়ে চলেছে স্বল্প সঞ্চয়ের ক্রমিক অগ্রগতির মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রের মত উল্লিখিত সময়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেও স্বল্প সঞ্চয় সংগ্রহে ক্রমিক অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই সময়-সীমার মধ্যে প্রায় ৫ বৎসর কাল, ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বিশৃংখলা ও নৈরাশ্যজনক অবস্থা বর্তমান ছিল। ১৯৭১ সালে বাংলা দেশের মুক্তি সংগ্রামের ফলে অভূতপূর্ব শরণার্থী সমাগমে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে উঠেছিল ভারাক্রান্ত। তাছাড়া পর্যায়ক্রমে খরা ও ঝরা তো পশ্চিমবঙ্গের প্রায় নিত্য সংগী। এ সত্ত্বেও স্বল্প সঞ্চয় সংগ্রহে পশ্চিমবঙ্গে যে ক্রমিক অগ্রগতি দেখা গেছে তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে পশ্চিমবঙ্গে স্বল্প সঞ্চয়ে মোট ৩৮·৫৩ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনা কালে এই পরিমাণ হয়েছিল যথাক্রমে ৪৯ ২৮ কোটি টাকা ও ৮৯.৯১ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে সংগ্রহের পরিমাণ প্রথম পরিকল্পনা কালের তুলনায় দ্বিগুণের চেয়ে বেশি হয়েছিল। এটা স্বল্প সঞ্চয়ে পশ্চিমবঙ্গের ক্রমিক অগ্রগতির দ্যোতক এবং এর থেকে বোঝা যায় যে এ রাজ্যের জনগণ ক্রমশ স্বল্প সঞ্চয়ে অধিক থেকে অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম চার বৎসরে স্বল্প সঞ্চয় সংগ্রহের পরিমাণ যে ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে মনে হয় যে এই পরিকল্পনা কালে মোট সংগ্রহের পরিমাণ তৃতীয় পরিকল্পনা কালের দ্বিগুণ হবে। ১৯৬৯-৭০ সালে পশ্চিমবঙ্গে সংগ্রহের লক্ষ্য ছিল ২০ কোটি টাকা ; সে ক্ষেত্রে মোট সংগ্রহ হয়েছিল ২০ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা। ১৯৭০-৭১ সালে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও প্রাকৃতিক দুর্দৈবের জন্য সংগ্রহের পরিমাণ কমে হয়ে ছিল ১৬ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। ১৯৭১-৭২ সালে এই সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৩৪ কোটি টাকারও বেশি। ১৯৭২-৭৩ সালে সংগ্রহের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণিত হয়ে ৬১ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও প্রাকৃতিক দুর্বিপাক সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে স্বল্প সঞ্চয় আন্দোলনের এ অগ্রগতি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে।

স্বল্প সঞ্চয়ের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য সমূহ

স্বল্পবিত্ত জনসমাজ, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত, শ্রমিক ও কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য ভারত সরকার স্বল্প সঞ্চয়ে নানাবিধ আকর্ষণীয় পরিকল্পের ব্যবস্থা করেছেন। স্বল্প সঞ্চয়ের পরিকল্পনাগুলিকে ব্যাংকে টাকা রাখার মত লাভজনক করে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে ভারত সরকার এই পরিকল্পনাগুলির সুদের হার ব্যাংক জমার সুদের হারের সমান করে দেন। মেয়াদী জমা ও জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেটগুলি ছাড়া বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সঞ্চয় ব্যবস্থাগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত পরিকল্প হল বেতন পঞ্জীভুক্ত সঞ্চয় পরিকল্প। এই

ব্যবস্থায় কর্মীর বেতনের একটা নির্ধারিত অংশ স্বল্প সঞ্চয় সিকিউরিটিতে বিনিয়োগের জন্য প্রতি মাসে কেটে নেওয়া হয়। সরকারী অফিস, কলকারখানা ও অন্যান্য বেসরকারী সংস্থায় এই পরিকল্পটি জনপ্রিয়। ১৯৭২-এর ১লা এপ্রিল থেকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্প চালু করা হয়েছে যার নাম "সংরক্ষিত সঞ্চয় পরিকল্প।" যাঁরা এই পরিকল্পে টাকা জমান তাঁরা বীমার মত সুযোগ সুবিধা পান। এই পরিকল্প অনুসারে যদি কোন ক্ষুদ্র সঞ্চয়ী সি, টি, টি কিংবা রেকারিং ডিপজিটে মাসিক ৫ টাকা অথবা ১০ টাকার হিসাব খোলেন এবং ২৪টি কিস্তি প্রদানের পর যদি কোন কারণে তাঁর মৃত্যু হয়, তাহলে তাঁর পরিবার বীমার মত সুবিধা পাবেন অর্থাৎ সঞ্চয়কারী বেঁচে থেকে পরিকল্পের মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সব কিস্তি জমা দিয়ে যে টাকা পেতেন তাঁর উত্তরাধিকারী কিংবা মনোনীত ব্যক্তি সেই মেয়াদ অন্তের পুরো টাকাই পাবেন। এটি সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা এবং এর ফলে স্বল্প সঞ্চয় আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে উঠেছে। প্রতি গৃহে সি, টি, ডি ও রেকারিং ডিপজিট পরিকল্প জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ভারত সরকার মহিলা প্রধান ক্ষেত্রীয় বাচৎ যোজনা নামে একটি অভিনব এজেন্সী ব্যবস্থা চালু করেছেন। এই ব্যবস্থায় সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান, সমিতি, ইউনিয়ন প্রভৃতি সংগঠনকে এবং ব্যক্তিগতভাবে একমাত্র মহিলাদের এজেন্ট নিযুক্ত হবার সুযোগ দেওয়া হয়। শিশুদের মধ্যে গোড়া থেকে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সঞ্চয়িকা ব্যাংক খোলার বিশেষ ব্যবস্থাও ভারত সরকার করেছেন। এই ব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের সাধ্যমত সঞ্চয় করতে উৎসাহিত করা হয় এবং তারা প্রয়োজন বোধে ৫ পয়সাও নিয়মিত জমাতে পারে। বিদ্যালয়ের এই সঞ্চয়িকা ব্যাংকগুলি চালাতে প্রধানত ছাত্রছাত্রীদেরই উৎসাহিত করা হয় এবং প্রাপ্তবয়স্ক সঞ্চয়ীদের মত শিশু সঞ্চয়ীদেরও পাশ বই, চেক বই প্রভৃতি দেওয়া হয়। কলকাতা ও মফস্বলে এই ধরনের কয়েকটি সঞ্চয়িকা ব্যাংক ইতিমধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এছাড়া যাঁরা উচ্চবিত্তের সঞ্চয়ী তাঁদের জন্য কতকগুলি আয়কর-যুক্ত সঞ্চয় ব্যবস্থা আছে।

রাজ্য সরকারের উৎসাহমূলক ব্যবস্থা

ভারত সরকারের গৃহীত কার্যক্রম ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে স্বল্প সঞ্চয় জনপ্রিয় করে তোলার জন্য রাজ্য সরকার কতকগুলি উৎসাহমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন এবং স্বল্প সঞ্চয় সংগ্রহে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য কতকগুলি বিশেষ পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। এই উৎসাহমূলক পুরস্কারের ব্যবস্থাগুলি নিম্নোক্তরূপ ঃ

(১) যে জেলা বার্ষিক সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা সর্বাধিক শতকরা হিসাবে ছাড়িয়ে যায় সেই জেলাকে স্থানীয় উন্নয়নের জন্য নগদ এক লক্ষ টাকা ও একটি ট্রফি দেওয়া হয়। যে জেলা অনুরূপভাবে দ্বিতীয় স্থান দখল করে সেই জেলাকে একটি ট্রফি দেওয়া হয়।

(২) অনুমোদিত এজেন্টগণকে এক লক্ষ টাকা সংগ্রহের ভিত্তিতে ১০০ টাকা হিসাবে নগদ পুরস্কার দেওয়া হয়। যিনি যত লক্ষ টাকা সংগ্রহ করতে পারেন তাঁর পুরস্কারের মাত্রা সেই ভাবে বৃদ্ধি পায়।

(৩) যে উন্নয়ন ব্লক তার বার্ষিক নীট সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে পারে সেই ব্লককে নগদ ৫০০ টাকা দেওয়া হয়। এর মধ্যে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক পান ২৫০ টাকা এবং বাকি ২৫০ টাকা ভাগ করে দেওয়া হয় স্বল্প সঞ্চয়ের কাজে নিযুক্ত তাঁর কর্মচারীদের মধ্যে।

(৪) প্রতি জেলায় যে উন্নয়ন ব্লকের সংগ্রহ সর্বাধিক হয় সেই ব্লককে নগদ ১০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়।

(৫) যে সব গ্রামীণ সঙ্ঘ, জনকল্যাণমূলক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান স্বল্প সঞ্চয় আন্দোলন সম্প্রসারণে ও বিশেষ করে আদর্শ সঞ্চয় গ্রাম গড়ে তোলায় সহায়তা করে তাদেরও পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা আছে। যে গ্রামের অন্তত শত-

করা আশীটি পরিবার কোন একটি কিংবা একাধিক সঞ্চয় পরিকল্পে নিয়মিত অর্থ সঞ্চয় করে সেই গ্রামকে আদর্শ সঞ্চয় গ্রাম আখ্যা দেওয়া হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সাফল্যপূর্ণ প্রয়াসের জন্য প্রতিটি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে ১৫০ টাকা হিসাবে নগদ পুরস্কার দেওয়া হয়।

উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি ছাড়াও গ্রামাঞ্চলে স্বল্প সঞ্চয়কে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য শীতকালে শস্য তোলার মরসুমে জেলাগুলিতে বিশেষ সঞ্চয় অভিযান পরিকল্পনা করা হয়। এই সময় প্রচার, আলোচনা বৈঠক, প্রদর্শনী, যাত্রাভিনয়, চলচ্চিত্র প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন জেলার গ্রামগুলিতে স্বল্প সঞ্চয়ের বাণী পৌঁছিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়। এ ছাড়াও পাইলট প্রজেক্ট নামে পরিচিত একটি কার্যক্রম অনুসারে বিশেষভাবে নির্বাচিত কতকগুলি ব্লকে নিবিড় সঞ্চয় পরিকল্প চালু করা হয়েছে।

উপসংহার

ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার স্বল্প সঞ্চয় আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন তার একটা মোটামুটি পরিচয় দেওয়া হল। অবশ্য আমাদের এই বিরাট দেশের পক্ষে অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলিকে কোন ক্রমেই প্রয়োজনানুরূপ বলা চলে না। আমাদের জাতীয় উন্নয়নমূলক কার্যপ্রয়াসে আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংস্থানে স্বল্প সঞ্চয়ের যে বিরাট সম্ভাবনা আছে পরপর চারটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। জাতীয় স্বার্থে এই সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হলে স্বল্প সঞ্চয় আন্দোলনকে একটা গণ আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। গত ২০ বৎসরে স্বল্প সঞ্চয়ে বিস্ময়কর অগ্রগতি সত্ত্বেও ভারতের জনসংখ্যার মাত্র ৬ শতাংশকে এ পর্যন্ত এই আন্দোলনের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে পূর্ণ ফল পেতে হলে এখনও অনেক বেশি প্রয়াস করা প্রয়োজন।

স্বল্প সঞ্চয়ের প্রধান বাহন হল আমাদের ডাকঘরগুলি। এর অধিকাংশ পরিকল্পই ডাকঘরের সংগে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং স্বল্প সঞ্চয়ের সুযোগ সুবিধা আছে এরূপ ডাকঘরের সংখ্যা পল্লী এলাকায় যত বাড়বে স্বল্প সঞ্চয়ের ততই প্রসার ঘটবে। দুঃখের বিষয় আমাদের পল্লী এলাকাগুলিতে এরূপ ডাকঘরের সংখ্যা এখনও সীমিত। অবশ্য ভারত সরকার গ্রামাঞ্চলের এই অসুবিধা দূর করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করে চলেছেন। গ্রামাঞ্চলে যে সব অতিরিক্ত শাখা ডাকঘর আছে তাদের পোষ্টমাস্টারদের স্বল্প সঞ্চয়ে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং স্বল্প সঞ্চয়ের প্রসারে তাঁদের উৎসাহিত করার জন্য তাঁদের উদ্যোগে খোলা মেয়াদী জমার দরুণ তাঁদের শতকরা এক টাকা হিসাবে কমিশন দানের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। দুই দশকের অবিচ্ছিন্ন প্রয়াসে আমরা দেশের জনগণের একাংশকে স্বল্প সঞ্চয় সচেতন করে তুলতে পেরেছি। এখন কাজ হল এই সচেতনতাকে সংহত করা এবং জনসমাজের বৃহত্তর অংশে এ চেতনা সঞ্চারিত করা। এই সুসংহত প্রয়াসের উপর ভারতের অর্থনীতির সুস্থ অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভর করে।

বিচিত্র জনগোষ্ঠী
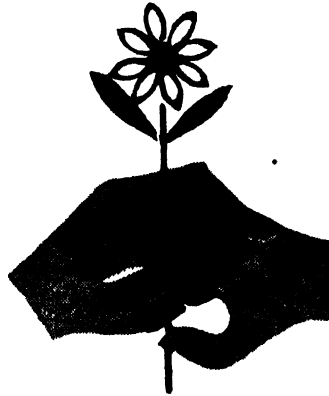
পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র জনসমাজের একটি অন্যতম অংশ হচ্ছে তফসিলী আদিবাসী গোষ্ঠী। বলা বাহুল্য, 'আদিবাসী' নামেই প্রকাশ, এই গোষ্ঠী যুগ যুগ ধরে ভারত-ভূমিতে বসবাস করে আসছেন বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির গঙ্গাধারার সঙ্গে সংযোগবিহীন হয়ে নয়, বরং পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে সম্যক পুষ্ট হয়ে, অথচ নিজস্ব রীতি-নীতি, ধরণ-ধারণ, আচার-বিচার প্রভৃতির মাধ্যমে গড়ে-ওঠা এক সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে। প্রাচীন আর্যদের সঙ্গে সংঘাত যে হয়নি এমন নয়, কিন্তু সংমিশ্রণও কম হয়নি। বস্তুতঃ, বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা এই সংমিশ্রণ এবং সমন্বয়ের পথ ধরেই এগিয়ে চলেছিল এবং এই মূল প্রবাহে আদিবাসী সংস্কৃতির অবদানও কম নয়, কোথাও তাঁরা দিয়েছেন, কোথাও তাঁরা গ্রহণ করেছেন; পারস্পরিক আদান-প্রদানই একে অপরকে সমৃদ্ধ করেছে।

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিন্তু ইংরেজ শাসনের আমলে ব্যাপারটা হয়েছিল অন্য-রকম। ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি সংঘাতের সম্মুখীন হয়েছিল। আপন সংস্কৃতির বৈশিষ্ট অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য তাঁদের যে বারবার ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর আঘাতকে প্রতিহত করবার চেষ্টা করতে হয়েছিল, সমকালীন ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। এবং এই বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল সারা ভারত জুড়েই। যেমন, ১৭৭০ এবং ১৭৭৯ সালের চুয়াড়-বিদ্রোহ, ১৭৮৩ সালের খাসিয়াদের বিদ্রোহ, ১৭৯৮ সালের গঞ্জাম জাগরণ, ১৮০৯ ও ১৮১৮র যথাক্রমে জাঠ ও ভীলদের বিদ্রোহ, ১৮৩১-৩২-এর কোল ও ১৮৩২-এর মানভূমের ভূমিজদের বিদ্রোহ; এবং এরপর আছে ১৮৩৯ ও ১৮৪৬ সালের যথাক্রমে নাগা ও ওড়িষ্যার খোন্দদের বিদ্রোহ। তবে, সব থেকে উল্লেখ-যোগ্য হচ্ছে সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরবের নেতৃত্বে ১৮৫৫ সালের সুবিখ্যাত সাঁওতাল-বিদ্রোহ। ১৮৫৭ সালের মুণ্ডাদের বিদ্রোহও অবশ্য কম উল্লেখ্য নয়।

এইসব সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতেই ইংরেজ সরকার আদিবাসীদের সম্পর্কে এক নতুন নীতি গ্রহণ করেছিলেন। সেই নীতিটি হল এই যে, আদিবাসীদের ওপর কোনো কিছু জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে না, তাঁরা তাঁদের নিজস্ব রীতি-নীতি, ধরণ-ধারণের দ্বারাই নিজেদেরকে চালিত করবেন, নিজেদের জায়গাতেই বসবাস করবেন।

আসলে কিন্তু ইংরেজ চেয়েছিল বৃহত্তর ভারতীয় সমাজ-বন্ধন থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে। এবং ইংরেজের এই বিভেদ-নীতির ফলে আদিবাসী সমাজ যে বঞ্চিত হয়েছিল তদানীন্তন উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সুফল থেকে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তার ওপরে গ্রাম্য মহাজন, ব্যবসায়ী, জমিদার, এদের শোষণ থেকেও বাঁচবার উপায় ছিল না তখনকার শাসকগোষ্ঠীর কোনো দরদ এদের ওপর না থাকার দরুণ।

স্বাধীনতার পরে অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটলো। অর্থনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আদিবাসী-সমাজকে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের সমকক্ষ করে তোলবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন জাতীয় নেতৃবৃন্দ। এ উদ্দেশ্যে সংবিধানে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কী, স্বাধীনতার পূর্বে এ'দের ওপর সরকারী ভাবে কোনো বিশেষ দৃষ্টিপাত ঘটেনি। যেটুকু তাঁদের দেখাশোনা করতেন, তা ঐ খৃস্টান মিশনারীরাই।

স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে নেতৃবৃন্দ বিশেষ সচেষ্ট হওয়ার ফলস্বরূপ বিভিন্ন রাজ্য সংবিধান-প্রদত্ত অধিকার ও নির্দেশক-নীতি প্রয়োগকল্পে অনুন্নত সম্প্রদায়ের সর্বাত্মক কল্যাণকর্মে ব্রতী হন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও ১৯৫২ সালের জুন মাসে একটি পুরোপুরি আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ স্থাপন করেন। জেলাস্তরে এ'দের সক্রিয় কর্মিবৃন্দ আছেন ছড়িয়ে। তাছাড়া আছে এ বিভাগের অধীনে একটি শিল্প শাখা এবং একটি সাংস্কৃতিক গবেষণা-কেন্দ্র। আদিবাসী জীবনপ্রবাহ ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণার জন্য এই গবেষণা-কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫৫ সালের জুন মাসে। এই কেন্দ্রটির মাধ্যমে আদিবাসী সম্পর্কিত বহু মূল্যবান গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে; এ'দের সংগ্রহশালাটিও যে বিশেষ আকর্ষণীয়, এ-ও নির্দ্বিধায় বলা যায়।

এ'দেরই প্রদত্ত একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গে তফসিলী বা তফসিলভুক্ত (Scheduled) আদিবাসী গোষ্ঠীর সংখ্যা ৪১ এবং এদের মোট সংখ্যা হল, ২৫, ৩২,-৯৬৯; এ'দের গোষ্ঠী-সংখ্যা ৪১ হলেও সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, ভূমিজ, লোধা প্রভৃতি ছয়টি গোষ্ঠীই প্রধান; লোকসংখ্যার দিক থেকে ধরলে এই ছয়টি গোষ্ঠীর লোকসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের মোট আদিবাসী সংখ্যার নব্বই শতাংশেরও কিছু বেশি।

সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মাপকাঠির বিচারে সমীক্ষকগণ পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করতে চান, (১) সমতল ভূমির আদিবাসী এবং (২) উত্তরবঙ্গের আদিবাসী। সমতল ভূমির আদিবাসী, যেমন, ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি শারীরিক গঠনের দিক থেকে প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং ভাষার দিক থেকে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষাভাষী। আর উত্তরবঙ্গের আদিবাসী, যেমন, ভুটিয়া, লেপচা, মেচ, টোটো প্রভৃতিরা মঙ্গোল গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে, টিবোটো-চাইনীজ পরিবার ভাষাভাষীর অন্তর্ভুক্ত।

উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই সব থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ আদিবাসী-সম্প্রদায় 'টোটো'দের কথা মনে আসে।

টোটো

জলপাইগুড়ি জেলার মাদারিহাট থানার এলাকাভুক্ত ছোট্ট একটি গ্রাম টোটোপাড়া। উত্তরে ভুটানের পাহাড় শ্রেণী, পূর্বে

তোর্সা নদী। দক্ষিণ-পশ্চিমে 'হাউরি' নদী একে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে 'টি-টি' নামক অরণ্য থেকে। টোটোপাড়ার সব থেকে কাছের গ্রাম হচ্ছে বল্লালগুড়ি, টোটোপাড়ার দক্ষিণে, প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। মাইল সাতেক দূরে হচ্ছে লঙ্কাপাড়া বাজার, ন'মাইল দূরে হান্তাপাড়া। যদিও টোটোপাড়ার সব থেকে কাছের রেলস্টেশন হচ্ছে হাসিমারা (দশ মাইল), তবুও টোটো-পাড়ায় যেতে গেলে সুবিধা হচ্ছে দলগাঁও অথবা মাদারিহাট স্টেশনে নেমে পড়া। দুটি স্টেশনেরই দূরত্ব অবশ্য টোটোপাড়া থেকে ১৬ মাইল।

পথের দুপাশে, বিস্তৃত বনভূমির দৃশ্য চমৎকার। অরণ্যে শাল, সিসু, সিরিং, শিরীষ, পিপুল প্রভৃতি মহীরূহ চোখে পড়ে, আর চোখে পড়ে উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট বেণুবনের জটলা।

টোটোদের নিজেদের মতে, তারা এই গ্রামে বসবাস করছে অন্তত সাত-আট পুরুষ ধরে। তার আগে নাকি এই যায়গাটা ছিল ভুটিয়াদের নিয়ন্ত্রণে, গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে এটি এসে-ছিল ব্রিটিশদের দখলে। তখন থেকেই ব্রিটিশ-নীতি ছিল টোটো-পাড়াকে শুধু টোটোদের জন্য সংরক্ষিত রাখা, অন্য কাউকে এখানে তখন বসবাস করতে দেওয়া হতো না। সমস্ত মৌজাটি আকারে প্রায় ৩·১২ বর্গমাইল, টোটো সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে টোটো-মণ্ডল বা প্রধানের নামে নথিভুক্ত করেছিলেন স্যাণ্ডার্স সাহেব ১৮৮৯-৯৪ সালের জরীপের সময়।

এই টোটোদের সম্পর্কে উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে, এরাই পশ্চিম-বঙ্গে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সংখ্যালঘু। ১৯৭১ সালে এদের জনসংখ্যা ছিল ৫৪৪ মাত্র, সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা অনু-সারে, ১৯৭৩এ এদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৮৫, তার মধ্যে পুরুষ ৩০০ এবং স্ত্রীলোক ২৮৫ জন।

টোটোদের জীবিকা ও অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রসঙ্গে এ-কথা বলা যায় যে, টোটোরা পূর্বে তাদের জমিতে শুধু কমলালেবু ফলাতো। প্রকৃতপক্ষে এই কমলালেবু উৎপাদনই ছিল তাদের অর্থনীতির ভিত্তিস্বরূপ। কমলালেবুর ফলন ও ব্যবসা ছাড়া টোটোরা কিছু কিছু 'কাওনি' আর 'মারুয়া'র চাষও করতো। কিন্তু বহু বছর হল, কমলালেবু উৎপাদন আস্তে আস্তে কমতে কমতে শেষ পর্যন্ত প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে; সম্ভবত ভূমিক্ষয় এবং জমির উর্বরতাজনিত অসুবিধাই এর মূল কারণ। এবং এরই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জীবিকার জন্য টোটোদের ভিন্নতর কোনো উপায় খুঁজে বার করা অপরিহার্য হয়ে উঠলো। নেপালীদের সংস্রবে এসে এরা ক্রমে চাষের কাজে পোক্ত হয়ে উঠতে লাগলো। পরিবর্তনশীল ঝুমচাষের সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী চাষের পদ্ধতিতেও আজ তারা সমান দক্ষ, এবং 'জোয়ার' জাতীয় 'মারুয়া' ও 'সামা'র সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই আজকাল সুবিধা মতো ধানচাষ করে থাকে। জুলাই-সেপ্টেম্বরে ভুট্টার স্থায়ী চাষের কাল, যাকে ওরা 'নেপালী মারুয়া' বলে, তার স্থায়ী চাষের কাল ডিসেম্বর-জানুয়ারি। যাকে ওরা বলে 'টোটো মারুয়া', তার ও 'কাওনি'র ঝুম চাষের সময় হলো যথাক্রমে মার্চ-এপ্রিল এবং অগাস্ট-অক্টোবর। বছরের বাকিটা সময় তারা করে জঙ্গল থেকে ফল-মূল আহরণ। জীবিকার আরও ছোট খাটো উপায় তাদের খুঁজে নিতে হয়। যেমন জঙ্গল থেকে বাঁশ কেটে নিয়ে এসে বাজারে বিক্রি করা, মুরগী পোষা ইত্যাদি। তবে, কায়িক শ্রমের দিক থেকে সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় বোধ হয় ভুটান থেকে বাণিজ্য-সম্ভার বহন করে বাজারে এনে বিক্রয় করা। এই বাণিজ্য সম্ভারের অন্যতম জিনিস হল,—কমলালেবু। অবশ্য এই প্রসঙ্গে এ-কথাও উল্লেখ করতে হবে যে, তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকার বিশেষ সচেষ্ট হয়েছেন। একটা হিসাব থেকে জানা যায়, ১৯৬৫ সাল থেকে রাজ্য সরকার তার আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের মাধমে টোটোপাড়ার বিবিধ উন্নয়ন বাবদ প্রায় ৩৯,৭১০ টাকা অনুদান হিসাবে মঞ্জুর করেছেন। জলের পাইপ-লাইনের প্রসার ও সংস্কার, কারিগরী, চাষের বলদ ক্রয় ইত্যাদি বাবদ এই অনুদান দেওয়া হয়েছে। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে শিশুদের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য, জল-সরবরাহ, শিক্ষা এবং কৃষির উন্নয়নের ওপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। টোটোপাড়ায় কোচবিহার

রিলিফ সোসাইটির উদ্যোগে একটি ডিসপেনসারি ও প্রাথমিক স্কুল তৈরি হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা বাংলা ভাষায়ও লেখাপড়া শিখতে পারছে, যদিও ওদের নিজেদের একটি কথ্যভাষা রয়েছে, যার সম্ভবত কোন লিপি নেই।

টোটোরা সাধারণভাবে উচ্চতার দিক থেকে মধ্যমাকার, গায়ের রঙ বাদামী, মাথার চুল সোজা ধরনের। কপাল দীর্ঘও নয়, চওড়াও নয়, মাঝারি। চোখ বড়ো নয়। চোখের নিচে ও পাশে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বলিরেখার প্রাদুর্ভাবও হয় যথেষ্ট। টোটোদের মধ্যে নানান গোষ্ঠীও আছে। বৃহত্তম গোষ্ঠী হচ্ছে,—'ডাংকোবেই' তারপরে 'ডাপ্টোবেই'। এরপরে আসে—বাদুবেই, বঙ্গোবেই, ডিকুবেই এবং নুরুংচাংকোবেই গোষ্ঠী। এ-ছাড়া আরও কয়েকটি গোষ্ঠী বিদ্যমান।

বিবাহ-রীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে বলতে হয়, এক-বিবাহ-রীতিই প্রধানত প্রচলিত, তবে পুরুষদের মধ্যে বহু বিবাহের নিদর্শনও যে একেবারে দেখা যায় নি, এমন নয়। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত, বিবাহ-বিচ্ছেদও অচল নয়। এদের সমাজে দুই রকম বিবাহেরই প্রচলন বেশি, একটি 'সম্বন্ধ-করা'র মাধ্যমে সাধারণ বিবাহ রীতি, যাকে ওরা বলে 'জিপেকা-বেহোইয়া',—আর একটি হচ্ছে, 'দাবা-বেহোইয়া',—যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কনে হয় বরের থেকে বয়সে বড়ো।

টোটোদের সব থেকে বড়ো উৎসব হচ্ছে 'ইসফা' দেবীর পুজো। এই দেবী হচ্ছেন সাধারণ হিন্দুদের মহাকালী। মন্দিরে থাকে দুটি ঢোল; এই ঢোলই মহাকালীর প্রতীক। পুরোহিত মদ, মাংস এবং চাল উৎসর্গ করে পুজো করে থাকেন মহাকালীর, পুজোর শেষে যথারীতি প্রসাদ বিতরণ করা হয়ে থাকে। এই উৎসব উপলক্ষে নৃত্য-গীতও হয়ে থাকে। ভাদ্র মাসের শেষে ন'দিন ধরে এই উৎসব চলে এবং উৎসবের শেষ দিন সবাই যথা-সম্ভব পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করে থাকে। এ-ছাড়া 'ওংচু', 'সারদে' প্রভৃতি উৎসবও তাদের আছে, যেগুলি চলে প্রতিটি তিনদিন ধরে।

টোটোপাড়া বা টোটোপল্লী কয়েকটি পাড়ায় বিভক্ত। পাড়াগুলির বিভিন্ন নাম, যেমন পঞ্চায়েত-গাঁও, মিত্রংগাঁও, মণ্ডল-গাঁও প্রভৃতি। এদের ঘরগুলিরও বৈশিষ্ট্য আছে। অধিকাংশই মাটি থেকে প্রায় ফিট তিনেক উঁচুতে বাঁশের মাচানের ওপর গড়ে উঠেছে।

রাভা

পশ্চিমবঙ্গে 'রাভা'দের প্রধানত দেখা যায় কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায়। এ-দুটি জেলায় পশ্চিমবঙ্গের মোট রাভা-সম্প্রদায়ের প্রায় ৭০ শতাংশ বাস করে বলে অনুমান করা হয়। বাকিরা ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন জেলায়। তফসিলী আদি-বাসী সম্প্রদায়-ভুক্ত এই রাভাদের সম্বন্ধে সাধারণ লোকে অতি অল্পই জানেন। ১৯৬১র আদমসুমারি অনুসারে এদের জন-সংখ্যা ছিল ৬,০৫৩ মাত্র। এদের একটি বড়ো অংশ বাস করে কোচবিহার-জলপাইগুড়ি জেলার পার্শ্ববর্তী আসাম রাজ্যে।

রাভারা যে 'মোঙ্গলয়েড'-গোষ্ঠীভুক্ত এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই, এবং গারো, কাছারি, মেচ, কোচ, হাজং প্রভৃতিদের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য আছে। তবে কাদের সঙ্গে ওদের বেশী সাদৃশ্য, সে বিষয় নিয়ে নানান মতভেদ আছে। বুকানন-হ্যামিল্টন এদের সঙ্গে 'পানি-কোচ'দের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন বেশি, আবার ডাল্টন সাহেব বলেছেন, রাভা ও হাজংরা কাছাড়ী জনগোষ্ঠীরই শাখা-বিশেষ। অপরপক্ষে, মেজর প্লেফেয়ার দেখেছেন রাভা ও গারোদের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য। রাভাদের একটি শাখা 'রংদানিয়া'দের সঙ্গে গারো-গোষ্ঠীর দুটি শাখা 'আতং' ও 'রুগা'দের সঙ্গে ভাষাগত বেশ মিল লক্ষ্য করেছেন তিনি। ফ্রেন্ড পেরেরাও আতং এবং রংদানিয়াদের সম্বন্ধের কথা সমর্থন করে-ছেন একটি কিম্বদন্তীর উদ্ধৃতি দিয়ে। তাঁর মতে, "আতংরা রংদানিয়াদেরই জ্ঞাতি; আতং আর রংদানিয়া দুই বোন 'সায়ে বোঙ্গা' আর 'বোঙ্গে কাতা'র বংশধর। বড়ো বোন একজন গারোকে বিয়ে করে। এদেরই সন্তান থেকে 'আতং'গোষ্ঠীর সৃষ্টি। কিন্তু ছোট বোন তার এক ভাইয়ের সঙ্গে মিলিত

হওয়ায় তাদের গোষ্ঠী থেকে বিতাড়িত করা হয়। এদেরই সন্তান থেকে 'রংদানিয়া রাভা'দের সৃষ্টি।"

কিন্তু রেভারেন্ড এন্ডেলের মতে, জনৈক হিন্দু একজন কাছারি মহিলাকে বিয়ে করায় সমাজচ্যুত হন, তাদেরই সন্ততি বলে বর্ণনা করা হয় রাভাদের। একটি সমীক্ষার ফলশ্রুতি-স্বরূপ শ্রীমণীশকুমার রাহা বলেন, "জলপাইগুড়ি আর কোচ-বিহারের রাভারা অধিকাংশই 'কোচ-রাভা'গোষ্ঠীতে পড়ে অর কিছু পড়ে 'পাতি রাভা'তে।"

কিন্তু সে যাই হোক, রাভারা দেখতে ছোটখাটো, গায়ের রঙ হলদে, নাক চ্যাপটা ধরনের, মাথার চুল খাড়া অথবা ঈষৎ কোঁকড়ানো।

পশ্চিমবঙ্গের রাভা সাধারণতঃ স্থানীয় কথ্যভাষাই ব্যবহার করে থাকে। শুধু বুড়োরা আর কিছু বয়স্ক রাভা এখনো পর্যন্ত তাদের রাভা-কথ্যভাষা বলে থাকে। নবীন রাভারা তাদের নিজে-দের এই মাতৃভাষা প্রায় ভুলে গেছে বললেই চলে। কখনো কখনো রাভারা নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় স্থানীয় বাংলা কথ ভাষা আর রাভা-ভাষার একটি মিশ্রণ ব্যবহার করে থাকে, এ-ও দেখা গেছে। রাভাদের নিজস্ব ভাষা-সম্পর্কে গ্রীয়ারসনের ধারণা, এই ভাষা 'বোডো'-ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। 'বোডো' ভাষা হচ্ছে আসাম শাখার আসাম-বর্মি'জ ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম। ফ্রেন্ড-পেরেরা 'বোডো' ছাড়াও গারো ভাষাগোষ্ঠীর 'আতং-ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন 'রাভা'-ভাষার।

রাভারা কৃষিকাজই করে থাকে, আর ওদের প্রধান ফসল হচ্ছে, ধান। আর একদল রাভা দিনমজুরীর কাজ করে থাকে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছোটখাটো ব্যবসা বা চাকরি করে থাকে। কিন্তু সে-সব রাভারা সরকারী বনবিভাগের অধীনস্থ অরণ্য-অঞ্চলে বাস করে, তারা সরকারেরই অধীনে বন-শ্রমিক হিসাবে কাজকর্ম করে, কৃষি তাদের দ্বিতীয় জীবিকা।

আঞ্চলিক দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাভাদের দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক, যারা গাঁয়ে বাস করে এবং কৃষিকেই তাদের মুখ্য জীবিকা বলে গণ্য করে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে, যারা সরকারী বনবিভাগের এলাকায় বন-শ্রমিক হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক বিবাহের ঘটনা খুবই কম ঘটে। ডাল্টন সাহেবের মতে, রাভারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, 'পাতি' আর 'রংদানিয়া'। পাতিরা বাঙালী হিন্দুদের ভাষা ও রীতিনীতি গ্রহণ করেছে বেশি, কিন্তু 'রংদানিয়া'রা তুলনায় বেশি রক্ষণশীল, তারা তাদের ভাষাভঙ্গী বজায়-রেখেছে নিজস্ব আচার-আচরণ অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করছে। এ-ছাড়া, এদের মধ্যে আরও অনেক উপ-শাখা বা উপ-গোষ্ঠী বিদ্যমান।

রাভাদের পরিবার-বিন্যাসের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মন্তব্য করতে হয়, এদিক থেকে অন্যান্য আদিবাসী-গোষ্ঠীর তুলনায় এদের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এ বৈশিষ্ট্য একমাত্র গারোদের সঙ্গে মেলে, আর কারো সঙ্গে তেমন নয়। এদের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক উভয় ধারাই বিদ্যমান, যদিও প্রথমোক্ত ধারাই বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। এক-বিবাহই এদের সাধারণ রীতি, যদিচ কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষের দুই বিবাহের দৃষ্টান্তও দেখা গেছে। তবে মেয়েদের পক্ষে একাধিক পতিগ্রহণ, এ-ব্যাপারটা দেখা যায় নি। রাভা-পরিবারগুলির যেখানে পিতৃতান্ত্রিক ধারা বিদ্যমান, সেখানে বাড়ীর জ্যেষ্ঠ পুরুষটিই কর্তা। তবে, ঘরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মেয়েদের কর্তৃত্ব অবশ্যই মেনে নেওয়া হয়। এমনকি, যে-সব পরিবারে মাতৃতান্ত্রিক ধারা প্রবহমান, সেখানেও পুরুষের কর্তৃত্ব লক্ষ্যণীয়। যদিও এ-সব ক্ষেত্রে 'পিতা'র কর্তৃত্ব ছাড়া আরেক জনের কর্তৃত্বও দেখা যায়, তিনি হচ্ছেন মায়ের ভাই, অর্থাৎ মামা। তবে, এখানেও 'পিতা'র কর্তৃত্বকে ছাপিয়ে 'মামা'র কর্তৃত্ব বড়ো হয়ে দেখা দেয় না, অন্যান্য মাতৃতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে রাভাদের সমাজের তফাৎ এইখানেই।

রাভাদের 'বিয়ে' অধিকাংশক্ষেত্রেই হয় সম্বন্ধ করে। এইসব

সম্বন্ধ-স্থাপন যথারীতি 'ঘটক'-এর মাধ্যমেই হয়। আরেক রকম 'বিয়ে' আছে, তাকে ওরা বলে, 'ঘরজাই'। এসব ক্ষেত্রে বর কনের বাড়ীতে গিয়ে থাকে, গতরে খেটে 'কন্যাপণ' শোধ দেয়। শোধ দেবার পর নতুন ঘর করে 'কনে'কে নিয়ে উঠে যায়; কখনো এমনও দেখা যেত যে, 'বর' তার নিজের বাড়ীতে ফিরে না গিয়ে বা নতুন ঘর না তুলে শ্বশুরবাড়ীতেই শেষপর্যন্ত থেকে গেছে। গরীব রাভা যুবক কন্যাপণ দেবার সামর্থ্য না থাকায় বিত্তশালী ভাবী শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে তাঁর ক্ষেতে খেটে কন্যাপণ শোধ করার চেষ্টা করে। ছ'মাস থেকে দু'বছর তার লাগে এই 'পণ' শোধ করতে। কখনো বা পুরো শোধ হবার আগেই বিয়েটা হয়ে যায়। অবশ্যই রীতিটা বহুলাংশে কমে গেছে বলে শোনা যায়।

রাভাদের মধ্যে এক-বিবাহ সাধারণ রীতি হলেও কোথাও কোথাও পুরুষের একাধিক বিবাহ দেখা গেছে, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে একাধিক বিবাহের কোনো নিদর্শন নেই। বিধবা ভ্রাতৃ-বধূকে বিয়ে করার রীতিও আজকাল রাভারা পছন্দ করে না. তবে ছোট শালীকে বিয়ে করার রীতি প্রচলিত আছে।

'কন্যাপণ' বলে যেটা ওদের মধ্যে প্রচলিত, সেটা ১০০ থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত ধার্য হতে পারে। ওদের মধ্যে 'বর'কে পণ দিতে হয় না. দিতে হয় 'কন্যাপণ'। যদি কোনো মৃতদার বা বিবাহ-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি কোনো বিধবা বা বিবাহ-বিচ্ছিন্ন মহিলাকে বিবাহ করে, তাহলে তাকে কন্যাপণ দিতে হয় ২০ থেকে ৬০ টাকার মধ্যে। রাভা-সমাজে নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপন সীমাবদ্ধ, যদিও কোনো কোনো হিন্দুসম্প্রদায়-ভুক্ত 'জাতি'র সঙ্গে বিবাহ সমাজ অনুমোদন করে থাকে, কিন্তু মেচ বা গারোর সঙ্গে বিবাহ অনুমোদন করা হয় না। সাধারণত কোনো হিন্দু ব্যক্তি যখন কোনো রাভা-মেয়েকে বিয়ে করে, তখন সে আর তার নিজের সমাজভুক্ত থাকে না, রাভা-সমাজভুক্ত হয়ে যায়।

সাধারণভাবে সম্বন্ধ করে যে বিয়ে হয়, তার রীতিনীতি বহুলাংশে সাধারণ হিন্দুদের মতোই। ঘটক কনের খবর আনলে বরের বাপ কয়েকজন আত্মীয়স্বজন সঙ্গে করে গ্রামের পুরোহিত (অধিকারী) ও গ্রামের মোড়ল (মহৎ)কে সঙ্গে করে কনে দেখতে যান। আবার পরে মেয়ের বাপও অনুরূপভাবে পাত্র দেখতে আসেন। উভয়ক্ষেত্রেই সমান আদর-আপ্যায়ন চলে। আগে মুখ-হাত ধোবার জল দেওয়া হয়, তারপরে দেওয়া হয় সাধ্যমতো কিছু মিষ্টি আর একপাত্র করে 'চাকৎ' (চাল থেকে তৈরি এক ধরনের স্থানীয় মদ্য-বিশেষ)। তবে, অধিকতর হিন্দুভাবাপন্ন ঘরে 'চাকৎ'-এর বদলে 'চা' দেওয়া হয় আজকাল। 'চাকৎ' বা 'চা'-এর পরে দেওয়া হয় পান-সুপারি।

প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে, রাভাদের কৃষিকেন্দ্রিকও বহু অনুষ্ঠান আছে। ঋষি বা মহাকাল ওদের সর্বোচ্চ দেবতা। তাছাড়া আছেন বিশ্বকর্মা, শিব, কালী, নারায়ণ, কামাখ্যা, শীতলা, গঙ্গাদেবী প্রভৃতি। তবে এসব পূজার মধ্যে কামাখ্যা পূজার উৎসবটাই সব থেকে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে এদের সমাজ-জীবনে। আষাঢ় মাসের সংক্রান্তির দিনে করা হয়ে থাকে এই উৎসব।

রাভারা সাধারণতঃ নিরীহ, সৎ এবং পরিশ্রমী। এদের ঘরগুলি দু-ধরনের। এক, যা ওরা নিজেরা তৈরি করে নেয়। দুই, যা সরকার থেকে করে দেওয়া হয়। নিজেদের ঘরগুলি ওরা সাধারণত করে দো-চালা। কিছু কিছু চার চালাও দেখা যায়। ঘরগুলি হয় বেশ ঝকঝকে তকতকে, দাওয়া প্রায়ই বেশ উঁচু। বেশ যত্ন করে গোবর দিয়ে লেপা। এক সময় এরা দলবদ্ধ হয়ে শিকার করতে যেতো বনে, আজকাল সে প্রথা দ্রুত লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

লেপচা

লেপচাদের আদি বাসভূমি সিকিম। বহুকাল আগে সেখান থেকে তাঁরা দার্জিলিং চলে আসেন। লেপচারা গোড়ায় তিনটি দলে বিভক্ত ছিলেন। এই দলগুলির নাম হচ্ছে রিংজং মু, তামজং

মু এবং ইলাম মু। লাপচা ভাষায় মু মানে অধিবাসী। কাজেই রিংজং মু, তামজং মু এবং ইলাম মু মানে রিংজং, তামজং ও ইলাম-এর অধিবাসী। এই স্থানগুলি সিকিমের তিনটি অঞ্চল।

বহুকাল আগে তিব্বতের এক রাজপুরুষ (বর্তমান সিকিমের মহারাজার পূর্বপুরুষ) একদল তিব্বতীকে নিয়ে সিকিমে আসেন এবং সিকিমের রাজা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। সিকিমের জমির উর্বরতা দেখে তিব্বতীরা সিকিমেই বসবাস করতে শুরু করে। সিকিম তখন 'চালের দেশ' নামে অভিহিত হত। শান্তিপ্রিয় লেপচারা তিব্বতীদের বাধা দেন নি এবং ক্রমে তাদের অধীনস্থ হয়ে পড়েছেন। প্রথমে বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে অনবরত বিরোধ লেগে থাকতো, কিন্তু 'ফুন্তশগ নামগিয়াল'-এর সময় থেকে মহারাজা ও প্রজাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সময় থেকে সিকিমে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে। দেখা গেছে সিকিমের রাজপরিবারের অনেকে লেপচাদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন।

সাধারণতঃ পাহাড়ের ঢালু অংশে অবস্থিত লেপচা গ্রামগুলিকে বস্তী বলা হয়। চাষের জমি এবং জলের উৎস যেখানে কাছাকাছি সেখানেই সাধারণত এই বস্তী গড়ে উঠেছে।

অধিকাংশ লেপচা গ্রামে 'গুম্ফা' (পূজা-অর্চনার স্থান) রয়েছে। এটাই সাধারণতঃ লেপচাদের মিলিত হবার স্থান এবং এখানেই সবরকম অনুষ্ঠান ও পার্বণ সম্পন্ন হয়। লেপচাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে গুম্ফার প্রভাব অনস্বীকার্য।

লেপচাদের মধ্যে যাঁরা কৃষিজীবী, তাঁদের একশ্রেণী আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ-আবাদ করেন, আর শ্রেণী আধুনিক চাষের পদ্ধতি অনুসরণ করেন না। এ'দের কৃষি-উৎপাদনের হারও অত্যন্ত কম। এবং কৃষিজীবী লেপচাদের মধ্যে এই শ্রেণীর কৃষকের সংখ্যাই বেশি। এই শ্রেণীকেও আবার তিন অংশে বিভক্ত করা যায়ঃ (১) সম্পূর্ণটা নিজের বা প্রধানত নিজের জমির মালিক, (২) সম্পূর্ণটা নিজের নয় বা প্রধানত নিজের নয় এমন জমির মালিক এবং (৩) ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক।

বর্তমানে অবশ্য অনেক লেপচা শিক্ষকতা এবং সরকারী চাকরি রাখেন। কৃষিজীবী সাধারণত তাঁদের গৌণ পেশাও একটা রাখেন। অধিকাংশ লেপচা কৃষিকাজের সঙ্গে সঙ্গে দিনমজুরী বা হস্তশিল্পে নিযুক্ত থাকেন। যাঁরা অকৃষিজীবী কৃষি তাঁদের গৌণ পেশা। বর্তমান সরকারের নীতি হচ্ছে আদিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং এজন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকার আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের মাধ্যমে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল সরবরাহ, শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে উন্নয়ন পরিকল্প রূপায়ণের ব্যবস্থা করেছেন।

লেপচাদের চিরাচরিত হস্তশিল্প হচ্ছে হাতে-বোনা তাঁত-শিল্প। এ'দের মধ্যে কিছু বিশেষজ্ঞ হস্তশিল্পী আছেন এবং কেউ কেউ তাঁদের জীবিকার জন্য কাঠের কাজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে থাকেন। লেপচাদের সৌন্দর্যবোধ জন্মগত, কিন্তু এই রকম শিল্পকর্মের চাহিদা কম থাকায় তাঁরা অন্য কোনো কাজ করতে বাধ্য হন।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার লেপচাদের কতকগুলি শিল্প-কর্মে শিক্ষণ দানের জন্য বৃত্তি দিয়ে থাকেন।

লেপচারা প্রাচীর চিত্রাঙ্কনে বিশেষ পারদর্শী। ও'দের বৌদ্ধ মঠগুলি প্রাচীরচিত্রে সুশোভিত।

লেপচা পুরুষ ও নারীর পোশাককে লেপচা ভাষায় যথাক্রমে 'দম পা' ও 'দম দিয়াম' বলে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লেপচা পুরুষের পোশাককে বলে পাগি। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা, হাত দুটো খালি রেখে গায়ে পরা হয় এবং কোমরে বাঁধা থাকে। পাগি লেপচাদের ধর্মীয় পোশাক।

লেপচাদের গায়ের রঙ খুব সুন্দর। তাঁরা কোনো প্রসাধন বা কৃত্রিম অঙ্গসজ্জার জিনিস ব্যবহার করেন না। মাথার চুল

লেপচা নারীর গর্বের বস্তু। দুইদিকে বিনুনি করে তাঁরা চুল বাঁধেন।

লেপচারা আভ্যন্তরীণ দশটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এই দশটি গোষ্ঠী ছাড়াও কতকগুলি উপ-গোষ্ঠীও আছে।

এইসব গোষ্ঠীর উৎপত্তি সম্পর্কে দুটি গল্প শোনা যায়। একটি সংগে আছে যে, লেপচাদের দেবতা 'তাক-বো-থিং' এবং তাঁর পত্নী 'না-জং-মিউ'-এর সাতটি কদাকার পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। এই সাত পুত্র নবজাত অষ্টম পুত্রকে হত্যা করে। অষ্টম পুত্র দেখতে খুব সুন্দর হয়েছিল। অষ্টম পুত্রের শোকে তার পিতামাতা উৎ সাত পুত্রকে নির্বাসিত করেন। তার পরে এ'দের দশটি খুব সুন্দর পুত্র জন্মায় এবং এই দশ পুত্রই লেপচাদের পূর্বপুরুষ। এই দশ ভাই বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্রষ্টা।

১৯৬১ সালের আদমসুমারি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের লেপচা জনসংখ্যা ছিল ১৫,৩০৯[১]। ১৯৫১ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৩,৪৩০।

লেপচাদের ভাষা তিব্বতীয়-চীনা গোষ্ঠীর তিব্বতীয়-হিমালয় শ্রেণীভুক্ত। এতে মুণ্ডারি ভাষারও প্রভাব রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে লেপচারা এখনও তাঁদের মাতৃভাষায় কথা বলেন, কিন্তু সাধারণভাবে শহরাঞ্চলে এ'দের ভাষায় নেপালী ভাষার প্রভাব বেশি।

মেচ

অশীতিপর বৃদ্ধ কানুরাম বসুমাতারি একটি রামায়ণ-কাহিনী বলেছিলেন। কানুরাম জাতিতে মেচ, জলপাইগুড়ি-অঞ্চলে ছিল তাঁর বাস। তিনিও আবার কাহিনীটি শুনেছিলেন তাঁর বাবার কাছ থেকে খুব ছোট বেলায়। পরবর্তী কালে রামায়ণের আসল কাহিনী তিনি জেনেছিলেন, কিন্তু ছোটবেলায় শোনা রামায়ণের এই বিচিত্র রূপায়ণ তিনি কখনো ভুলতে পারেন নি, কারণ, কাহিনীটি যেভাবে তাঁদের মধ্যে একদিন প্রচলিত ছিল, তার বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হবার নয়। তাঁর কাছ থেকে শোনা বিচিত্র কাহিনীটি হল এই :—

রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাই। রাম ছিলেন রাজা, লক্ষ্মণ তাঁরই ছত্রছায়ায় বাস করছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণের বিয়ের সময় এমন একটা ঘটনা ঘটলো, যার ফলে রাম-লক্ষ্মণে বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

লক্ষ্মণের বিয়ের ভোগের সময় মাংসের পরিমাণ কম পড়ে গেল। একজন চাকর তাড়াতাড়ি এসে রামকে খবরটা জানিয়ে দিলো। রাম সমস্যাটা চিন্তা করছেন আর চাকরকে কী বলবেন ভাবছেন, এমন সময় একজন মুনি দেখা করতে এলেন রামের সংগে,—মুনির নাম,—বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্রের সংগে কথাবার্তায় এমন মগ্ন হয়ে গেলেন রাম যে, মাংসের কথাটা বেমালুম ভুলে গেলেন। সেই সময় আবার গৃহ-প্রাঙ্গণে একটা গরু এসে ঢুকলো, ঢুকে প্রাঙ্গণ নোংরা করতে লাগলো। রাম মুনির সংগে কথা বলতে বলতে চাকরটির দিকে একটু তাকিয়ে মাথা নাড়লেন, অর্থাৎ বলতে চাইলেন,—গরুটা তাড়িয়ে দাও। কিন্তু চাকরটা ভুল বুঝলো। সে ভাবলো, রাজা বুঝি সমস্যার সমাধান করতে চাইছেন গরুটাকে কাটবার হুকুম দিয়ে। চাকরটা গরুটাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

তারপরে, যখন সমস্ত ভোজ-টোজের ব্যাপার সারা হয়ে গেছে, তখন রামের মনে পড়লো, একটি চাকর এসে ভোজে মাংসের পরিমাণ কম পড়ার অভিযোগ করেছিল। রাম তাড়াতাড়ি চাকরটিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, মাংস-সমস্যার সমাধান শেষ পর্যন্ত হল কী করে?

চাকরটা বললে,—আজ্ঞে, আপনি যা বলেছিলেন, তা-ই করা হয়েছে।

রাম ব্যাপারটা ঠিক বুঝলেন না। ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠলো তাঁর। বললেন,—তার মানে! আমি কী বলেছিলাম?

—"আজ্ঞে"—বলে চাকরটি মাথা চুলকাতে লাগলো বিব্রত ভঙ্গীতে, আর কিছু বলতে পারলো না।

রামের কণ্ঠস্বর তীব্র হয়ে উঠলো, বললেন, "কী হয়েছে, ঠিক করে বলো।"

এরপর, যা সত্যি ঘটেছিল, তা আর লুকানো রইল না। শুনে রাম একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

কিন্তু, যা হবার হয়ে গেছে, এবার এর একটা বিহিত না করলেই নয়। রাম সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠালেন লক্ষ্মণকে।

লক্ষ্মণ এলেন। রাম বললেন, "তোমার বিয়েতে গরুর মাংস পরিবেশন করা হয়েছে। অতএব—আর তুমি হিন্দু নও। তুমি মুসলমান।

বৃদ্ধ মেচ কানুরাম-কথিত এই রামায়ণ-কাহিনীটি সত্যিই অদ্ভুত। রামায়ণের সঙ্গে এর মিল নেই, কিন্তু কাহিনীটির ভিতর থেকে সরল মেচ-জাতির একটা বিস্মিত প্রশ্ন ভাষা পেয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে হঠাৎ কেন বৈরীভাব দেখা দিয়েছিল? যারা পাশাপাশি চিরকাল ভাইয়ের মতো বাস করেছে, তাদের মধ্যে এ সংঘাত কেন গড়ে ওঠে, এটা বোধহয় সেকালের মেচজাতীয় প্রবীণেরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারত না। আমাদের মনে হয়, এদের এই প্রশ্ন থেকেই ধীরে ধীরে একদিন জন্ম নিয়েছিল এই কাহিনী।

রামায়ণের এই ছোট্ট কাহিনীটি কী করে এলো, সে-সম্বন্ধে সঠিক কোনো সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রাচীন মেচদের মধ্যে এ-কাহিনীটি প্রচারিত ছিল।

জলপাইগুড়ি জেলার 'মেচ'-দের সম্বন্ধে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেন, এরা বৃহৎ কাছারি গোষ্ঠীরই একটি শাখা। এরা নিজেদের 'বোডো' বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। প্রাচীন শিলালেখ আর পুরাণ-কাহিনীর সাহায্যে অনুমান করা যায়, এরা এই সব অঞ্চলে বাস করছে খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দী থেকে। পদ্মপুরাণে 'ম্লেচ্ছ' কথাটির উল্লেখ দেখা যায়; ম্লেচ্ছ-জাতির কিছু বিবরণও পাওয়া যায়। এদের কথ্য-ভাষাকে 'পিশাচ' ভাষা বলেও উল্লেখ করেছেন পদ্ম-পুরাণ। পরবর্তীকালে মুসলমান ঐতিহাসিকরাও মেচ-জাতির উল্লেখ করে গেছেন। মীর জুমলা যখন আসাম আক্রমণ করেন, তখন কোনো এক মেচ-সর্দার তাঁকে সাহায্য করেন বলে জানা যায় তাঁদের বিবরণ থেকে।

অপরপক্ষে, মেচদের কাহিনী-কিংবদন্তীগুলি সাক্ষ্য দেয়, ১৬শ শতাব্দীতে যে কোচ-সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে, তাতে মেচদের অবদান বড়ো কম ছিল না। জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে, কোচরা হচ্ছে 'বোডো'দেরই হিন্দু-হয়ে-যাওয়া অথবা 'অর্ধ-হিন্দু' শাখা—এদের সঙ্গে যুক্ত 'মচ' আর 'থারু'রা। কোচ-সাম্রাজ্য গড়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে 'বোডো'দের একটি অংশ খুব তাড়াতাড়ি হিন্দু-ভাবাপন্ন হয়ে পড়তে থাকে, আর মেচরা এই বেগবতী হিন্দুধারা থেকে বহুদিন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে যায়। গত শতাব্দীর ৮ম দশকে এই জেলায় চা-বাগানগুলি গড়ে ওঠবার আগে পর্যন্ত মেচরা এখানকার পার্বত্য অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেই বাস করত। সমতল অঞ্চল থেকে ওদের কাছে তখন যেতো মুসলমান আর হিন্দু ব্যাপারীরা, লবণ-টবনের বিনিময়ে ওদের কাছ থেকে তুলা নিয়ে ফিরে যেতো। মেচরা তুলার উৎপাদন করত তখন। কিছু কিছু বনজাত দ্রব্য আর পাথর-টাথরও মেচরা সংগ্রহ করতো ভুটিয়াদের কাছ থেকে, সেগুলিও বিনিময়ের মাধ্যমে নিয়ে যেতো সমতলের ব্যাপারীরা। এই ব্যবস্থা চলতে চলতে কিছু কিছু মেচও মাঝে মাঝে সমতলের বাজারে যেতে আরম্ভ করলো তাদের দ্রব্যাদি নিয়ে। সমতলের লোকদের সঙ্গে পার্বত্য প্রাচীন মেচদের এইভাবে খানিকটা সংযোগ হলেও, মেলা-মেশার ভাবটা তখন খুব সীমিত ছিল। ফলে, ব্যবসায়িক যোগটা পুরোপুরি সাংস্কৃতিক যোগাযোগে গিয়ে দাঁড়ায় নি। রামায়ণের কিছু কাহিনী তারা শুনেছে হিন্দুদের কাছ থেকে, মুসলমান-

দের কিছু কাহিনী শুনেছে মুসলমানদের কাছ থেকে,—আর সঙ্গে সঙ্গে এটুকুও বুঝেছে, একটা বৈরীভাব গড়ে উঠছে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে। এই বোধ থেকেই তাদের মধ্যে সম্ভবত উক্ত অদ্ভুত রামায়ণ-কাহিনীর উদ্ভব হয়েছিল।

তা যাই হোক, 'বোডো'দের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা যা অনুমান করেন, তা হল—আসামে অহোমদের অভ্যুত্থান ঘটে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। তার বহু আগে থেকেই পুরো ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা জুড়ে বসবাস করত 'ইন্ডো-মঙ্গোলয়েড' শ্রেণীভুক্ত একটি জাতি, যাদের বলা হত, 'বোডো'। পূর্ব এলাকার 'বোডো'দেরই একটি শাখা হচ্ছে 'কাছারি'। অনুমান করা হয়, কাছারিরা উত্তর অঞ্চলে প্রথম বসবাস করতে শুরু করে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীর আর ধানশিরি নদীর পাশে পাশে। ডিমাপুরে গিয়ে আশ্রয় নেয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। ষোড়শ শতাব্দীতে অহোমরা ডিমাপুর আক্রমণ করায় কাছারিরা উত্তর কাছাড়ের মাইবং-এলাকায় সরে যেতে বাধ্য হয়। পরে, ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তারা শিলচরের নিকটবর্তী খাসপুরে সরে যায়। কাছারি উপনিবেশের শেষ কাছারি রাজা গোবিন্দচন্দ্র মারা গেলে কাছারি রাজ্য ১৮৩২ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়। কাছারি রাজারা এইভাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থান-পরিবর্তন করলেও সাধারণ কাছারিরা যেখানে ছিল সেখানেই থেকে যায়। এই জন্যই কাছাড়ের চা-এলাকাতেই শুধু কাছারিদের দেখা যায় না, কাছারিদের দেখা যায় দরং, কামরূপ, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি আসামের নানান জায়গায়। এইভাবে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে কাছারিরা ক্রমে ক্রমে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, কাছারিদের এই বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন নামে পরিচিত হতে থাকে। এইভাবেই কোচদের উৎপত্তি, রাভাদের উৎপত্তি, মেচদের উৎপত্তি।

বুকানন সাহেব এদের 'কামরূপের এক আদিবাসী-সম্প্রদায়' বলে আখ্যাত করে অতঃপর বলেন যে, গোয়ালপাড়া জেলায় মেচপাড়া বলে যে একটি বৃহৎ এলাকা আছে, তার নাম যে 'মেচ' জাতির নাম থেকে এসেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং ঐ মেচপাড়ার মালিক একজন মেচ। কিন্তু তিনি এবং তাঁর লোকেরা নিজেদের 'মেচ' না বলে 'রাজবংশী' বলে পরিচয় দিতে চান। ফাদার হার্মান্স তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন আর এক কাহিনী। নেপালে 'রাই'দের মধ্যে চিরাচরিত এক বিশ্বাস আছে, যে, তাঁদের আদি পিতা 'পুরুঙ্গো', আর আদি মাতা সিমনীমা। এ'দের ছিল তিন পুত্র, লাপচে, জিমদার আর মেচে। এরা বড়ো হলে বাপ-মা এদের ডেকে বলেন, "তোমরা তিনজন বেরিয়ে পড়ো। বেরিয়ে নিজে নিজে এক-একটি দেশ খুঁজে নিয়ে স্বাধীনভাবে বসবাস করো।

তারা পিতৃ-মাতৃ আজ্ঞা পালন করে। এইভাবেই সৃষ্ট হয় তিনটি উপজাতি—লেপচে, জিমদার আর মেচে।

১৯৬১ সালের আদমসুমারি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গস্থিত মেচদের জনসংখ্যা ছিল ১৩,৯১৫। এই সালের আদমসুমারিতে দেখা যায়, মোট মেচ-জনসংখ্যার ৯৭ শতাংশ লোকই জলপাইগুড়ি জেলার পর্বত-ঘেঁষা অঞ্চলে বাস করে। বাকি মেচরা বাস করে কোচবিহার আর দার্জিলিঙ জেলায়।

মেচদের প্রধান উপজীবিকার কথা বলতে গেলে, প্রথমেই চাষের কথা বলতে হয়। ঝুম চাষই এদের অভ্যস্ত বিষয় ছিল। এ-ছাড়া, সুতো তৈরি করা, তাঁতে কাপড় বোনা, মাছধরা ইত্যাদি জাতীয় কাজেও এরা বিশেষ উৎসাহী ও দক্ষ। চাষের ব্যাপারে আজকাল এরা অবশ্য। 'স্থায়ী চাষ'-এই অভ্যস্ত, ঝুম চাষ আর এদের মধ্যে নেই বললেই চলে। আবার অনেকে অরণ্য-বিভাগে কাজ নিয়ে অরণ্য-শ্রমিক হিসাবেই জীবিকা নির্বাহ করে। কেউ কেউ অবশ্য চাকরি করছেন বিভিন্ন বিভাগে, যেমন, পুলিসে, শিক্ষকতায় এবং অন্যান্য বিভাগে ; ব্যবসাও করছেন কেউ কেউ।

মেচরা কাছারিদের মতো তাদের সর্বোচ্চ দেবতা 'বাথৌ'র

প্রতীক হিসাবে 'সিজ' গাছের পূজা করে থাকে। এদের অন্যান্য চিরাচরিত দেবতা হচ্ছেন মহাকাল, মাইনাও, আইমনসা, টিসু-বুড়ী, ইত্যাদি। আজকাল এদের সর্বোচ্চ দেবতা 'বাথৌ'কে 'শিব' বলে আখ্যাত করা হচ্ছে, আর 'বাথৌ'-এর স্ত্রী 'মাইনাও'কে কোথাও 'লক্ষ্মী', আবার কোথাও 'দুর্গা' বলা হচ্ছে।

গ্রীয়ারসন সাহেবের মতে, এদের কথ্যভাষা আসাম-বর্মা গোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং আসামী কথ্যভাষার সঙ্গেই এর মিল বেশি। কিন্তু জনৈক বিশেষজ্ঞর মতে, আসামী ভাষাগুলির বোডো-ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত সমতলবর্তী কাছারি কথ্যভাষার সঙ্গেই মেচ-ভাষার মিল সব থেকে বেশি। মেচদের অধিকাংশই তাঁদের বাড়ীতে নিজেদের মধ্যে নিজেদের ভাষায় কথাবার্তা বলেন, তবে প্রায় সকলেই দ্বি-ভাষাভাষী। বহু মেচ জোতদার-পরিবারই ভালোভাবা বাংলায় কথাবার্তা বলতে পারেন।

শিক্ষার প্রসারের কথা বিবেচনা করে দেখলে বোঝা যায়, অন্যান্য অনগ্রসর আদিবাসীদের তুলনায় এদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার বহুলাংশে সন্তোষজনক।

মেচরা সাধারণভাবে কতগুলি গোষ্ঠী বা গোত্রে বিভক্ত। বর্তমানে এক-বিবাহই এদের মধ্যে প্রচলিত। বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা খুব কম, এবং এটা সাধারণভাবে মেচরা তেমন পছন্দও করেন না। এককালে বিয়ের কনে সংগ্রহের জন্য ভাবী বরকে শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে মজুরের কাজ করে কন্যাপণ সংগ্রহ করতে হত, এখন অবশ্য সে-ব্যবস্থা বিরল হয়ে গেছে।

ভুটিয়া

১৯৬১ সালের আদমসুমারি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের ভুটিয়া জনসংখ্যা ছিল ২৩,৫৯৫। প্রধানতঃ দার্জিলিং জেলাতেই এ'দের বসবাস।

মিঃ চার্লস বেল ভুটিয়াদের আদি পরিচয় বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "সিকিমে এখন তিনটি জাতি আছে—সিকিম, লেপচা ও নেপালী। পূর্ব তিব্বত থেকে প্রথম তিব্বতীরা এখানে আসার আগে পর্যন্ত লেপচারাই ছিলেন সিকিমের আদি অধিবাসী। তিব্বতীরা এখানে এসে দেশের নিয়ন্ত্রণাধিকার হস্তগত করেন। এইসব তিব্বতী দীর্ঘকাল সিকিমে বসবাস করছেন এবং তাঁরাই সিকিমী বলে অভিহিত। তিব্বতের লোকেরা এ'দের 'দেন-জং-পা' অর্থাৎ দেন-জং এর লোক বলে অভিহিত করেন। তিব্বতী ভাষায় সিকিমের নাম দেন-জং। ইউরোপীয়রা ও ভারতীয়রা বলেন ভুটিয়া বা ভোটিয়া। ভোট (ভারতীয় ভাষায় তিব্বতের নাম) থেকে আগত সকলকেই এই নামে অভিহিত করা হয়।"

জাতিগতভাবে ভুটিয়ারা ছিলেন প্রধানত পশুচারণ, পশু-পালন, কৃষি ও ব্যবসায় প্রভৃতিতে লিপ্ত। তিব্বতের সঙ্গে ব্যব-সায় ছিল তাঁদেরই হাতে, কিন্তু তিব্বতে নতুন শাসন প্রবর্তিত হবার পর তাঁদের এই ব্যবসা দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তার ফলে তাঁদের অর্থনৈতিক দুর্দশা বেড়েছে। বর্তমানে অনেকে অফিসে চাকরি করছেন, শিক্ষকতাও নিয়েছেন অনেকে পেশা হিসাবে।

পশ্চিমবঙ্গে ভুটিয়ারা সাধারণত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। খৃষ্টানও কিছু আছেন।

তিব্বতের পূর্ব-অঞ্চলের তিব্বতী ভাষার একটি রূপ ভোটিয়া। তিব্বতীরা নিজেদের বোডপা (উচ্চারণ—ভো-পা) বলেন, যা ভারতীয় উচ্চারণে হয়ে দাঁড়িয়েছে ভোট্টা, ভুটিয়া প্রভৃতি। গ্রিয়ার্সনের মতে তিব্বতের আদি অধিবাসী যাঁরা ভুটানে বসবাস করেন তাঁদের ভুটিয়া বলা হয়। ভুটান, সিকিম এবং নেপালের ও গারোয়ালের কিয়দংশে ভুটিয়া ভাষা প্রচলিত। ভুটিয়াদের মধ্যে অনেক উপ-শাখা রয়েছে এবং এইসব শাখার প্রত্যেকের ভাষা স্বতন্ত্র, কিছু মিল রয়েছে তিব্বতী ভাষার সঙ্গে।

অন্যান্য আদিবাসীদের তুলনায় ভুটিয়ারা শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক অগ্রসর।

ভুটিয়া জনসংখ্যার অধিকাংশই লামা বা পুরোহিত। গ্রামে লামারা এবং জনসাধারণ কেবলমাত্র কয়েকটি শব্দের একটি মন্ত্র সর্বক্ষণ উচ্চারণ করেই তাঁদের ধর্মীয় সাধনার কাজ মোটামুটি সম্পন্ন করেন। সেই মন্ত্রটি হল 'ওঁ-মণি-পদ্মে-হুং।'

ভুটিয়া সমাজে এক কালে বহু বিবাহের চল ছিল বলে শোনা যায়। আর জীবিকার দিক থেকে তাঁতশিল্পে ভুটিয়াদের পারদর্শিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভুটিয়ারা সাধারণতঃ যে পোশাক ব্যবহার করেন তা স্থানীয়ভাবে তৈরি। অবশ্য তাঁদের ব্যবহৃত রেশম ও অন্যান্য দামী পোশাক আমদানি হয় বাইরে থেকে।

সাঁওতাল

গত ১৯৬১ সালের আদমসুমারি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালদের জনসংখ্যা ছিল ১২,০০,০১৯, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ৫৮·৪২ শতাংশই হচ্ছে সাঁওতাল। পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই এ'রা ছড়িয়ে আছেন। তার মধ্যে, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মালদহতে এ'রা বাস করছেন বহু পুরুষ ধরে। ফলে, এসব জায়গায় এ'দের যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, তকে রীতিমত ঐতিহাসিক বলা চলে।

কারুর কারুর মতে সাঁওতাল জাতি উদ্ভুত হয়েছেন একটি সুবৃহৎ দ্রাবিড়গোষ্ঠী থেকে, ভাষার দিক থেকে বিচার করলে এ'দের 'কোলারিয়ান' বলা চলে। জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে, সাঁওতাল শব্দটি 'সাওনতার'-এর অপভ্রংশ। এই নামটি এ'রা গ্রহণ করেছিলেন কয়েক পুরুষ ধরে এই দেশে বসতি স্থাপন করার পর। 'সাওন্ত' বা 'সামন্তভূমি' ছিল প্রাচীন মেদিনীপুরের অন্তর্গত বা মেদিনীপুর-সংলগ্ন। এই সামন্তভূম বা সাওন্তদেশে দীর্ঘকাল বাস করার জন্যই এ'রা 'সাওন্তার' বা 'সাঁওতাল' বলে পরিচিত হন বলে কেউ কেউ মনে করেন।

জাতিতত্ত্ব-বিচারে সাঁওতালদের প্রোটো-অস্ট্রালয়েড অথবা প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্গত বলে ধরা যেতে পারে। সাঁওতাল-জাতির উৎস সম্পর্কে এ'দের মধ্যে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। একটি বনহংসী (হাঁসডাক) দুটি ডিম পেড়েছিল। এই দুটি ডিম থেকে বেরিয়েছিলেন এ'দের আদি পিতা আর আদি মাতা,—পিলচু হাড়াম আর পিলচু বুড়ী। এ'দের থেকে উদ্ভুত হয় প্রথম সাতটি উপ-গোষ্ঠী। এ'দের আদিনিবাস ছিল 'হিহিড়ি' বা 'আহিড়িপিড়ি'তে। জনৈক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, এই নাম এসেছে 'হির' থেকে, আর অন্যরা মনে করেন, হাজারীবাগের 'আহুরি' পরগনাই হচ্ছে 'হিহিড়ি' বা 'আহিরিপিড়ি'। এখানে থেকে এ'রা আরও পশ্চিমে 'খোজ-কামান'-এ চলে আসেন। এই খোজকামানে কোনো এক পাপানুষ্ঠানের ফলে মাত্র একটি দম্পতি ব্যতীত সবাই মারা পড়েন অগ্নিবৃষ্টিতে। উক্ত দম্পতিটি প্রাণ বাঁচান 'হারৎ' পর্বতের চূড়ায় উঠে। 'হারৎ' থেকে তাঁরা আসেন বড়ো এক নদীর তীরে,—সমতলভূমিতে, যার নাম ছিল 'শাশাংবেডা'। এই 'শাশাংবেডা' থেকে তাঁরা চলে যান 'জার্পি'তে। এই 'জার্পি'তে ছিল 'মারাং বুরু' বলে বিরাট এক পর্বত। এই পর্বত থেকে কোনো গিরিপথ খুঁজে না পাওয়ায় তাঁরা পর্বত-দেবতার পূজা করেন। পর্বত-দেবতার কৃপায় অবশেষে একটি গিরিপথ খুঁজে পান তাঁরা। এই পথ বেয়ে তাঁরা আসেন 'আহিরি' দেশে। এ-দেশে বেশ কিছুদিন বসবাস করেন তাঁরা। তারপরে 'কোঁন্ডি' 'ছাই' হয়ে তাঁরা শেষপর্যন্ত আসেন 'চাম্পা'য়। চাম্পায় তাঁরা বাস করেন কয়েক পুরুষ ধরে, এবং এখানেই তাঁদের জাতির মধ্যে একটি সংহতি ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। কিন্তু পরে তাঁরা 'চাম্পা' থেকে বিতাড়িত হয়ে চলে আসেন 'সাওন্ত' দেশে। এই সাওন্ত দেশে তাঁরা বসবাস করেন দু'শ বছর ধরে।

অবশ্য এসবই হচ্ছে পুরোনো কথা। সাঁওতালদের বর্তমানে বেশি দেখা যায় বিহারের দক্ষিণ-পূর্ব জেলাগুলিতে, উত্তরবঙ্গ ও আসামের চা-বাগান-অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে, আর পশ্চিমবঙ্গের কমবেশি সব জেলাতেই। বিভিন্ন অঞ্চল অবস্থানকারী সাঁওতালদের সংহতির মাধ্যম হচ্ছে এ'দের কৃষ্টিগত ঐতিহ্য আর জাতিগত আত্মচেতনা। এ'দের সম্পর্কে আজ বিনা দ্বিধায়

একথা বলা চলে যে, শিক্ষা-বিস্তারের সংগে সংগে এ'দের সমাজ বহুলাংশে বিবর্তিত। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত যাঁরা, তাঁরা বিভিন্ন সরকারী কার্যে ব্যাপৃত, অনেকে উচ্চপদে আসীন, অনেকে বেসরকারী কাজেও বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। এ'দের মনোভংগী স্বাভাবিকভাবেই সংস্কারমুক্ত এবং প্রগতিশীল।

সাধারণভাবে ধরতে গেলে সাঁওতালদের প্রধান দুটো ভাগে ভাগ করা চলে। একদিকে, সাঁওতাল পরগনা এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলসমূহের সাঁওতাল ও দামোদরের উত্তর তীরের সাঁওতাল। অন্যদিকে বিহারের দক্ষিণ সীমান্তবর্তী ও ওড়িষ্যার উত্তর সীমান্তবর্তী সাঁওতাল এবং পশ্চিমবংগের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত দামোদরের দক্ষিণ তীরের সাঁওতাল। উত্তরের সাঁওতালদের দক্ষিণের সাঁওতালরা বলেন, 'দুমকা-হড়'। বিহারের সাঁওতাল পরগনার একটি জনপদের নাম,—'দুমকা'। এই জনপদের নাম থেকেই কথাটা এসেছে ব'লে মনে হয়। যাই হোক, পাল্টা হিসাবে উত্তর সাঁওতালরা দক্ষিণ সাঁওতালদের বলেন, 'বগড়ি-হড়'। এই দক্ষিণী ও উত্তর দেশবাসীদের মাধ্যে সংস্কৃতিগত সামান্য একটু পার্থক্য ছাড়া কথ্যভাষার মধ্যেও একটু তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। যেমন, বীরভূমের সাঁওতালদের মধ্যে বাংলাভাষার প্রভাব বেশি, আর দুমকা-অঞ্চলের সাঁওতালদের মধ্যে হিন্দী ও মৈথিলীর প্রভাব বেশি। কিন্তু এই পার্থক্যটা বড়ো কথা নয়। এ'দের নিজেদের ভাষা এ'দের কাছে অতি প্রিয় এবং সে-ভাষার চর্চা ওঁরা যেখানেই যান না কেন, কখনো ছাড়েন না! তবে, স্থানানুসারে ও'রা দ্বিভাষিক।

পশ্চিমবংগের অধিকাংশ সাঁওতালই তাঁদের মাতৃভাষা 'সাঁওতালী' বলে ঘোষণা করেন। এই ভাষা অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মুণ্ডাশ্রেণীর ভাষাবলীর অন্তর্গত ব'লে ভাষাতাত্ত্বিকরা মনে করেন। পশ্চিমবংগের প্রাপ্তবয়স্ক সাঁওতালী পুরুষমাত্রেই নিজেদের ভাষা ছাড়া বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারেন। এই সাধারণ সাঁওতাল যেভাবে বাংলা বলেন, তাতে একটা বিশিষ্ট কথভংগী প্রকাশ পায়।

সাঁওতালরা জীবিকা হিসাবে বনজাত দ্রব্যাদি আহরণ করতেন, শিকার করতেন, এবং চাষও করতেন। সাধারণ সাঁওতালরা বহুলাংশেই কৃষিজীবী। কেউ কেউ দিনমজুর হিসাবেও কাজ ক'রে থাকেন। তবে, পশ্চিমবংগের সাধারণ সাঁওতালদের উপজীবিকার কথা বলতে হ'লে চাষবাসের বিষয়টাকে প্রথমে ধ'রে তারপরেই উল্লেখ করতে হয় চা-বাগিচার প্রসংগ। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার চা-বাগানে বহু সাঁওতালই শ্রমিক হিসাবে কাজ ক'রে থাকেন। কয়লাখনির শ্রমিক হিসাবেও বহু সাঁওতাল কাজ করেন। দুর্গাপুর-চিত্তরঞ্জন ও সন্নিহিত শিল্পাঞ্চলগুলিও সাঁওতাল-শ্রমজীবিদের কর্মসংস্থানের আরও পথ খুলে দিয়েছে। এ গেল সাধারণ সাঁওতালদের কথা। শিক্ষিত যাঁরা, তাঁরা কলকাতা ও বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন চাকরিবাকরিতে নিযুক্ত রয়েছেন।

'ঠাকুর' হচ্ছেন সাঁওতালদের সর্বোচ্চ দেবতা। তিনি কারো অমংগল করেন না কখনো, কিন্তু ছোট দেবতা যাঁরা আছেন, তাঁরা রুষ্ট হ'লে যে-কোনো ক্ষতি ক'রে বসতে পারেন। এ'দের বলা হয় 'বোংগা'।

এ'দের আরাধ্য আরও দেবতা আছেন। তাঁদের একজন হচ্ছেন 'ম'ড়েকো'। এই দেবতাকে পুজো করলে আধি-ব্যাধি থাকে না, ভালো হয় শস্য, পূর্ণ হয় মনোবাসনা। তিনজন বড়ো দেবতার মধ্যে অন্যতম দেবতা হচ্ছেন এই 'ম'ড়েকো', অন্য দুজনের মধ্যে একজন হচ্ছেন তাঁর ভাই 'মারাংবুরু' (বড়ো পাহাড়), আর অন্‌জন হচ্ছেন তাঁন বোন 'জাহের এরা' (জাহের বুড়ী)। ম'ড়েকো আর জহের এরা-কে খুবই নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সংগে পুজো করতে হয়, মারাং বুরু অবশ্য অল্পে খুশি, তাঁর মন সাদা ব'লে তাঁর উদ্দেশে নিবেদিত মোরগ বা পাঁঠার রঙও সাদা হওয়া দরকার। ম'ড়েকোর কাছে বলি দিতে হয় লাল মোরগ কিম্বা লাল পাঁঠা, আর জাহের এরা-কে দিতে হয় লাল মুরগি বা লাল ছাগী।

সাঁওতালদের সামাজিক সংগঠন এ'দের জনজীবনে বিশেষ

ভূমিকা গ্রহণ ক'রে থাকে। বিহারের সাঁওতাল পরগনায় যে সংগঠন গ'ড়ে উঠেছে, সেটাকেই বৃহত্তম বলা যায়। একে বলা হয় 'পরগনা'। পঞ্চাশ থেকে একশটি গ্রাম এই পরগনার অন্তর্গত। পরগনার যিনি প্রধান ব্যক্তি, তিনি হচ্ছেন 'পরগনায়েত্'। পরগনায়েত্ আইনের স্রষ্টা নন, আইনের ব্যাখ্যাকার ও আইনকে কার্যকর করার প্রধানতম ব্যক্তি। গ্রামে প্রধানদের বলা হয় 'মাঝি'। সাঁওতালদের সামাজিক সম্মেলনের সব থেকে বড়ো ব্যাপার হচ্ছে শিকার-যাত্রার সময়টা। পাঁচ থেকে পনেরোটি গ্রামের অধিবাসীরা একত্র হয়ে শিকারে যাত্রা করেন। এই ব্যবস্থাটা অবশ্য একেবারেই কমে আসছে।

আমোদপ্রমোদ সাঁওতাল সমাজের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। নৃত্যগীত তাঁদের সব অনুষ্ঠানের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। মাদল আর বাঁশী সাঁওতাল নৃত্যগীতে ব্যবহৃত হয় সব সময়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'শিঙা'ও ব্যবহৃত হয়। মেয়েরা কালো কেশে রাঙা কুসুম গ'ুজে পরস্পরের কোমর জড়িয়ে সারিবদ্ধ হয়ে নৃত্য করছে, আর তার সঙ্গে মাদল আর বাঁশী বাজাচ্ছে পুরুষেরা,—এ চিত্র প্রায় সবার কাছেই পরিচিত। সাধারণ সাঁওতালরা বহুলাংশে কৃষিজীবী, সেই জন্য কৃষির সঙ্গেও এদের বহু 'পরব' বিজড়িত। আখন পরব, মাঘ-সীম, বাহা-বোঙ্গা, জুগনি-বিদায়, করম পরব, ই'ধ পরব—, প্রভৃতি অজস্র 'পরব' এদের কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতরূপে জড়িয়ে আছে, বিশেষ ক'রে পশ্চিমবঙ্গে। প্রকৃতির দুলাল প্রকৃতি-প্রেমিক এই সাঁওতালরা জীবনরসে ভরপুর, প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল। এ'দের একটি গানে আছেঃ আমরা খাবো-দাবো আর নিজেদের সব সময় রাখবো আনন্দে ভরপুর। এই যে দেহ, এ মাটির ঢেলা, এ থাকবে না। গাছের পাতার ওপরে যেমন জলের ফোঁটা স্থির থাকেন না ছিটকে গড়িয়ে যায়, তেমনি ক'রে জীবনও ছল্কে চলে যাবে। সম্প্রতি এ'দের নিজস্ব ভাষার গান এ'দেরই শিল্পীর গলায় রেকর্ড করানো হয়েছে অন্যতম খ্যাতিমান সঙ্গীতশিল্পী অংশুমান রায়ের পরিচালনায়।

মুণ্ডা

ঈশ্বর বললেন, আমি এক, কিন্তু 'বহু' হবো। তাঁর এই অভিলাষ থেকেই সৃষ্ট হলো মানুষ, সৃষ্ট হলো আর সব প্রাণী। এই ধরনের চিন্তার প্রকাশ দেখা যায় উপনিষদে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম আদিবাসী 'মুণ্ডা'দের মধ্যেও আংশিকভাবে এই চিন্তার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায় তাদের কিম্বদন্তীর মধ্যে। ধরাধামে মনুষ্যজাতির উদ্ভব সম্বন্ধে তাদের মধ্যে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত তা হচ্ছে,—তাদের আদি দেবতা 'সিংবোঙ্গা' ও 'ওতে-বোরাম' একটি তরুণ এবং একটি তরুণীকে সৃষ্টি করে প্রজাবৃদ্ধির জন্য তাদের একটি গুহার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেন। কিন্তু প্রাথমিক গুহা-জীবনে তাদের সে-জ্ঞান লব্ধ হয় নি, যাতে করে তারা বুঝতে পারে, তাদের দুজনকে দিয়ে দেবতারা তাঁদের কী উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চান। দেবতারা তখন তাদের শেখালেন কী করে চাল থেকে 'পচাই' তৈরি করতে হয়। এই 'পচাই' পান করে তাদের মধ্যে জেগে উঠলো দেহবোধ। এবং এরই ফলশ্রুতিস্বরূপ দেখা গেল কিছুকালের ভিতরেই ঐ গুহা তাদের সন্তান-সন্ততিতে পূর্ণ হয়ে গেছে। বারোটি ছেলে আর বারোটি মেয়ে হয়েছে তাদের।

এরপরে, কিম্বদন্তীগুলি যেরকম হয়,—দেবতারা একটি ছেলের সঙ্গে একটি মেয়েকে মিলিয়ে দিয়ে বারোটি দম্পতির সৃষ্টি করলেন এবং আদেশ করলেন, "তোমরা বাহির বিশ্বে নানান জায়গায় ছড়িয়ে পড়ো। তোমাদের সামনে রাখা হল বিবিধ খাদ্যসামগ্রী, যার যা খুশি বেছে নাও। তোমার এই পছন্দের ওপর নির্ভর করছে তোমাদের ভবিষ্যৎ।"

এ-কথা শুনে প্রথম দম্পতি এগিয়ে এসে বেছে নিলো মাংস। এবং এদের থেকে উৎপন্ন হল,—কোল (হো), আর দ্বিতীয় দম্পতিও বেছে নিলো মাংস,—এদের থেকে উৎপন্ন হল—ভূমিজ (মাত্কুম)। তৃতীয় দম্পতিটি বেছে নিয়েছিল শুধু শাক-সব্জি,—তাদের থেকে উৎপন্ন হল ব্রাহ্মণ আর ছত্রী, এবং অন্য যারা বেছে নিয়েছিল ছাগল আর মাছ, তাদের থেকে উৎপন্ন হল—শুদ্র। একটি দম্পত্তি বেছে নিয়েছিল চিংড়ি আর কাঁকড়া,—তাদের থেকে এলো,—ভুঁইয়া, আর অন্ দুই দম্পতি হল,—সাঁওতাল। অন্য এক দম্পতি কিছুই পায় নি, প্রথম দম্পতিরা তাদের

থেকে বাড়তি কিছু দিয়েছিল মাত্র,—আর এদের থেকে যাদের উৎপত্তি হয়েছিল তাদের বলে 'ঘাসী'।

'মুণ্ডা' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত থেকে। সম্ভবত 'মুণ্ড'ই এর মূল শব্দ। ব্যবহারিক দিক থেকে এর অর্থ বোঝাতো,—কোনো গাঁয়ের 'মুণ্ড' বা 'মাথা'। চলতি বাংলায় এখনো 'গাঁয়ের মাথা' বলতে গাঁয়ের প্রধান ব্যক্তিকে বোঝায়। মুণ্ডাদের উৎস সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বলেন, এরা এসেছে ছোটনাগপুর অঞ্চলের বৃহৎ এক প্রাচীন দ্রাবিড় গোষ্ঠী থেকে, যাদের বলা হত,—'মুরা' বা 'হোরোহন্।'

১৯৬১ সালের আদমসুমারি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে এদের জনসংখ্যা ছিল—১,৬০,২৪৫। রাজ্যের মোট আদি-বাসী জনসংখ্যার ৭·৮০ শতাংশ। এরা জড়ো হয়েছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্ধমান জেলায়, ২৪-পরগনায়, পশ্চিম দিনাজপুরে, দার্জিলিং-এ, জলপাইগুড়িতে, মেদিনীপুর এবং পুরুলিয়ায়।

মুণ্ডাদের চিরাচরিত জীবিকা হচ্ছে চাষবাস এবং শিকার। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুণ্ডারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষি-জীবী, তবে এদের বড়ো একটি অংশ চা-বাগিচাগুলিতে শ্রমিক হিসাবে যুক্ত।

মুণ্ডাদের ধর্ম সাধারণভাবে জড়োপাসনা। কিন্তু রায়বাহাদুর এস-সি-রায় এদের একেশ্বরবাদী বলি চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। মুণ্ডাদের সর্বোচ্চ দেবতা হচ্ছেন—সিংবোঙ্গা (সূর্য); তারপরে আসেন বুরু বোঙ্গা অথবা মারাং বুরু, কোথাও কোথাও 'পাত্‌সারনা'ও বলা হয়। বহু পরব আছে এদের। যেমন, মাঘে পরব, ফাগুয়া, বাহ্-পরব, সারহুল পরব ইত্যাদি।

এদের আদি ভাষা হচ্ছে,—মুণ্ডারি। চব্বিশ-পরগনা এবং চা-বাগিচাগুলির মুণ্ডারা তাদের নিজেদের ঘরে 'সাদ্‌রি' ভাষা ব্যবহার করে থাকে, তবে, এ-রাজ্যে আরও নতুন যারা এসেছে, তাদের মধ্যে 'মুণ্ডারি'ই বেশি প্রচলিত। মুণ্ডাদের অনেকে বাংলাতেও কথাবার্তা বলতে পারে।

এদের গ্রাম এবং ঘরগুলির একটা বৈশিষ্ট্য আছে। পথের ধারে সারি সারি এদের ঘর বেশ হিসেব করেই তৈরি। চৌকো চৌকো ঘরগুলির দেওয়াল সাধারণত মাটির, চাল খড় দিয়ে ছাওয়া। অধিকাংশ বাড়িতেই ২। ৩ খানা ঘর থাকে। একটি ঘর বসবাস করবার জন্য, তাকে বলে, 'গিতি-ওরা'। অন্য একটি ঘর, গরু, ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদের রাখবার জন্য, তাকে বলে, 'উরি-ওরা'। এ-ছাড়া রান্নারও একটা জায়গা থাকে, তার নাম,—'মান্ডি-ওরা'। ঘরের সঙ্গে ঢাকা বারান্দাও অনেক জায়গায় থাকে, সেখানে ঢেঁকি পাতা হয়। কোনো কোনো গ্রামের কোনো কোনো বাড়িতে বৈঠকখানাও দেখা গেছে। বর্তমানে কোনো কোনো মুণ্ডার বাড়ির ঝক্‌ঝকে উঠোনের একপাশে তুলসী-মঞ্চও শোভা পাচ্ছে। অন্যান্য আদিবাসীদের মতো এঁদেরও 'নিষিদ্ধ পশু বা বৃক্ষ' (টোটেম) আছে, এবং তাদের এরা ক্ষতি করে না, মারে না বা ছেদন করে না, খায় না।

মুণ্ডাদের মধ্যে এক-বিবাহই সাধারণ নিয়ম। যখন কোনো অবিবাহিত ছেলে অবিবাহিতা মেয়েকে বিয়ে করে, সেই বিয়ের নাম,—আর্ণ্‌দি। প্রথম বউ নিঃসন্তান হলে পুরুষমানুষ দ্বিতীয়-বার বিয়ে করতে পারে। বিবাহ-বিচ্ছেদও এদের মধ্যে প্রচলিত। বিধবা ও বিচ্ছেদপ্রাপ্তা মেয়েরাও বিয়ে করতে পারে। বিধবার বিবাহের নাম,—'দাউজবর আর্ণ্‌দি'।

প্রসঙ্গত এদের সমাজ-জীবনের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বন্ধুত্ব' বা 'সই' পাতানোর নিয়ম আছে। ছেলেতে-ছেলেতে এ বন্ধুত্ব পাতানো হয়, মেয়েতে-মেয়েতে এ 'বন্ধুত্ব' বা 'সই' পাতানো হয়। এমনকি নিজেদের গোষ্ঠীর বাইরেও এরা বন্ধুত্ব পাতিয়ে থাকে। বড়োদের সামনে তিনবার মালা বদল করে এরা পরস্পরকে অভি-বাদন জানায়, তারপরে উৎসবের অঙ্গ হিসাবে অভ্যাগতদের সামর্থ্যানুযায়ী কিছু মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

যাই হোক এদের বিয়ের ব্যাপারটা সাধারণত নিষ্পন্ন হয় সম্বন্ধ করে। বাপই উদ্যোগী হয় এ-ব্যাপারে, অথবা তাঁর স্থলাভিষিক্ত কিম্বা অনুরূপ অন্য কোনো বয়স্ক ব্যক্তি। ঘটকের কাজ যে করে, তাকে ওরা বলে, 'দূতামদার'। বিয়ের দুদিন আগে বর এবং কনে উভয়ের বাড়িতেই 'ডাণ্ডুয়া বিরুয়ার' বলে একটি অনুষ্ঠান হয়, উদ্দেশ্য, সব রকম কু-দৃষ্টি অথবা কু-প্রভাব থেকে বাড়িটাকে মুক্ত রাখা। ঐ সন্ধ্যাতেই 'সোসাঙ সুনুম' করা হয়, অর্থাৎ কনেকে হলুদ মাখানো হয়। বিয়ের দিন ওদের 'ব্রাহ্মণ' একটি যজ্ঞ করেন, তারপরে বরের হাতে পরিয়ে দেন একটি লোহার বালা। এটা হয়ে যাবার পর বর খাওয়া দাওয়া করতে পারে। বরের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে 'জাম্মারি' বলে তিনজন লোককে কনের বাড়িতে পাঠানো হয়। তারপরে রওনা হয় বরকে সঙ্গে করে বরযাত্রীর দল। কনের বাড়িতে তাদের আদর-আপ্যায়ন করে 'ঝালোম' বলে একটি অস্থায়ী আশ্রয়ে রাখা হয়। বিয়ের সময় বর বসে পূব দিকে মুখ করে, আর কনেকে সেখানে নিয়ে আসে আত্মীয়স্বজনরা। 'ব্রাহ্মণ' আবার যজ্ঞ করেন। বর বাঁ-হাতে করে সিঁদুর নিয়ে কনের কপালে পরিয়ে দেয়, একে বলে, 'সিন্দুয়া রকব'। তারপরে 'ব্রাহ্মণ' কনের শাড়ীর আঁচলের সঙ্গে বরের চাদরের প্রান্ত গিঁট দিয়ে বেঁধে দেন। তারপরে হয় খাওয়া-দাওয়া আর নাচগান। এদের বিয়ে-টিয়ের ব্যাপারে ব্রাহ্মণের নিয়োগ দেখেই বোঝা যায় এদের মধ্যে হিন্দু-প্রভাব কাজ করছে কত বেশি। মানুষ মরলে এরা হিন্দুদের মতেই 'শব-দাহ'-এর আয়োজন করে। এদের মধ্যে হাতুড়ে বৈদ্যও আছে, তাদের বলে, 'দেওনা'। এই দেওনারা সাধারণ রোগ-টোগ সারায় আর অপ-দেবতার উপদ্রব থেকে এদের রক্ষা করে। তবে, বর্তমানে এদের মধ্যেও পরিবর্তন হচ্ছে। লোকে রোগ হলে ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে যেতে আরম্ভ করেছে।

এদের পরবগুলির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আরও কিছু অনুষ্ঠান এদের আছে, সেগুলি প্রধানত কৃষি-কেন্দ্রিক। বৈশাখ মাসে মাঠে প্রথম লাঙল পড়ার আগে এরা করে 'ধুরিয়া পূজা'। জ্যৈষ্ঠে বীজ ছাড়বার আগে করে 'কশনা' পূজা। আষাঢ়ে ধান রুইবার আগে করে 'আষাঢ়ী পূজা' আর ফসল-কাটবার আগে কার্তিক মাসে করে 'কিদুয়া-বুড়ী' বা 'জান্তল পূজা'। এছাড়া, গো-পরব 'বান্দনা' এবং পৌষ মাসে মেয়েদের 'টুসু-পরব' প্রভৃতিও এদের মধ্যে বিদ্যমান।

বীরহোড়

বীরহোড় পশ্চিমবঙ্গের একটি ছোট তফসিলভুক্ত আদিবাসী সম্প্রদায়। প্রধানত পুরুলিয়া জেলায় এঁদের বাস। কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাস যাঁরা করছেন তাঁরা এই সম্প্রদায়ের একটি অংশ মাত্র। এঁদের বলা হয় 'জাঘি বীরহোড়'। কিন্তু কয়েক দশক আগেও বীরহোড়রা ছিলেন যাযাবর জাতি। খাদ্যের অন্বেষণে পুরুষরা শিকারী, নারীরা ফলমূল সংগ্রাহিকা। ত্রিকোণ পাতার তৈরি ছোট্ট কুঁড়ে এঁদের প্রচলিত আস্তানা। এঁদেরই একটা অংশ আজ 'জাঘি'। আর যাঁরা 'জাঘি' নন, তাঁরা 'উথলু'। আচার-আচরণ, জীবনযাত্রার দিক দিয়ে এই দুই অংশের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলে উথলুরা জাঘিতে পরিণত হন সন্দেহ নেই এবং তখন তাঁদের জীবনযাত্রা কিছুটা স্থায়ীবাসজনিত পরিবেশ এবং কিছুটা স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনধারার প্রভাবে একটা নতুন সংস্কারে উত্তীর্ণ হয়।

বীরহোড়রা বিশ্বাস করেন যে, তাঁরা সূর্যের সন্তান। বীর-হোড় নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিংবদন্তীতে রয়েছেঃ সাত ভাই খয়রাগড় (কইমুর পাহাড়) থেকে এদেশে এসেছেন। তার মধ্যে চার ভাই যান পূর্বদিকে, আর তিন ভাই রয়ে যান রামগড় জেলায়। এই তিন ভাই যখন স্থানীয় রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছিলেন তখন এক ভাইয়ের শিরস্ত্রাণ একটি গাছে আটকে যায়। তিনি একে অমঙ্গলসূচক মনে করে জঙ্গলেই রয়ে যান। দুই ভাই তাঁকে বাদ দিয়েই যুদ্ধে যান এবং জয়লাভ করে জঙ্গলে ফিরে দেখেন তাঁদের ভাই জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করছেন। তাই দেখে তাঁরা ভাইকে পরিহাস করে বীরহোড় বলে ডাকেন। উত্তরে তিনি বলেন যে, উগ্র-মেজাজী ভাইদের সঙ্গে থাকার চেয়ে

তিনি বীরহোড় হয়ে জঙ্গলের অধিপতি হয়ে থাকতেই বেশী পছন্দ করেন। এইভাবে বীরহোড় (জঙ্গলের অধিপতি) নামের উৎপত্তি। আর দুই ভাই হলেন রামগড়ের রাজা।

কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বীরহোড়দের সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত দিয়েছেন। কেউ বলেছেন মুণ্ডারাই নিঃসন্দেহে বীরহোড় নামে অভিহিত। তাঁরাই সম্ভবত ছোটনাগপুরের পাহাড় অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। কেউ বলেছেন, তাঁরা নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেন এবং একরকম গাছের ছাল বিক্রী করেন যা থেকে বিভিন্ন রকমের শক্ত দড়ি তৈরি হয়। কেউ বলেছেন, তাঁরা ছোট্ট-নাগপুরের পাহাড় ও জঙ্গলের ছোট এক যাযাবর আদিবাসী। কোলারীয় ভাষায় এঁরা কথা বলেন।

পশ্চিমবঙ্গে বীরহোড়রা প্রধানত বসবাস করেন পুরুলিয়া জেলায় এবং তাঁদের অধিকাংশ (২৯টি পরিবার) বাস করেন সরকার প্রবর্তিত 'ভূপতিপল্লী'তে। ১৯৬৩ সালে এই ২৯টি পরিবারের লোকসংখ্যা ছিল ১০৬। তার মধ্যে ৫৪ জন পুরুষ এবং ৫২ জন নারী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ ১৯৫৮ সালে বীরহোড়দের মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসের মনোভাব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পুরুলিয়ার বাগমুণ্ডি থানায় একটি পল্লীর পত্তন করেন। তদানীন্তন আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী ভূপতি মজুমদারের নামানুসারে এই পল্লীর নাম দেওয়া হয় ভূপতি-পল্লী। এই পল্লীর পূর্বদিকে অযোধ্যা পাহাড় এবং পশ্চিমে তোয়াং নদী। মাদলা, গোবিন্দপুর, একরা, টোঁটো লাগমুণ্ডি প্রভৃতি গ্রাম এই পল্লীকে ঘিরে রেখেছে। এই পল্লীর মধ্যে দিয়ে একটি কাঁচা রাস্তা গিয়ে মিশেছে অযোধ্যা রোডে।

এই ২৯টি পরিবারকে মাটির বাড়ি, চাষের জমি, গৃহ-পালিত পশু প্রভৃতি দেওয়া হয়।

ভূপতিপল্লীতে আসার আগে বয়স্ক পুরুষ বীরহোড়দের পেশা ছিল শিকার, জঙ্গলের উপজাতদ্রব্য সংগ্রহ এবং দড়ি তৈরি করা, আর বয়স্কা নারীদের কাজ ছিল গার্হস্থ্য কাজ করা, ফল-মূল সংগ্রহ করা এবং দড়ি তৈরি করা। নতুন বাসস্থানে এসেও অনেকে আগের পেশাতেই নিযুক্ত রয়েছেনে। তাছাড়া কিছু লোক সরকারের দেওয়া জমি চাষ করেন বা অন্যের জমিতে ক্ষেত-মজুরের কাজ করেন। জীবনযাত্রার গৌণ পেশা হিসাবে তাঁরা শূকর, ছাগল, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি গৃহপালিত প্রাণী পালন করেন।

সরকার তাঁদের জমি দিয়েছেন, হাল-বলদও দিয়েছেন, তবু তাঁদের মধ্যে কৃষিকাজের তেমন আগ্রহ দেখা যেত না। কারণ সম্ভবত কৃষি সম্পর্কে ছিল তাঁদের সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা। অথচ 'চেহোর' নামে এক লতার ছাল থেকে দড়ি তৈরির কাজ তাঁদের এক বিশেষ জনপ্রিয় পেশা। এই চেহোর লতা তাঁদের পল্লীর আশপাশে কোথাও পাওয়া যায় না -এ লতা সংগ্রহ করতে যেতে হয় তাঁদের দশ-বারো মাইল দূরের জঙ্গলে। ফলে এই যাতায়াতের জন্যে তাঁদের দুদিনের কাজ নষ্ট হয়ে যায় এবং তাতে তাঁরা পল্লীতে বসবাস করার চেয়ে যেখানে সেই লতা পাওয়া যায় তার কাছাকাছি বসবাসের পক্ষপাতী।

বীরহোড়রা নিজেদের মধ্যে নিজস্ব বীরহোড় ভাষায় কথা বলেন। এই ভাষা অস্ট্রীয়-এশীয় ভাষাগোষ্ঠীর অস্ট্রিক শাখার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু প্রতিবেশী জাতি ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার ফলে তাঁরা আজকাল বাংলাতেও কথা বলতে পারেন।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, বীরহোড়রা দুই শাখায় বিভক্ত: (১) জাঘি এবং (২) উথলু। এই দুই শাখার মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ নয়, যদিও আদিবাসীরা সাধারণত নিজের শাখার বাইরে বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপনের বিরোধী। বীরহোড়দের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় জাঘি বীরহোড় উথলু মেয়েকে বিয়ের পর উথলু শাখার অন্তর্গত হয়ে পড়েন এবং শ্বশুর পরিবারের সঙ্গে যাযা-বর জীবনে ফিরে যান।

বীরহোড় আদিবাসী সমাজ কতকগুলি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। তাঁদের ভাষায় এই গোষ্ঠীকে বলা হয় গোত্র। কোনো গাছ বা প্রাণীর নামে এইসব গোত্রের নাম এবং সেই গাছ বা প্রাণীকে তাঁরা হত্যা করেন না বা তাদের কোনো ক্ষতিসাধন করেন না। বর্তমানে কাজকর্মের উপযোগিতার দিক থেকে এইসব গোত্রের কোনো মর্যাদা স্বীকৃত হয় না। কেবল বিবাহের সময় গোত্রের প্রয়োজন হয়।

বীরহোড়রা তাঁদের প্রধান দেবতাকে বলেন সিংবোঙ্গা। সিংবোঙ্গা সকলের মঙ্গলকারক।

বীরহোড়দের সম্পর্কে এক কথায় বলা যায় যে, এদের জীবনযাত্রা পরিবর্তিত হওয়ায় তাঁদের চিরাচরিত যাযাবর জীবন নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে এবং ফলে তাঁদের প্রাচীন শিকার ও খাদ্য-সংগ্রহ বৃত্তি ক্রমশ লোপ পাচ্ছে।

লোধা

বিগত ১৯৫২ সাল পর্যন্তও লোধাদের অপরাধপ্রবণ জাতি হিসাবে চিহ্নিত করা হত। তারপরে আইন করে তাদের ওপর থেকে এই চিহ্নের কলঙ্ক মোচন করা হয়েছে এবং তাদের তফসিলী আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্তরূপে গণ্য করা হয়ে থাকে। এরা বহুলাংশেই জমায়েত হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের অরণ্য অঞ্চলে, ওড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলায় ও বিহারের সিংভূমে।

এদের আদিনিবাস সম্পর্কে ১৯০১ সালে আদমসুমারি রিপোর্টে বলা হয়েছে, "এরা মূলত এসেছিল মধ্যপ্রদেশ থেকে। মধ্যপ্রদেশে এক কৃষিজীবী আদিবাসীর দেখা পাওয়া যায় যাদের বলা হয় 'লোধ' বা 'নোধ' বা 'লুধি'। জেলা-শাসক আন্দাজ করেছিলেন, রিসলে সাহেব তাঁর গ্রন্থে যাদের 'শবর' বলে আখ্যাত করেছেন, এরা তাদেরই স্বজাতি। কিন্তু ময়ূরভঞ্জে শবরদের লোধাদের থেকে 'উ'চুজাত' বলে ধরা হয়। মেদিনীপুর শহরের 'চিরমা', যারা পাখী-ধরার কাজ করে থাকে, তাদের এই আদিবাসীদের একটি শাখা বলে বরং গণ্য করা যেতে পারে।" লোধাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে জনৈক লেখক মন্তব্য করেছেন, "লোধারা কিন্তু নিজেদের 'শবর' বলে ঘোষণা করতে গর্ব বোধ করে।...'লুব্ধক' শব্দের অপভ্রংশ হচ্ছে 'লোধা'। 'লুব্ধক' বলা হতো তাদের, যারা পাখী-টাখি ধরার জন্য ফাঁদ পাততো। লোধারা 'শবর' বা 'লোধা-শবর' বলে নিজেদের পরিচয় দেয়।"

গত ১৯৬১ সালের আদমসুমারি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে লোধাদের সংখ্যা ১০,০০০এ এসে দাঁড়িয়েছে বলে অনুমান করা হয়েছে। খেড়িয়া বা খড়িয়া বলে আরেক সম্প্রদায়কে এদের সঙ্গে ধরে ১৯৬১-র আদমসুমারিতে মোট জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে ৪০,৮৯৪। খড়িয়ারা মূলতঃ ওড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলায় বাস করলেও, এদের কিছু কিছু অংশ এসে বসবাস করছে পশ্চিম-বঙ্গের মেদিনীপুর, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলাগুলিতে। এদের লোধা-খেড়িয়াও বলা হয়ে থাকে।

লোধাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার থেকে প্রথমে চারটি পুনর্বাসন-পরিকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। এগুলি দিয়ে মেদিনী-পুর জেলার 'ঢোলকুট', 'দহরপুর', 'কুকাই' আর 'ধানশোলা'তে। ঢোলকুটে যে পরিকল্পটি চালু, সেটি 'ভারত সেবাশ্রম সংঘ'-এর মাধ্যমে পরিচালিত। এদের মধ্যে নীতি ও শিক্ষার প্রসার, এদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন-প্রয়াস, এগুলিই হচ্ছে পরিকল্পটির কার্যসূচির মূল বিষয়। বর্তমানে এই পরিকল্পের সম্প্রসারণ হয়েছে। মেদিনীপুরের লোধাশুলির 'বিদিশা' এদিক থেকে আর একটি উল্লেখযোগ্য উপনিবেশ।

প্রথম প্রথম লোধাদের মধ্যে কৃষিকাজের অভ্যাস ছিল না। এরা প্রধানত নির্ভর করতো বনজাত সামগ্রীর ওপর। কিন্তু 'বন-সংরক্ষণ-আইন' চালু হবার পর এরা পড়ল বিপদে। পেটের ক্ষুধাই এদের আস্তে আস্তে টেনে আনতে লাগলো চুরিচামারি

প্রভৃতি অপরাধ-অনুষ্ঠানের দিকে। ১৯০৫ সালে যখন সারা বাংলাদেশ বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ ও মুখরিত, তখন এদের অপরাধপ্রবণ জাতি হিসাবে ঘোষণা করা হল এবং এর ফলে এদের দুর্গতির আর সীমা-পরিসীমা রইল না। কাছে-পিঠে কোথাও কোনো চুরিচামারি বা ডাকাতি বা খুনখারাপি হলে এদের হয়রানি করা হত, এদের ওপর অত্যাচার করা হত, কখনো কখনো এদের ঘরদোর পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিয়ে এদের বনেজঙ্গলে তাড়িয়ে দেওয়া হত। এরা বাধ্য হয়ে ব্যাঙ, ইঁদুর, শামুক আর ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করত। কেউ কেউ বন থেকে বুনো ফলমূল আর অবৈধভাবে বনজাত সামগ্রী নিয়ে ঝাড়গ্রামে মহাজনদের কাছে বিক্রী করত। 'অপরাধপ্রবণ জাতি' বলে আখ্যাত হওয়ায় লোধাদের গৃহস্থরা কোনো কাজকর্ম দিতে চাইত না। এর ফলে পেটের জ্বালায় এরা ছাগল, মুরগি, বাসন-কোশন,—এ-সব সুযোগ পেলেই চুরি করে নিয়ে যেত। তাছাড়া, আরও একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার কোনো কোনো ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে। কিছু কিছু অবস্থাপন্ন ধূর্ত লোক এদের চুরি করতে উস্কানি দিতো বলে শোনা যায়। তারা ওদের কাছ থেকে চুরি-করা জিনিসগুলো সস্তায় কিনে নিতো। লোকের চোখে তাঁরা থাকতেন 'সৎ', আর যতো কলঙ্কের বোঝা চাপতো এই লোধাদের ওপর। ১৯৫২ সাল থেকে আইন করে এদের এই কলঙ্ক মোচন করা হয় এবং সেই সময় থেকেই এদের উন্নয়নের কাজ শুরু হয়।

সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াও সরকারের আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ থেকে দারুশিল্পের শিক্ষণ-ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ-কাজে লোধাদের পারদর্শিতা লক্ষ্য করা গেছে।

লোধারা হিন্দু বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। এদের নিজে-দের পুরোহিত আছে, তারাও লোধা, তারা ওদের মধ্যে 'কোটাল' বলে পরিচিত। ওদের উপাস্য দেবদেবীর মধ্যে ভগবান ছাড়া বসুমাতা, শীতলা, চণ্ডী, ভৈরব, বরুণ প্রভৃতি রয়েছেন। এদের ভাষা হচ্ছে এক ধরনের কথ্য বাংলা, তার ওপর ওড়িয়া ভাষার প্রভাবও কিছুটা লক্ষ্য করা যায়।

লোধারা মেদিনীপুর অঞ্চলের অন্য সবার মতো 'হা-ডু-ডু' খেলে থাকে। 'মা-মনসা' আর 'কুকাই' গ্রামের লোধা ছেলেরা ফুটবলও খেলে থাকে। এ-ছাড়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে কিছু কিছু খেলার প্রচলন আছে, তার মধ্যে একটির নাম 'তাল-কাটি।'

গানবাজনাতেও লোধাদের যথেষ্ট ঝোঁক। এদের নাচগানে কিন্তু মেয়েরা অংশ গ্রহণ করে না। ওদের নিজেদের একরকম বাজনার যন্ত্র আছে, তার নাম,—বাইকুণ্ডলী। প্রতি পরিবারে একটি করে 'বাইকুণ্ডলী' থাকবেই। পাল-পার্বণ আর উৎসবের আগে ওরা যন্ত্রটার চামড়া খড়ের আগুনে একটু সেঁকে সুর-বেঁধে নেয়। এ-ছাড়া 'মাদল'ও ওরা ব্যবহার করে থাকে। 'বান্দনা' উৎসবে অথবা ঝুমুর গানের আসরে এইসব যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। আর নাচ হয় সাধারণত 'বরম' বা 'শীতলা' পুজার সময়। নাচের আগে সোজা লাইন করে দাঁড়ায় নাচিয়ে পুরুষরা, তার পরে নাচের তালে তালে লাইন বেঁধে একটা বৃত্তের আকার নেয়। এরা নাচের তালে তালে ঘোরে ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে। নাচতে নাচতে কারুর ওপর আবার 'দেবতা' বা উপদেবতার 'ভর' হয়, তখন তার বা তাদের মুখ থেকে 'ভবিষ্যৎ-বাণী' নির্গত হতে থাকে। এদের মধ্যে 'বারমাসী' গানও প্রচলিত।

'বান্দনা' বা 'গো-বন্দনা' মাহাতো আর ঝাড়গ্রামের 'কোরা'-দের মধ্যে সমধিক প্রচলিত। কিন্তু লোধাদের মধ্যেও এটি ক্রমে ক্রমে প্রচলিত হয়ে গেছে। বান্দনার সব গানই গো-কেন্দ্রিক। কোথাও গো-দেবতার প্রশংসা, কোথাও বা পারিবারিক নানা ঘটনার ইঙ্গিত রয়েছে। 'টুসু' গানেও এরা অংশ গ্রহণ করে থাকে।

লোধাদের মধ্যে যে-সব উপকথা বুড়োদের মুখ থেকে শোনা যায়, তার মধ্যে দু-একটি নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক। একটি কাহিনী হচ্ছেঃ সূর্য আর চন্দ্র দুই বোন, পাশাপাশিই বাস করত। ওদের দুজনেরই ছিল অনেক ছেলে মেয়ে। এই

ছেলেমেয়েদের দেখা যায়—রাত্রে, আকাশের বুকে তারা হয়ে ওরা ছড়িয়ে আছে। এখন হয়েছে কী, চাঁদ হচ্ছে সুয্যির ছোট। বেচারার আরও ছেলেমেয়ের সখ। কিন্তু আকাশে যে রাখবে, জায়গা কোথায়? সেজন্য সে মনে মনে ভাবলো, দিদি যাতে বুঝতে না পারে এইভাবে দিদির কিছু ছেলেমেয়ে মেরে ফেলা যাক। এই কথা ভেবে সে দিদির কাছে গিয়ে বললে,—দিদি, আমাদের ছেলেমেয়ের সংখ্যা এত বেশি যে সবার ওপর নজর রাখতে গিয়ে হিমসিম খেতে হচ্ছে। আয়, কিছু কিছু ছেলেমেয়ে আমরা নিজেরাই খেয়ে ফেলি।

বলে সে তার ছেলেমেয়েদের লুকিয়ে ফেলে 'সুয্যিকে গিয়ে পরদিন বললে,—দিদি, আমার সবকটাকে খেয়ে ফেলেছি। 'সূর্য' সে-কথা বিশ্বাস করে নিজের ছেলেমেয়েদের এক এক করে খেতে লাগলো। তার সবকটা ছেলেমেয়ে এইভাবে শেষ হবার পর চাঁদ তার লুকানো ছেলেমেয়েদের বের করে আনলো। সুয্যি ত ব্যাপার বুঝে রাগে লাল! ভীষণ ঝগড়া হয়ে গেল দুই বোনে। সুয্যি ঠিক করলে সে আর জীবনে বোনের মুখ দেখবে না। সেই থেকে 'সুয্যি' ওঠে দিনে, আর চাঁদ ওঠে রাত্রে।

ওরাওঁ

১৯৬১ সালের আদমসুমারি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে ওরাওঁ জনসংখ্যা ছিল ২,৯৭,৩৯৪।

ওরাওঁদের আদিনিবাস সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে দাক্ষিণাত্য থেকে তাঁরা দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েছেন। ওরাওঁদের ঐতিহ্য লক্ষ্য করেই এই মতের অবতারণা হয়েছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে ওরাওঁদের ঐতিহ্য ভারতের পশ্চিম উপকূলের হয় গুজরাট অথবা কঙ্কন-এর অধিবাসীদের ঐতিহ্যের সমতুল। তাছাড়া তাঁদের আদি-নিবাস নর্মদা নদীর উজানে কর্ণাট প্রদেশে বলেও অনেকের ধারণা।

কুরুখ বা ওরাওঁ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে ওরাওঁরা (প্রধানত ছোটনাগপুরের) স্বভাষায় নিজেদের কুরুখ বলেন। তাঁদের প্রাগৈতিহাসিক রাজা কারাখ-এর নামানুসারে কুরুখ নামের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নয়। আবার এও হতে পারে যে হিন্দুরা তাঁদের ওরাওঁ বলতেন ওরগোরা শব্দের অপভ্রংশ হিসাবে। ওরগোরা শব্দের অর্থ বাজপাখী—ওরাওঁরা একে নিষিদ্ধ বস্তু বলে মনে করেন। তাছাড়া আর একটি মত আছে যে হিন্দুরা ওরাওঁ শব্দ উরণ (অপব্যয়ী) অর্থেও ব্যবহার করে থাকতে পারেন। ওরাওঁদের তদানীন্তন চরিত্র লক্ষ্য করেই সম্ভবত হিন্দুরা এই শব্দ ব্যবহার করতেন।

ওরাওঁ শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে অপর এক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, ওরাওঁরা রাবণপুত (রাবণের বংশধর) বলে অভিহিত হন যা থেকে ও-রাবণ বা ওরাওঁ কথাটা এসেছে। এঁদের আদি সম্পর্কিত এক পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ করে উক্ত বিশেষজ্ঞ বলেন যে, ওরাওঁদের আদি পিতামাতা ভায়া ও ভাইন উরস বা পবিত্র রক্তে জন্মলাভ করায় তাঁদের বংশধরগণ উরাগন ঠাকুর বা উরাওঁ নামে পরিচিত। সেকালে তাঁরা ব্রাহ্মণদের মতোই শ্রদ্ধেয় ছিলেন এবং পৈতা ধারণ করতেন, কিন্তু কালক্রমে খাদ্যাখাদ্য বিচারে তাঁরা অধঃপতিত হন এবং উরাগন ঠাকুর নামের অধিকার হারিয়ে মাত্র ওরাওঁ নামে পরিচিত হন।

ওরাওঁদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা প্রাচীন শিকারী ওরাওঁ সম্প্রদায়ের সমাজ ব্যবস্থারই নামান্তর, কেবলমাত্র পরবর্তীকালের গ্রাম-সমাজের প্রভাবে কিছুটা সংশোধিত। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ-পরগনা জেলার ওরাওঁদের সমাজব্যবস্থা পুরুষ-প্রধান। পুরুষই পরিবারের কর্তা, স্ত্রী এবং সন্তানরা তাঁর অধীন।

দক্ষিণ বাংলার ওরাওঁ সমাজে স্ত্রীলোকের মর্যাদা তাঁর নিজের গুণাবলীর উপর নির্ভর করে না। পিতা, স্বামী ও পুত্রের সামাজিক মর্যাদা অনুসারেই তাঁর মর্যাদা।

গার্হস্থ জীবনে স্ত্রীলোকই কর্ত্রী। সংসারের যাবতীয় কাজের কর্ত্রী তিনিই। কৃষিকাজে তিনি পুরুষদের সাহায্য-

কারিণীর ভূমিকায় থাকেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওরাওঁ নারী কৃষিশ্রমিক বা দিনজমুরের কাজ করে থাকেন। এতে তাঁরা যা উপার্জন করেন তা দিয়ে সংসারের সাশ্রয় হয়।

ওঁরাওদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তাঁরা নাকি স্মরণাতীত কাল থেকে কৃষিজীবী। বহু শতাব্দী আগে যখন তাঁরা ছোটনাগপুর উপত্যকায় প্রবেশ করেন তখন সেখানকার বীরহোড়, কোরওয়া, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীদের উপর সহজেই আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিলেন একমাত্র তাঁদের কৃষিকাজের পারদর্শিতার জন্য।

চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন এলাকায় ওরাওঁরা প্রথম আসেন কৃষি শ্রমিক হিসাবে। জঙ্গল কেটে জমি চাষ করার মজুরি খাটাই ছিল তাঁদের মূলজীবিকা। ক্রমে তাঁরা সেই উদ্ধার-করা জমির অংশের মালিকানা লাভ করেন। তখন কৃষিকাজ হয়ে ওঠে তাদের গৌণ জীবিকা। পরে একটু একটু করে জমির মালিকানা পাওয়ার পর কৃষিই তাঁদের প্রধান জীবিকা হয়ে দাঁড়ায় এবং তাঁদের সমাজের অর্থনীতি সম্পূর্ণ কৃষিভিত্তিকরূপে গড়ে ওঠে।

ওরাওঁরা উর্বরতার দিক দিয়ে জমিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেন; (১) তাকায়া বা উঁচু জমি, (২) নাবাল বা মাঝারি জমি এবং (৩) ধাপা বা নিচুজমি। এর মধ্যে ধাপা জমিই সবচেয়ে বেশী উর্বর।

ওরাওঁ চাষীরা সাধারণত নিজের জমি চাষ করেন। অবস্থাপন্ন কেউ কেউ দিনমজুর নিয়োগ করেন ধান চাষের সময়। অনেকে আবার জমি ভাগচাষেও দিয়ে থাকেন।

ধান চাষ (প্রধানত আমন) সম্পর্কে ওরাওঁরা কতকগুলি অনুষ্ঠান পালন করেন। বৈশাখের প্রথম দিনে জমিতে প্রথম লাঙল চালানো হয় আনুষ্ঠানিকভাবে। সেদিন পরিবারের কর্তা স্নান করে পরিষ্কার কাপড় পরে প্রথমে পারিবারিক দেবতার পূজা করেন। তারপর লাঙলে সিঁদুর মাখিয়ে ও পবিত্র জলসিঞ্চন করে তিনি জমিতে যাত্রা করেন এবং চাষের প্রতীক হিসাবে তিনবার লাঙল চালান।

প্রচুর ফসল পাওয়ার আশায় তাঁরা আর একটি অনুষ্ঠান করেন। পরিবারের কর্তা কোনো এক শুভদিনে একটি শাদা মুরগি তাঁদের প্রধান দেবতা 'ধর্ম' এবং পূর্বপুরুষ 'বুড়াবুড়ি'র উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে তিনবার প্রণাম করেন। ফসল ওঠার পর এই মুরগিকে বলি দেওয়া হয়।

ফসল ওঠার পর নতুন চাল খাবার আগে প্রত্যেক ওরাওঁ যে পারিবারিক উৎসব পালন করেন তার নাম 'ভেলোয়া-ফারি'। বাঙালীদের হয় নতুন ধানে নবান্ন উৎসব।

ওরাওঁরা পাট চাষের উপর ততটা গুরুত্ব দেন না। খুব সীমাবদ্ধ আকারে তাঁরা পাটের চাষ করেন। কৃষিকাজে ওরাওঁরা স্থানীয় পদ্ধতি অনুসরণে নিজেদের রপ্ত করে নিয়েছেন।

কৃষিকাজ ছাড়াও ওরাওঁরা গবাদি পশু, হাসমুরগি, ছাগল, ভেড়া, শুকর প্রভৃতি পালন করে থাকেন। সুন্দরবন অঞ্চলের ওরাওঁদের মধ্যে অনেকেই দুধের ব্যবসা করেন।

সুন্দরবন অঞ্চলে খাল বিল পুকুর-এর সংখ্যাধিক হেতু মাছ ধরা আর একটি জীবিকায় পরিণত হয়েছে ওরাওঁদের। তবে নদীতে তাঁরা মাছ ধরতে যান খুব কমই।

ওরাওঁদের প্রচলিত ভাষা দ্রাবিড় শব্দগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত 'কুরুখ'। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন স্থানের স্থানীয় ভাষার সঙ্গে বেশ কিছুটা সংমিশ্রিত। যেমন, চব্বিশ-পরগনা জেলার সুন্দরবন

অঞ্চলে বাঙালী-অধ্যুষিত এলাকায় বসবাসের ফলে বাংলা ভাষার সংমিশ্রণ ঘটে যে ভাষা দাঁড়িয়েছে তাকে স্থানীয়ভাবে 'সাদরি' ভাষা বলা হয়। নিজেদের মধ্যে সাদরি ভাষায় তাঁরা কথা বলেন, আর বাঙালীদের সঙ্গে বলেন বাংলা ভাষায়।

একটি সাদরি গানঃ

বাও না বাতাসও নাহি
পাতা কেনে নড়ি গো;
হামি রাজার বেটি মাগো
বিদেশে বেহিরালি গো।

[কোনো বাতাস নেই, গতি নেই তবু পাতা কেন নড়ছে? মা, আমি রাজার মেয়ে বিদেশে এসে পড়েছি।]

বর্তমানে ওরাওঁদের ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মানুষ্ঠানে সাধারণ হিন্দুদের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁরা কালী, শিব, নারায়ণ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, চণ্ডী প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর পূজা করেন। তা-সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের চিরাচরিত ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান কিছুটা পরিবেশের প্রভাবে সংশোধিত অবস্থায় পালন করে থাকেন। এই চিরাচরিত দেবদেবীর মধ্যে রয়েছেন ধর্ম বা ভগবান, দেবীমাই, গাওনদেওতি, ঝাকরাবুড়িয়া প্রভৃতি।

এ-ছাড়া সুন্দরবন অঞ্চলে দক্ষিণ রায় (বাঘের দেবতা), কালু রায় (কুমীরের দেবতা), বনবিবি বা বনকালীও ওরাওঁদের উপাস্য দেবতা।

চব্বিশ-পরগনার ওরাওঁরা কিছুটা পারিবারিক আকারে বছরের প্রায় সব ঋতুতে কতকগুলি উৎসব পালন করে। এই উৎসবগুলি খাদ্যসংগ্রহ, শিকার, পশুপালন ও কৃষিসম্বন্ধীয়। এগুলির নাম খাদ্দি বা সরহুল, ফাগু, সোহারাই, হরিয়ারি।

ওরাওঁ সমাজে সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান হচ্ছে, 'ভেলোয়াফারি'। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ প্রভৃতি সকলরকম সামাজিক ও ধর্মীয় কাজে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়।

ওরাওঁদের সামাজিক উৎসব—গ্রামপূজা বা গ্রামবাঁধা উৎসব, টুসু উৎসব, কালীপূজা।

পশ্চিমবঙ্গে ওরাওঁদের মধ্যে সঙ্গীতের প্রচলন রয়েছে তাঁদের উৎসবাদিতে। এইসব লোকসঙ্গীত সাধারণত মেয়েরা গান। বিশেষ করে করম উৎসব, টুসু উৎসব প্রভৃতিতে গাওয়া হয়। রামায়ণের ঘটনা অবলম্বনে ঝুমুর-সঙ্গীত ওরাওঁদের বিশেষ প্রিয়।

পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের কল্যাণের জন্য সাধারণভাবে সরকারের আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন তার ফলে নিজেদের ঐতিহ্য বজায় রেখে ওরাওঁ জনসাধারণ বিশেষ করে কৃষি ও শ্রমের ক্ষেত্রে অন্যান্য অগ্রসর সম্প্রদায়ের সঙ্গে একই সুযোগসুবিধার অধিকারী হয়েছেন।

এই পর্যন্ত মোটামুটি একটা পরিচয় দেওয়া গেল পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজের। এঁদের সম্পর্কে এ-কথাই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পূর্বকাল পর্যন্ত এই আদিবাসী সমাজ বৃহত্তর ভারতীয় সমাজ থেকে এক প্রকার বিচ্ছিন্ন ভাবেই বসবাস করতেন বলা যায়, কিন্তু বর্তমানে ঘটেছে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন। সরকারী ও বেসরকারী প্রয়াসের ফলশ্রুতিস্বরূপ বর্তমানে তাঁরা বহুল পরিমাণে তাঁদের প্রতিবেশীদের নিকটতর হয়েছেন। এই নৈকট্য ও পারস্পরিক আদান-প্রদান যতো বাড়বে, ততই জাতীয় ঐক্য ও সামাজিক সমন্বয়ের ভিত্তি যে দৃঢ়মূল হবে, এতে আর সন্দেহ কী?

সূত্রঃ আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ-প্রকাশিত বিভিন্ন বুলেটিন ও গ্রন্থ প্রভৃতি।

স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর